চিকিৎসা ভূগোল
বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগ

মোহাম্মদ আবদুর রব
নার্গিস ফারহানা

চিকিৎসা ভূগোল : বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগ

(LEPROSY IN BANGLADESH : STUDIES IN MEDICAL GEOGRAPHY)

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রব
সহযোগী অধ্যাপক
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নার্গিস ফারহানা
রিসার্চ স্কলার
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

BANSDOC Library
Dhaka

বাংলা একাডেমী ঢাকা

BANSDOC Library
Accession No. 17877
Date 10.6.04 Sign.

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০৪/জুন ১৯৯৭

বাএ (১৯৯৬–৯৭ পাঠ্যপুস্তক : ভৌ ও প্র : ৮) ৩৫৯৪

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপবিভাগ
ভৌ ও প্র ১৬৮

প্রকাশক
সেলিনা হোসেন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
শওকাতুজ্জামান

মূল্য : ১৫০.০০

CHIKITSA BHUGOL : BANGLADESHE KUSHTHAROG (Leprosy in Bangladesh : Studies in Medical Geography) by Dr. Mohammad Abdur Rob & Nargis Farhana. Published by Selina Hossain, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition, June 1997. Price : Tk. 150.00

ISBN 984-07-3603-5

উৎসর্গ

বাংলাদেশের ভূগোলশাস্ত্রের অগ্রপথিক
উপমহাদেশের অন্যতম পরিবেশ বিজ্ঞানী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা
প্রফেসর নাফিস আহমদ-এর
অম্লান স্মৃতির উদ্দেশে —

BANSDOC Library
Dhaka

ভূমিকা

বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের অতীত-বর্তমান পরিস্থিতিসহ এ রোগের পরিণতি এবং সমস্যা সমাধানের উপায় ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় এ নিবন্ধের মূল আলোচ্য সূচি। এতে চিকিৎসা ভূগোল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিয়ে ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কুষ্ঠরোগের উপর আর্থ-সামাজিক এবং পারিবেশিক প্রভাব সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রধানত কুষ্ঠরোগীদের উপর প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

রোগতাত্ত্বিক আলোচনায় কুষ্ঠরোগের পরিচিতি, ইতিহাস, কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০-৫০০ বছর পূর্বের মিশরের মমি থেকে পাওয়া হাড়ে কুষ্ঠরোগ সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যায়। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে লিখিত বিভিন্ন শাস্ত্রে কুষ্ঠরোগের উল্লেখ আছে। ভারতকে কুষ্ঠরোগের উৎপত্তিস্থল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখান থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ এবং ক্রীতদাসদের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। মারাত্মক শারীরিক এবং সামাজিক পরিণতির ভয়ে বহু পুরনো রোগ হলেও কুষ্ঠরোগের উপর গবেষণায় বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে অনেক দেরি হয়েছে। ১৮৭৩ সালে নরওয়ের জীবাণুতত্ত্ববিদ ডাঃ জি. এ. হ্যানসেন 'মাইকো ব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি' (Mycobacterium leprae) নামক জীবাণুর আক্রমণে কুষ্ঠরোগ হয় বলে প্রমাণ করেন। ১৯৪১ সালে কুষ্ঠরোগের ওষুধ হিসেবে ড্যাপসনের ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৮২ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) অনুমতি নিয়ে বহু ওষুধ (MDT) প্রয়োগ করে এ রোগের চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করা হয়।

বহু ওষুধ প্রয়োগের কার্যকর ফলাফল পেয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম গ্রহণ করে। ১৯৯১ সালের বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলনে দুই হাজার সালের মধ্যে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার হার প্রতি হাজারে এক-এ নামিয়ে আনা হবে এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের ৭৯টি দেশে ২.৪ মিলিয়ন কুষ্ঠরোগী রয়েছে। কুষ্ঠরোগের ফলে ক্রমশ অক্ষমতা যে ভীতির সৃষ্টি করেছে তা সামাজিক সমস্যার মূল কারণ। কার্যকর ওষুধ প্রয়োগের ফলে এ সমস্যা সমাধানে বিশ্ব এখন আশাবাদী। ব্যাপকতার হারের ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশও এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। দেশের প্রতিটি থানায় সাধারণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে একীভূত করা হচ্ছে এবং বেসরকারি সংস্থাও একই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

এ গবেষণা কাজে পরিচালিত প্রশ্নপত্র জরিপে কিছু মূল্যবান তথ্য বের হয়ে এসেছে। কর্মক্ষম পুরুষ রোগী বিভিন্ন স্থানে বেশি মেলামেশা এবং শরীরের উপর বেশি চাপ প্রদানকারী

BANSDOC Library Dhaka

কাজ করার ফলে বেশি আক্রান্ত হয়। শিক্ষার অভাব, অসচেতনতা ও এ রোগ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রভৃতি দীর্ঘদিন এ রোগে ভোগার মূল কারণ। বেশিরভাগ রোগী বিভিন্ন ধরনের বহুদিনের চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে তারপর হাসপাতালে আসে। ততদিনে শরীরে ক্ষতি হয়ে যায় অনেক বেশি। কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। দীর্ঘদিনের স্থায়ী যে ধারণা মানুষের মনে গেঁথে গেছে, চিকিৎসা ব্যবস্থার কার্যকর ফলাফলে তা অপসারণ করা যেতে পারে, তবে তার জন্য আরো অপেক্ষা করতে হবে। কুষ্ঠরোগীদের আর্থিক অভাব এবং স্বাস্থ্যসম্মত নয় এমন পরিবেশে বসবাস রোগের একটি প্রধান কারণ। গবেষকদের মতে বেশিরভাগ মানুষের কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। কিন্তু শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল লোকও এ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় এ বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয়। পারিবেশিক যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে সে বিষয়েও গুরুত্ব দেয়া উচিত।

দীর্ঘদিন রোগে ভোগার সাথে শারীরিক বিকলাঙ্গতার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শারীরিক অক্ষমতার জন্য বেকারত্বের কারণে কুষ্ঠরোগীরা সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সব ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে জ্ঞানের যে অভাব রয়েছে সবার আগে তার সমাধান করে স্থানভিত্তিক বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে। সর্বোপরি রাজনৈতিক অঙ্গীকারের দৃঢ়তা বজায় রেখে অন্যের দানের উপর নির্ভরশীল না থেকে সমাজের সকলকে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

মোহাম্মদ আবদুর রব
নার্গিস ফারহানা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : **ভূমিকা** ১-৭

১.১ ভূমিকা ; ১.২ গবেষণার বিষয়বস্তু ; ১.৩ গবেষণার তাৎপর্য ; ১.৪ বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য ; ১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ; ১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : **চিকিৎসা ভূগোলের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু এবং বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের পর্যালোচনা** ৮-১৮

২.১ ভূমিকা ; ২.২ চিকিৎসা ভূগোলের সংজ্ঞা ; ২.৩ চিকিৎসা ভূগোলের ক্রমবিকাশ ; ২.৪ চিকিৎসা ভূগোলের বিষয়বস্তু ; ২.৫ প্রাসঙ্গিক লিখিত কাজের পর্যালোচনা ; ২.৬ সারাংশ।

তৃতীয় অধ্যায় : **কুষ্ঠ : রোগতত্ত্ব** ১৯-৩০

৩.১ কুষ্ঠরোগের রোগতত্ত্ব ; ৩.২ কুষ্ঠরোগের ইতিহাস ; ৩.৩ কুষ্ঠরোগের লক্ষণ ; ৩.৪ কুষ্ঠরোগের শ্রেণিবিভাগ ; ৩.৫ কুষ্ঠরোগের বিস্তার ; ৩.৬ কুষ্ঠরোগের কারণ ; ৩.৭ সংক্রমণ ক্ষমতা ; ৩.৮ কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা ; ৩.৯ কুষ্ঠরোগের ফলাফল ; ৩.১০ কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে টিকা ; ৩.১১ কুষ্ঠরোগের গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান ; ৩.১২ সারাংশ।

চতুর্থ অধ্যায় : **কুষ্ঠরোগের অবস্থা : বিশ্ব ও বাংলাদেশ** ৩১-৬৫

৪.১ ভূমিকা ; ৪.২ পৃথিবীতে কুষ্ঠরোগের বর্তমান পরিস্থিতি ; ৪.৩ কুষ্ঠরোগ নিরাময়ে বিশ্ব সমাজের ভূমিকা ; ৪.৪ বিশ্বে কুষ্ঠ অপসারণ কার্যক্রম ; ৪.৫ বিশ্বে কুষ্ঠরোগের স্থানভিত্তিক তথ্য ; ৪.৬ আক্রান্ত পঁচিশটি প্রধান দেশের কুষ্ঠরোগের পরিস্থিতি ; ৪.৭ আক্রান্ত দেশগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ; ৪.৮ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা ; ৪.৯ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ; ৪.১০ বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের প্রেক্ষাপট ; ৪.১১ বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা ; ৪.১২ বাংলাদেশে কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ; ৪.১৩ বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের বর্তমান পরিস্থিতি ; ৪.১৪ শহর এলাকায় কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ; ৪.১৫ সারাংশ।

পঞ্চম অধ্যায় : **কুষ্ঠরোগ : পারিবেশিক প্রভাব** ৬৬–৯৩
৫.১ ভূমিকা ; ৫.২ কুষ্ঠরোগীর ব্যক্তিগত তথ্য ; ৫.৩ রোগ ও আনুষঙ্গিক তথ্য ; ৫.৪ কুষ্ঠরোগীর পারিবারিক এবং সামাজিক তথ্য ; ৫.৫ কুষ্ঠরোগীর পারিবেশিক তথ্য ; ৫.৬ কুষ্ঠরোগীদের অর্থনৈতিক তথ্য ; ৫.৭ তিনটি অঞ্চলের তুলনামূলক আলোচনা ; ৫.৮ সারাংশ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : **কুষ্ঠরোগ প্রসারের নিয়ামক, পরিণতি ও কুষ্ঠ সমস্যা সমাধানের উপায়** ৯৪–১১২
৬.১ ভূমিকা ; ৬.২ বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগ বিস্তারের নিয়ামকসমূহ ; ৬.৩ কুষ্ঠরোগের পরিণতি ; ৬.৪ বাংলাদেশে কুষ্ঠ সমস্যা সমাধানের উপায় ; ৬.৫ সারাংশ।

সপ্তম অধ্যায় : **উপসংহার** ১১৩–১১৯
৭.১ ভূমিকা ; ৭.২ উপসংহারীয় বক্তব্য ; ৭.৩ কতিপয় প্রাসঙ্গিক সুপারিশ।

পরিশিষ্ট ১২১–১৪৫
পরিশিষ্ট ১ : কুষ্ঠরোগী, তাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির আলোকচিত্র ; পরিশিষ্ট ২ : কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের করণীয় কাজের বিবরণ ; পরিশিষ্ট ৩ : বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগীদের পারিবেশিক অবস্থা জরিপের প্রশ্নপত্র।

শব্দ সংক্ষেপ ১৪৭

গ্রন্থপঞ্জি ১৪৯–১৫১

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ ভূমিকা

মানুষের আদিমতম রোগসমূহের মধ্যে কুষ্ঠ একটি। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৪৬০০ বছরের আগের ইতিহাসেও কুষ্ঠরোগের উল্লেখ রয়েছে। পারস্য দেশের প্যাপিরাস-লিপিতে কুষ্ঠরোগীদের শহর থেকে বহিষ্কারের কথা লেখা আছে (উল্লাহ ১৯৮৯)। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য নিরাময়ের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক পরিস্থিতি আজও পাল্টায় নি। এখনো কুষ্ঠরোগাক্রান্ত চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, গৃহিণী সবাই তাদের নিজস্ব পরিচয় ভুলে যায়। তাদের একমাত্র পরিচয় হয় কুষ্ঠরোগী। সাধারণ মানুষ কুষ্ঠরোগীদের কাছ থেকে দূরে থাকে। রোগীরাও যতদিন সম্ভব রোগ লুকিয়ে রাখে। কেননা এ রোগের প্রতি রয়েছে সমাজের বিরূপ প্রতিক্রিয়া। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কুষ্ঠরোগ একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা ("Leprosy, one of the major public health problems of the developing countries, is well known for the story stigma associated with it", Thangaraj and Yawalker 1986)। উন্নত দেশগুলোতে জীবনযাত্রার মানের উন্নতির সাথে কুষ্ঠরোগের প্রকোপ কমে আসছে।

কুষ্ঠ একটি দীর্ঘস্থায়ী কম সংক্রামক রোগ যা প্রাথমিকভাবে ত্বক, নাকের ঝিল্লি ও প্রান্তিক স্নায়ুকে আক্রমণ করে (Pearson 1989)। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক, ঐতিহ্যগত বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং অন্যান্য সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য কুষ্ঠরোগকে জটিল করে ফেলেছে। এসব বিষয় কুষ্ঠরোগীর পুনর্বাসন এবং কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে অনেক বেশি দুঃসাধ্য করে তুলেছে (Samad 1988)। কুষ্ঠরোগ থেকে বর্তমানে মানুষ আরোগ্য লাভ করে। তারপরও এ অঞ্চলের মানুষ তাদের রোগ লুকিয়ে রাখে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করে না (Hart 1980)। শুধু রোগীই নয় তাদের পরিবারের মধ্যেও সামাজিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে রোগ লুকিয়ে রাখার প্রবণতা দেখা যায় (Kagmae 1983)। প্রাচীনকাল থেকে কুষ্ঠরোগ বংশগত, এ ধারণা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে স্বীকৃত। অজ্ঞতাবশত কুষ্ঠ একটি অনিরাময় রোগ হিসেবেও বিবেচিত হয়ে আসছে। কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরও সমাজে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় (Akhter 1991)।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের ৩৫তম সম্মেলনে ১৯৬৫ সালের ধারণা অনুযায়ী বলা হয় যে, বাংলাদেশে কমপক্ষে ১,৫০,০০০ লোক কুষ্ঠরোগে ভুগছে (Hogerzeil and Sundararajan 1990)। কুষ্ঠরোগ একটি বিশ্বজনীন সমস্যা, অনেকগুলো সামাজিক কারণ যেমন-ভীতি, অপরাধবোধ, কুসংস্কার, অজ্ঞতা ইত্যাদি এ রোগের সাথে জড়িত থাকায় কুষ্ঠরোগকে সামাজিক রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে রোগটির প্রকোপ এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম হলেও এটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের গরীব জনসাধারণ, এদেশে বসবাসকারী বিহারী মুসলমান এবং চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে কুষ্ঠরোগের আধিক্য বেশি পরিলক্ষিত হয়।

সূচনাতেই সুচিকিৎসা না হলে এ ব্যাধিতে প্রায়শই অঙ্গবিকৃতি হতে পারে। এ বিকৃতিই সামাজিক সমস্যাকে বেশি প্রকট করে তোলে। স্নায়বিক কুষ্ঠ চামড়ার কুষ্ঠের চেয়ে কম মারাত্মক (বিশ্বকোষ ১৯৭৫)।

১৯৯৪ সালের ২-৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় কুষ্ঠরোগবিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ২০০০ সালের মধ্যে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার হার কমিয়ে আনার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যৌথভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে মানুষের ভীতি কমে কিছুটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে, যদিও তা চিকিৎসাবিষয়ক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বৈজ্ঞানিকভাবে এ রোগ সম্পর্কে গবেষণার অনেক অগ্রগতি হলেও সামাজিক কুসংস্কারগুলো এখনো রয়ে গেছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ এখনো কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় রোগীরা দুর্বিসহ জীবন অতিবাহিত করছে। অজ্ঞতা, ভীতি এবং কুসংস্কারের ফলে রোগী, এমনকি সম্পূর্ণ পরিবারকে সমাজ বহির্ভূত করা হয়। ভাল হয়ে যাওয়ার পরও সমাজ কুষ্ঠরোগীকে গ্রহণ করে না। যার ফলে চিকিৎসা সুবিধা থাকা সত্ত্বেও রোগের বিস্তৃতি ধীরে ধীরে বাড়ছে। সংস্কৃতি, প্রথা, সামাজিক আচরণ ও বিধিনিষেধ কোনো কোনো দেশের কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ এবং রোগীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রধান বাধা। কুষ্ঠ দরিদ্র, অজ্ঞ এবং অনুন্নত শ্রেণির রোগ (Nordeen 1994)। বিষুবীয় অঞ্চলে কুষ্ঠরোগের প্রকোপ বেশি। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কুষ্ঠরোগ এখনো একটি প্রধান সমস্যা (ম্যাকডুগাল ও ইয়ালকার ১৯৯০)। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগ বিস্তারে একটি অনুকূল পরিবেশ রয়েছে।

১৮৭৩ সালে হ্যানসেন কর্তৃক কুষ্ঠরোগ জীবাণু আবিষ্কারের পর থেকে এ রোগের দ্রুত চিকিৎসায় সালফোন নামক ওষুধ প্রয়োগ শুরু হয়। ১৯৮২ সাল থেকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক একাধিক ওষুধ (MDT) প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়, যা অত্যন্ত কার্যকর। বাংলাদেশ ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলনে (WHA) এ মর্মে অঙ্গীকার করে যে, ২০০০ সালের মধ্যে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার হার কমিয়ে আনবে। এ লক্ষ্যে যথাশীঘ্র সারা দেশের সকল কুষ্ঠরোগীকে একাধিক ওষুধ (MDT) প্রয়োগের আওতায় আনা হবে।

যেহেতু কুষ্ঠরোগ একটি সামাজিক রোগ তাই মানব-ভৌগোলিক দিক থেকে এ রোগের উপর ব্যাপক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যে কোনো একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে। যেমন, ভূতত্ত্ব শুধু ভূতাত্ত্বিক দিক নিয়ে চিন্তা করে, আবার সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ শুধুই মানব সমাজ নিয়ে গবেষণা করে। কিন্তু ভূগোল এমন একটি বিষয় যা প্রাকৃতিক এবং সামাজিক উভয় পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করে। ফলে যে কোনো বিষয়ে অধিক বাস্তবসম্মত ও কার্যকর অবদান রাখতে পারে ভূগোল। কুষ্ঠরোগের মত একটি আর্থ-সামাজিক, পারিবেশিক, মানসিক এবং পারিবারিক সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

১.২ গবেষণার বিষয়বস্তু

প্রাকৃতিক ভূগোলে ভূমিরূপ, জৈব পরিবেশ, আবহাওয়া, জলবায়ু, মৃত্তিকা ও পানি বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি ভূগোলকে একদিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত করেছে। অন্যদিকে মানবিক ভূগোলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ধারার অন্তর্ভুক্তি মানব আচরণ সম্পর্কে ভূগোল বিজ্ঞানে বিশেষ একটি নবতর ধারণা প্রবর্তন করেছে। চিকিৎসা ভূগোল সমাজকল্যাণবিষয়ক ভূগোলের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। আলোচ্য গবেষণার বিষয় চিকিৎসা ভূগোলের অন্তর্গত।

বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের পরিস্থিতি ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করাই হলো গবেষণার মূল বিষয়বস্তু। ভূগোলের সাথে অন্যান্য বিষয়ের মূল পার্থক্য হলো—ভূগোল স্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কি, কোথায়, কখন, কেন, কিভাবে বিন্যস্ত সে আলোচনাই ভূগোলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। শুধু বিষয়বস্তু ভিন্ন হলে ভিন্ন নামে পরিচিতি পায়। যেমন, কৃষির উপর এ ধরনের গবেষণা হলে তা কৃষি ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত, স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিষয়বস্তু হলে তা চিকিৎসা ভূগোলের অন্তর্গত (N.D Mcglashan-1972)। ভূগোল প্রতিটি বিষয়ের পারিসরিক বিন্যাস, পারিসরিক ধারণা, পারিসরিক মিথষ্ক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হয়ে পারিসরিক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে।

ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কুষ্ঠরোগের উপর আলোচনা করলে দেখা যায়—এ রোগের সাথে পারিবেশিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন--জলবায়ু সরাসরি মানুষের শারীরিক সুস্থতার উপর প্রভাব রাখে। মানবিক পরিবেশ যেমন—বসবাসের স্থান, জীবনাচরণ অর্থাৎ জীবনধারণ পদ্ধতি, পেশা, শিক্ষা, ইত্যাদি কিভাবে কি পদ্ধতিতে কুষ্ঠরোগের উপর প্রভাব বিস্তার করে তা নির্ণয় করতে হবে। এ রোগের প্রতি সামাজিক প্রতিক্রিয়া কি নিরপেক্ষ, বিরূপ, না সহানুভূতিশীল, এসব বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। উদ্ভূত সামাজিক সমস্যার তীব্রতা অনুভব করে এ সমস্যা সমাধানে সমাজ কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং সেগুলো কতটা বাস্তবসম্মত তা নির্ণয় করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা যেতে পারে। রোগসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করলে দেখা যায় চিকিৎসা ভূগোল প্রাকৃতিক এবং মানবিক উভয় ভূগোলের বিভিন্ন শাখার মিলন ক্ষেত্র। যেমন জলবায়ুবিদ্যা, অর্থনৈতিক ভূগোল, সামাজিক ভূগোলের বিভিন্ন বিষয় আলোচ্য গবেষণার বিষয়বস্তুর উপর সমন্বিত প্রভাব রাখছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়ের সূক্ষ্ম পর্যালোচনা এবং নতুন বিষয়ের অনুসন্ধান গবেষণার মূল বিষয়বস্তু। তাছাড়া নানা পরোক্ষ নিয়ামক ও প্রভাবকও এ রোগের বিস্তরণ ও প্রসারণে প্রভাব ফেলে থাকে।

১.৩ গবেষণার তাৎপর্য

বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগ এমন একটি সমস্যা যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত গবেষণার মাধ্যমে বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। রোগীর শারীরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানসিক এসব বিষয়ে এত বেশি প্রভাব আর কোনো রোগই ফেলতে পারে না। অথচ সবচেয়ে পুরানো ব্যাধিগুলোর মধ্যে কুষ্ঠরোগ একটি। উন্নত বিশ্ব এ সমস্যা কাটিয়ে উঠলেও উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত বিশ্বে সমস্যা রয়ে গেছে এবং দিন দিন আরো জটিল হচ্ছে। সম্প্রতি দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত তথ্য থেকে বাংলাদেশে এ সমস্যা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। ২৩ আগস্ট, ১৯৯৩ দৈনিক ভোরের কাগজে "দেশের উত্তরাঞ্চলে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা আশংকাজনক হারে বেড়েছে" শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ দৈনিক জনকণ্ঠে "দেশে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা চার লাখ" শিরোনামে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হয়। ১২ মার্চ, ১৯৯৫ দৈনিক জনকণ্ঠে পুনরায় প্রকাশিত হয় "দেশের উত্তরাঞ্চলে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বাড়ছেই"। এরকম আরো বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে বুঝা যায় কুষ্ঠ সমস্যা ধীরে ধীরে ব্যাপক আকারে রূপ নিচ্ছে এবং মানুষ এ সমস্যা নিয়ে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করছে।

দুই হাজার সালের মধ্যে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার হার প্রতি দশ হাজারে ১৩.৬ থেকে কমিয়ে ১-এ আনার সরকারি লক্ষ্য থাকায় সম্প্রতি এ বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ১৯৮৫ সালে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণের মাইকোব্যাক্টেরিয়াল ডিজিজ কন্ট্রোল (MBDC) পরিদপ্তর গঠন করা হয়। কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের সীমিত কার্যক্রমে কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় ১৯৯০ সালে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ

নিয়ন্ত্রণ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। ১৯৯১ সালের বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলনের (WHA) অঙ্গীকার অনুযায়ী সরকার কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প জোরদার করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় বিশ্বব্যাংক ও আই ডি এ (IDA) ১৯৯৬–৯৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে। তারপরও সরকারিভাবে আশানুরূপ সাফল্য সন্দেহজনক। তারচেয়ে বেসরকারিভাবে পরিচালিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম অনেক বাস্তবসম্মত এবং কার্যকর। বর্তমানে অবশ্য সরকারি–বেসরকারি উভয়ে একই প্রকল্পের অধীনে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

কুষ্ঠরোগের ফলে প্রথমে কোনো যন্ত্রণা থাকে না বলে রোগী সহজে বুঝতেই পারে না যে সে অসুস্থ। বুঝতে পারলেও সামাজিক বয়কটের ভয়ে সে প্রকাশ করে না। আবার অনেকগুলো চর্মরোগের সাথে সামঞ্জস্য থাকার কারণে চিকিৎসকরাও অনেক সময় শনাক্ত করতে দেরি করে ফেলেন। ততদিনে বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একদিকে সমাজ থেকে বিচ্যুতি অপরদিকে কাজ করে খাওয়ার অক্ষমতা কুষ্ঠরোগীর জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। সামাজিকভাবে কুষ্ঠরোগীরা এতই নিগৃহীত যে এর সাথে জড়িত কর্মচারীরাও অবহেলার স্বীকার হন। অবশ্য নীলফামারী, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রামে বেসরকারিভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কৃতিত্বের মাধ্যমে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। তাদেরকে উদাহরণ হিসেবে ধরে নিয়ে সবাইকে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা উচিত। ইয়েন্স মুলার নামক একজন ডেনমার্কবাসী ড্যানিশ–বাংলাদেশ লেপ্রসি মিশনে কাজ করার পর বাংলাদেশের এ ভয়াবহ সমস্যা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তিনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন সুদূর বেলজিয়াম বা ডেনমার্ক থেকে এসে এ জটিল এবং দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সমস্যার সমাধানে এ দেশের মানুষকেই কাজে লাগাতে হবে। তাই তিনি বাংলাদেশের প্রয়োজনানুযায়ী একটি ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। এ উদ্দেশ্য ডি বি এল এম (DBLM) এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের কর্মীসভায় তিনি ঘোষণা দেন “Country is yours, patients are yours relatives. You should share their sufferings and you must do something for them. We the foreigners can’t change the situation until and unless you people take the responsibility”. এভাবে বলার পরও কি দেশের সচেতন মানুষ এগিয়ে আসছে? ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের কুষ্ঠরোগের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরার প্রচেষ্টায় এ গবেষণা কাজের সূত্রপাত।

১.৪ বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য

কুষ্ঠরোগ একটি সুদূরপ্রসারী বহুমুখী সমস্যা। সমাজে বিভিন্নভাবে এ রোগ প্রভাব বিস্তার করে। একটি রোগের সাথে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, পেশা, বয়স, সামাজিক–সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ভৌগোলিক বিষয় জড়িত থাকতে পারে। নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে এ ধরনের সমস্যা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করা হলে সমাধানের একটি সহজ পথ বেরিয়ে আসতে পারে। নিম্নে আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো ব্যক্ত করা হলো :

প্রথমত, এ গবেষণা কাজটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের স্থানিক ও কালিক বণ্টন উদ্‌ঘাটন করা এবং বিশেষ করে এ দেশের কুষ্ঠরোগ বিস্তারে পারিবেশিক প্রভাব তথা প্রাকৃতিক ও আর্থ–সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া ;

দ্বিতীয়ত, কুষ্ঠরোগের ফলে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কুষ্ঠরোগীর লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদির সাথে রোগের প্রকোপের

সম্পর্ক খুঁজে বের করা এবং জরিপকৃত স্থানসমূহের মধ্যে এসব বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা ;

তৃতীয়ত, কুষ্ঠরোগের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে রোগীদের বর্তমান ধারণা কি তা নিরূপণ করা ;

চতুর্থত, বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণের বর্তমান পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা ;

পঞ্চমত, বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় এবং এদেশ থেকে কিভাবে এ ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা যায় সে সম্পর্কে ভৌগোলিক ও পারিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরামর্শ প্রদান করা ;

ষষ্ঠত, গবেষণার স্থানসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করে মূল বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত কোনো কিছু সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টাকে গবেষণা বলা হয়। গবেষণা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রচলিত জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞানের সংযোজন করে। গবেষণার উদ্দেশ্য এবং নীতিমালা ঠিক রেখে প্রথমে আলোচ্য গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়। আমাদের দেশে ব্যস্ত সড়কের পাশে, ওভারব্রিজের উপরে, বাস এবং রেল স্টেশনে কুষ্ঠরোগী সব সময় দেখা যায়। এমন একটি সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশে পূর্বে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা হয় নি। নানারকম ভুল ধারণার কারণে এ বিষয়ে গবেষণায় কেউ এগিয়ে আসতে চায় না। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের উপর গবেষণার জন্য বিষয়টি নির্বাচন করা হয়। বিষয় নির্বাচনের পর ধারাবাহিকভাবে গবেষণার নক্সা তৈরি, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ গবেষণা কাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আদর্শ এবং উপযুক্ত ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

১.৫.১ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ঃ গবেষণা কাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো তথ্য এবং উপাত্ত সংগ্রহ করা। একাজ দুভাবে বিভক্ত, যথা :

(১) প্রথম পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহ, এবং
(২) দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহ।

প্রথম পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রথমে স্থান চিহ্নিত করা হয়। নানা বিষয় বিবেচনা করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, নীলফামারী দেশের এ তিনটি অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়। কুষ্ঠরোগের প্রকোপ এবং হাসপাতালের অবস্থানের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে অঞ্চল বাছাই করা হয়। তিনটি অঞ্চলের মোট পাঁচটি হাসপাতালে রোগীদের উপর প্রশ্নপত্র জরিপ করা হয়। হাসপাতালগুলো হচ্ছে :

(১) মহাখালী কুষ্ঠ হাসপাতাল, ঢাকা।
(২) জলছত্র কুষ্ঠ হাসপাতাল, মধুপুর, টাঙ্গাইল।
(৩) এস. কে. হাসপাতাল, ময়মনসিংহ।
(৪) শম্ভুগঞ্জ কুষ্ঠ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ।
(৫) ড্যানিশ-বাংলাদেশ লেপ্রসি মিশন, নীলফামারী।

BANSDOC Library * Dhaka *

জলছত্র হাসপাতালকে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ধরে নিয়ে তিনটি অঞ্চলের ৫০ জন করে মোট ১৫০ জন রোগীর উপর প্রশ্নপত্র জরিপ করা হয়। প্রকৃত তথ্য বের করে আনার জন্য প্রশ্নপত্র এমনভাবে সাজানো হয় যাতে রোগীরা সহজভাবে উত্তর প্রদান করতে পারে। উল্লেখ্য, কুষ্ঠরোগীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে বলে প্রশ্নপত্র জরিপের সময় প্রত্যেক নমুনা–রোগীর জন্য পর্যাপ্ত সময় এবং সহমর্মিতা প্রদর্শন করা হয়।

উপাত্ত সংগ্রহের সময় কিছুসংখ্যক রোগীর বাড়ি গিয়ে সরজমিনে তাদের প্রকৃত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। একই সময়ে রোগীদের শারীরিক অবস্থা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং আবাসিক পুনর্বাসনের উপর কিছু আলোকচিত্র তুলে আনা হয়। শিক্ষিত, স্বচ্ছল কুষ্ঠরোগীরা রোগ লুকিয়ে রাখে বলে প্রশ্নপত্র জরিপের সময় হাসপাতালে আগত এ ধরনের রোগীর উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। এছাড়া লিঙ্গ এবং বয়সের উপরও খেয়াল রাখা হয়। উল্লেখ্য, আলোচ্য গবেষণায় নমুনা–রোগী বাছাইকরণে নির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় নি। ১৯৯৪ সালের ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৫ সালের ১৪ই মার্চ পর্যন্ত উল্লেখিত হাসপাতালসমূহে গিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য সরবরাহ করা হয়।

বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের উপর দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য অত্যন্ত সীমিত। অল্প সময়ের মধ্যে মহাখালী কুষ্ঠ হাসপাতাল, নিপসম (NIPSOM) লাইব্রেরি এবং ধানমণ্ডি যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.৫.২ উপাত্ত বিশ্লেষণ : প্রশ্নপত্র জরিপে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে প্রথমে সংকেতের মাধ্যমে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। তারপর সারণিবদ্ধ করে বিশ্লেষণ করা হয়। প্রয়োজনে একাধিক উপাত্তকে একটি সারণির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষণ কাজে সাধারণ পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি, গ্রাফিক পদ্ধতি ও ফটোগ্রাফিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। গ্রাফিক পদ্ধতিতে রৈখিক, দণ্ড ও বৃত্ত চিত্র প্রয়োজন মত ব্যবহার করা হয়। কার্টোগ্রাফিক পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় মানচিত্র অঙ্কন করা হয়।

১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

আলোচ্য গবেষণার বিষয়বস্তু হলো "বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগ : একটি চিকিৎসা ভৌগোলিক গবেষণা।" এত বিস্তৃত একটি বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নানা রকম সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিম্নে সীমাবদ্ধতাসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের স্থানিক ও কালিক বন্টনের সরকারি কোনো পরিসংখ্যানিক তথ্য না থাকায় দেশের সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় নি। এ ক্ষুদ্র গবেষণায় স্বল্প সময়ে স্থান বিশেষের সঠিক তথ্য সরবরাহ করাও সম্ভব নয়। সরকারি বেসরকারিভাবে পরিচালিত হাসপাতালগুলোর মধ্যে মাত্র পাঁচটি হাসপাতালে পরিচালিত প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে তিনটি অঞ্চলের কিছু কুষ্ঠরোগীর সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আনা সম্ভব হলেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের রোগীদের সম্পর্কে জানা যায় নি। দেশের সব অঞ্চলে হাসপাতালও নেই। অথচ হাসপাতাল বা কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ব্যতীত কুষ্ঠরোগী খুঁজে বের করা যায় না। শুধু ঢাকায় অবস্থিত মহাখালী হাসপাতালে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের কতিপয় রোগী পাওয়া গেছে। এছাড়া সরকারি হিসাবে অনুযায়ী এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার রোগীর মধ্যে মাত্র ১৫০ জন রোগীর উপর প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা সঠিকভাবে নমুনায়ন করাও সম্ভব হয় নি। নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অঞ্চলের কুষ্ঠরোগীর সঠিক সংখ্যা জানা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ এ রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে অনেক সময় লাগে। আবার সামাজিক কলংকের ভয়ে

রোগীরা যতদিন সম্ভব রোগ লুকিয়ে রাখে। কুষ্ঠরোগের সঠিক তথ্য অনুসন্ধানে এগুলো প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কুষ্ঠরোগ আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল এবং অশিক্ষিত লোকদেরই হয়। কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি তা নয়। সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত রোগীরা কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত কারো কাছেই তাঁদের সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করতে চায় না। এ ধরনের কয়েকজনকে পেলেও সবার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। আলোচ্য গবেষণায় সঠিক চিত্র তুলে ধরতে এটি একটি প্রধান সমস্যা।

নমুনা–কুষ্ঠরোগীদের অজ্ঞতা, অনীহা উপযুক্ত তথ্য প্রাপ্তির একটি অন্তরায়। বয়স, মাসিক আয় সম্পর্কে বেশিরভাগ রোগীই সঠিক তথ্য দিতে পারে নি, যা মূল গবেষণায় ব্যাঘাত ঘটায়। সর্বোপরি এ বিষয়ে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্বে কোনো গবেষণা হয় নি বিধায় সবদিক থেকে সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। একেবারে বিচ্ছিন্ন একটি বিষয়ের সমন্বয়সাধন করতে গিয়ে গবেষণায় অনেক ত্রুটি থেকে গেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিকিৎসা ভূগোলের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু এবং বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের পর্যালোচনা

২.১. ভূমিকা

পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে পারিসরিক ও পারিবেশিক বিজ্ঞানসমূহের নানা শাখার বিপুল উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হলেও চিকিৎসা ভূগোল — যা নানা রোগ-ব্যাধির স্থানিক ও কালিক বিস্তরণ এবং এ বিস্তরণের পারিবেশিক প্রভাবকসমূহ নিয়ে আলোচনা করে — তার ততো বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয় নি। তবুও অতি সাম্প্রতিককালে, বিশেষ করে ষাট ও সত্তরের দশকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং রাশিয়ায় চিকিৎসা ভূগোল ভৌগোলিক জ্ঞানের একটি নতুন শাখা হিসেবে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে এবং ব্যাপকভাবে পাঠ্যসূচি ও গবেষণাকর্মে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। বাংলাদেশে পুরো ভূগোল শাস্ত্রটিই যেখানে খুবই পশ্চাৎপদ জ্ঞানের শাখা — সেখানে চিকিৎসা ভূগোলের মত একটি অত্যন্ত আধুনিক ও প্রয়োজনীয় পারিবেশিক বিজ্ঞানের প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে। তবে বিপুল জনভারাক্রান্ত একটি অত্যন্ত গরিব ও পশ্চাৎপদ দেশ হিসেবে এদেশের নানা পারিবেশিক সমস্যা অত্যন্ত জটিল এবং একই সাথে এদেশে পরিবেশ প্রভাবিত রোগ-ব্যাধির প্রকোপও সমধিক। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কলেরা, টাইফয়েড, ঘ্যাঘ, কুষ্ঠরোগ ইত্যাদি নানা পরিবেশ-প্রভাবিত ব্যাধি বাংলাদেশের মতো গরিব ক্রান্তীয় (tropical country) উষ্ণ জলবায়ুর দেশেই বেশি বিস্তার লাভ করে থাকে। অধিক জনসংখ্যা, অপুষ্টি, অপরিচ্ছন্ন ঘিঞ্জি বসতি ও অপরিশোধিত অপর্যাপ্ত পানীয় জলের সরবরাহ এবং সর্বোপরি সুষ্ঠু ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধার অভাব এসব দেশে নানা ধরনের ছোঁয়াচে এবং পানি বা বায়ু বাহিত রোগের দ্রুত ও বিপুল বিস্তার ঘটানোর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে।

পৃথিবীতে সময়ের সাথে ব্যাপকভাবে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে। মানুষ বাড়ছে দ্রুতগতিতে, মানসিক ক্ষমতা বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে শাখা-উপশাখার সৃষ্টি হচ্ছে। জ্ঞানের একই বিষয়কে অনেকগুলো শাখায় বিভক্ত করে নতুন নতুন জ্ঞান আহরণের চেষ্টা চলছে। চিকিৎসা ভূগোল তেমনি ভূগোলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

বিংশ শতাব্দীর ভূগোলবিদগণ বহুলাংশে ভাববাদ অথবা অস্তিত্ববাদসহ সমকালীন দর্শনসমূহকে সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বিশেষ করে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক প্রকার অবহেলা প্রদর্শন করছেন। তার বদলে তারা সামাজিক বিষয়াবলী সমীক্ষায় প্রত্যক্ষবাদ এবং অনুষঙ্গী হিসেবে বিশ্লেষণধর্মী দর্শনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রে যদিও ভূগোলের একটি দীর্ঘ এবং বিশিষ্ট ইতিহাস রয়েছে। নৈতিকতার আলোকে যে নতুন ভাবতত্ত্ব প্রবর্তনের প্রচেষ্টা অনেকে চালিয়েছেন তার প্রতি অনেক ভূগোলবিদের আগ্রহ দেখা গেলেও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁরা গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। ভূগোলে সমাজকল্যাণ অথবা সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রে অথবা অঙ্গীকারের দ্বারা বিশ্লেষিত হতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতির ভৌগোলিক পর্যালোচনা প্রয়োজন (ইসলাম ১৯৯২)।

১৯৬০ এর দশকে এবং ১৯৭০ দশকের প্রথমার্ধে ভিয়েতনামের যুদ্ধ পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের জন্য একটি বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ছিল। ভূগোলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তৃতীয় বিশ্বের ন্যায়সঙ্গত স্বাভাবিক জাতীয় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থে বিফলতা, বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শোষণমূলক ক্রিয়াকলাপ এবং এর সাথে জড়িত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, অর্থনৈতিক শ্রেণিভিত্তিক সামাজিক দ্বন্দ্বের ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি এবং সে সাথে শোষণমুক্ত একটি সামাজিক কাঠামো গঠন করার যে নতুন উদ্যম তার পদ্ধতিগত বিষয় সম্পর্কে পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং তারই ফলে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কায়েমী ভূগোলকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। দরিদ্রাবস্থা ও নিঃসম্বলতার সমস্যা, সংখ্যালঘু গোত্রের অধিকার, পরিবেশগত অবনতির আশংকা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জট, শহর ও নগর অধিবাসীদের আবাসিক সমস্যা, হিংস্রতা ও সংঘাতের কারণ প্রভৃতি বিষয়ের ভিত্তিতে পরবর্তীতে কৃষ্ণ আমেরিকা, অপরাধ ও সুবিচার, নগরীয় দ্বন্দ্ব, শক্তি এবং রাজনীতিবিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থ কল্যাণমুখী ভূগোল, বৈষম্যের ভূগোল প্রভৃতির উন্মেষ ঘটায়।

এ যুগে চিন্তার ক্ষেত্রে ভূগোলবিদদের মধ্যে একটি প্রচণ্ড আলোড়ন অনুভূত হয়। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নজনিত কারণে যে সব সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় তার সমীক্ষায় ক্রমবর্ধমান হারে ভূগোলবিদদের আগ্রহী হতে দেখা যায়। তৃতীয় বিশ্বের বহু স্থানীয় ভূগোলবিদ একান্ত প্রয়োজনীয় জাতীয় উন্নয়নের ধারা কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় তা নির্ধারণ করার লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সামাজিক সমস্যাবলীর উপর তাঁদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। এ ধরনের চিন্তা চেতনায় ক্রপটকিন, ইলিজি রেক্লুস, প্যাট্রিক গেডেস, আর্থার গেডেস প্রমুখ ভূগোলবিদগণ অগ্রগামী ছিলেন। বঞ্চনা, শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা, মানব বাস্তব্যবিদ্যা এবং বিকেন্দ্রীকরণসহ ভৌগোলিক জ্ঞানের বিকাশের উপর ক্রপটকিন গুরুত্ব আরোপ করেন। গেডেসের "নতুন পৃথিবীর উদয়" ধারণায় নাগরিক চেতনা ও স্বাধীনতা বিষয়টি উন্মোচিত হয়। এক্ষেত্রে নাগরিকবৃন্দের নিজের চোখে যা যা আবলোকন করে সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ায় তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। এ ছাড়া নাগরিকবৃন্দের নিজের জন্যই জানা প্রয়োজন, এ রকম একটি চেতনা জন্মাবার প্রচেষ্টাসহ অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেদের কাজ করার উদ্যমে ব্রতী হওয়ার শিক্ষাদান ছিল গেডেসের অবদানের উল্লেখযোগ্য একটি দিক যা চিকিৎসা ভূগোলের জন্য অতি প্রয়োজনীয়।

২.২ চিকিৎসা ভূগোলের সংজ্ঞা

চিকিৎসা ভূগোলের সংজ্ঞা প্রদানের পূর্বে স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা থাকলে এক্ষেত্রে ভূগোল কতখানি অবদান রাখতে পারবে তা অনুমান করা যেতে পারে। ১৯৪৬ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রথম স্বাস্থ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদান করেন "স্বাস্থ্য বলতে একটি সামগ্রিক শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক অস্তিত্বকে বুঝায়, শুধু রোগের প্রাদুর্ভাব, দুর্বলতা অথবা বৈকল্যের অনুপস্থিতি নয়।" এ সংজ্ঞাটি দার্শনিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোগ সম্পর্কে Maya-এর সংজ্ঞা ভৌগোলিকদের নিকট বহুবার উদাহরণস্বরূপ ছিল। তাঁর মতে রোগ হলো "জীবন্ত কোষসমূহের এমন কোনো পরিবর্তন যা তার পরিবেশে অস্তিত্ব রক্ষায় অনুকূল নয়।" এখানে জীবাণুর একটি পরিবেশের যে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে ভূগোলবিদদের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ। আবার রোগের অনুপস্থিতিও স্বাস্থ্যের বিভিন্ন রকম পরিস্থিতি হতে পারে। যেমন, একজন অফিস সহকারীর শারীরিক অবস্থা এবং দৃষ্টিশক্তি একজন শিকারির মত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আবার কেউ জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী হতে পারে যা তাঁর সমাজ এবং জীবনধারণ কৌশলের উপর নির্ভর

করে। ১৯৬৫ সালে "ডুবোর" দেয়া সংজ্ঞাটিতেও পরিবেশের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাঁর মতে "সুস্থতা বা অসুস্থতা হচ্ছে পরিবেশের দাবিতে জীবাণুর সাথে টিকে থাকার সাফল্য অথবা ব্যর্থতা"। এ সংজ্ঞায় দুটি ভিন্ন অবস্থার মাঝে মিথষ্ক্রিয়ার ইঙ্গিত দেয়। পরিবেশের উপযোগী হওয়া এ বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ডাইনোসর তার পরিবেশের যথেষ্ট উপযোগী ছিল। কিন্তু পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে টিকে থাকতে পারেনি। (Audys-এর মতে স্বাস্থ্য পরিমাপ করা যায় তবে প্রমাণ করা যায় না। গবেষকরা সম্প্রতি বিভিন্ন ধারণা এবং বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিমাপ করে সরকারিভাবে নথিবদ্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। যদিও তা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

যতদিন কৌশলগত সমস্যাসমূহ অতিক্রম করা না যায় ততদিন কোনো বিষয়ের প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে নানা রকম মন্তব্য হতে থাকে। এ ধরনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা নিঃসন্দেহে উত্তম, যার ফলে একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে অধ্যয়ন করা যায়। সাথে কিছু সীমাবদ্ধতাও থেকে যায় যা অতিক্রমের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন যে, কোনটি করা উচিত নয় আর কোনটি করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় রাশিয়ার চিকিৎসা ভূগোল বহুদিনের গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। বহু বৈশিষ্ট্যের জটিল স্থানভিত্তিক আলোচনার পর গুরুত্ব দেয়া হয় যা শ্রম উন্নয়নে এবং সামাজিকভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। এ কার্যসিদ্ধিমূলক উদ্দেশ্য রাশিয়ার আঞ্চলিক চিকিৎসা ভূগোলে সুস্পষ্ট। যে কোনো স্থান, যে কোনো পরিবেশে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি থাকা স্বাভাবিক, তারপরও কোনো কোনো অঞ্চল বিশেষভাবে স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে চিহ্নিত।

পশ্চিমের চিকিৎসা ভূগোল নিদান তাত্ত্বিক গবেষণা করে যা মানবজাতির দুর্দশা লাঘবে সহায়তা করে। ভৌগোলিক গবেষণা কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মুক্ত এবং পছন্দ অনুযায়ী বিষয়ে অধ্যয়নের ফলে বিভিন্ন রকম অবদান রাখতে পারে। অবিরত বিভিন্ন শ্রেণির ডাটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সতর্ক হয়ে তা অতিক্রমের পথ বের করা যায়। ভৌগোলিক একই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন বিষয়ের স্থানিক চিত্র তুলে ধরেন বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে। যেমন, কৃষি খামারের শ্রেণিবিন্যাস করে কৃষি ভূগোলবিদ, উপকূলের পার্শ্বচিত্র তুলে ধরে ভূমিরূপবিদ এবং মৃত্যুর হার বিশ্লেষণ করে চিকিৎসা ভূগোলবিদ (McGlashan-1972)। প্রশ্ন থাকতে পারে এমন কোনো প্রয়োগযোগ্য কৌশল কি নেই যার মাধ্যমে চিকিৎসা ভূগোল জ্ঞান অর্জন করা যায়। চিকিৎসা বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। এর সাথে শারীরিক, মানসিক, পারিবেশিক বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে জড়িত। প্রতিটি বিষয় একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। যেমন মানুষ বাঁধ দিয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে শামুক, মশা, ইত্যাদি প্রাণী বসবাসের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে। আর এদের উপস্থিতি মানুষের বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এখন শরীরবিষয়ক চিকিৎসক, মানসিক পরিস্থিতি মনোবিজ্ঞানী এবং পরিবেশ নিয়ে গবেষণা করে ভূগোলবিদ। মানুষ তার খাবার এবং পরিবেশের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে উগাণ্ডায় ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব কমিয়েছে। ভূগোলবিদগণ পারিসরিক পার্থক্যের ধরনের উপরও গুরুত্ব দেন। অতএব চিকিৎসা ভূগোলের সংজ্ঞা দিতে হলে ভূগোলের পুরানো পদ্ধতিই অনুকরণ করতে হয়। অর্থাৎ চিকিৎসা ভূগোল হলো এমন একটি বিষয় যাতে নানা রোগের বা স্বাস্থ্য পরিস্থিতির স্থানিক ও কালিক বণ্টনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। পরিবেশগত নিয়ামক ও প্রভাবকসমূহ কিভাবে বিভিন্ন রোগের পারিসরিক বিস্তরণে এবং কোন কোন বিশেষ পরিবেশ ও স্থান ব্যাপকতার হার হ্রাস-বৃদ্ধিতে কাজ করে তা নিরূপণ করার চেষ্টা করে। কোন রোগ বা স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতি কোথায়, কখন, কেন এবং কিভাবে বিস্তৃতি লাভ করে বা কি পরিমাণে বা হারে রূপ পরিগ্রহ করে তার আলোচনাই চিকিৎসা

ভূগোলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বর্তমানে চিকিৎসা ভূগোল মানব কল্যাণমুখী একটি বিকাশমান বিষয়, যাতে পরিপূর্ণতা আনয়নের জন্য ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন।

২.৩ চিকিৎসা ভূগোলের ক্রমবিকাশ

ভৌগোলিক ধারণা এবং কৌশল প্রয়োগ করে চিকিৎসা ভূগোল চিকিৎসাসম্পর্কিত বিষয় অনুসন্ধান করে। অন্যান্য সামাজিক, প্রাকৃতিক এবং জীববিজ্ঞানের ন্যায় চিকিৎসা ভূগোলও বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণ করে। বিশেষজ্ঞদের অবদানের মাধ্যমে চিকিৎসা ভূগোলের ক্ষেত্র এবং পরিধি ব্যাপকতা লাভ করতে পারে। প্রাচীন এবং আধুনিক উভয় দিক থেকে ভূগোলের এ শাখাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে হেপোক্রেটিস প্রথম চিকিৎসা বিষয়ের উপর ভৌগোলিক প্রভাব অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন। তার মতে কেউ যদি চিকিৎসা বিষয়টির সঠিক অনুসন্ধান করতে চায় তবে প্রথমেই তাকে স্থানানুযায়ী ঋতুর প্রভাবকে বিবেচনায় আনতে হবে। প্রত্যেক দেশের আবহাওয়ায় বায়ুর তাপমাত্রা, চাপ, আর্দ্রতার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তবে কোনো বিশেষ স্থানে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হতে পারে। তার প্রভাব অনুসন্ধান করাই চিকিৎসা ভূগোলের প্রধান লক্ষ্য। হিপোক্রেটিস প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক মিথষ্ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে Fink, 1792-1795 ; Fuchs 1853; Hirsch, 1883-1888-তে রোগ, পরিবেশ এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে নতুন তথ্যের উদ্ভাবনের মাধ্যমে হিপোক্রেটিসের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তাদের দেয়া বিবরণ ভৌগোলিকদের দ্বারা পুনঃ আবিষ্কার এবং পুনঃমূল্যায়ন করা যেতে পারে এবং বিজ্ঞানীরা পুনরায় রোগ বাস্তব্যবিদ্যা সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে। গত ত্রিশ বছর যাবৎ স্বাস্থ্য, রোগ এবং পরিচর্যায় ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতি প্রয়োগের চিন্তাভাবনা চলছে। ১৯৫২ সালে আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক ইউনিয়নে বিবরণ প্রদানের মাধ্যমে চিকিৎসা ভূগোল পদ্ধতিগতভাবে অধ্যয়নের গুরুত্ব পায় (Melinda, John and Willbert, 1988)।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উপমহাদেশের এ অঞ্চলে একটি পথিকৃত অধ্যয়ন হিসেবে Learmonth এর চিকিৎসা ভূগোল (১৯৫৮) একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এসব অধ্যয়নে দক্ষিণ এশিয়ার চিকিৎসা ভূগোলের বিশেষ বিশেষ ধারায় বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হয়েছে এবং সে সাথে ম্যালেরিয়া, জলবসন্ত এবং কলেরা প্রভৃতি রোগের বিস্তার ও চিকিৎসা সম্পর্কে পরিবেশগত ভৌগোলিক অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয়। Learmonth এর পরিচালনায় আন্তর্জাতিক ভূগোল সংস্থার চিকিৎসা ভূগোল কমিশনের (IGU Commission on Medical Geography) আনুকূল্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা ও রোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো হয়। বৃটেনে G. M. Howe উল্লেখযোগ্য গবেষণার মাধ্যমে চিকিৎসা ভূগোলকে ভূগোলের অন্যতম একটি শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার খ্যাতি অর্জন করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মান, বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, ইন্ডিয়া, ফ্রান্স, এবং উত্তর আমেরিকার স্কুলগুলোতে বর্তমানে চিকিৎসা ভূগোল গুরুত্ব সহকারে পড়ানো হয়।

২.৪ চিকিৎসা ভূগোলের বিষয়বস্তু

প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের মধ্যে ভূগোলের আবেদন অপরিসীম। কেউ কেউ ভূগোলকে প্রাকৃতিক এবং মানবিক এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁরা ভূতত্ত্ব এবং জলবায়ু বিজ্ঞানকে অর্থনীতি ও রাজনীতি থেকে পৃথক করেছেন। এ ধরনের বিভক্তি গবেষণার কাঠামো তৈরিতে অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু এটি সাধারণ গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা এমন অনেক উপবিভাগ রয়েছে যা একসাথে প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক উভয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নের উদ্রেক করে। সাধারণত ভূগোলের গবেষণায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। বিষয়সমূহ কোথায় কিভাবে বিন্যস্ত তার নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে সাধারণীকরণ

করে সর্বোচ্চ অবস্থা চিহ্নিতকরণের উপর ভূগোল গুরুত্ব দেয়। বিশেষ কাঠামোয় দক্ষতার সাথে অগ্রসর হয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছে মৌলিক ধারণা অর্জনে চিকিৎসা ভূগোল অনুসন্ধান চালায়।

ঐতিহ্যগতভাবে মানব–ভূমি গবেষণায় প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ে ভূগোল আলোচনা করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বেশিরভাগ ভূগোলবিদ পারিবেশিক নিমিত্তবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এ মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করতেন প্রাকৃতিক পরিবেশ মানবিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানবিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতির বিবেচনায় সম্ভাবনাবাদের উদ্রেক হয়। পরবর্তীতে আচরণবাদ দ্বারা পরিবেশবাদ এবং সম্ভাবনাবাদ উভয়ে অপসারিত হলে মানুষের ইচ্ছার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। মানুষ কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যাখ্যা, মূল্যায়ন ও অনুধাবণ করে মিথষ্ক্রিয়া সম্পন্ন করে, ভূগোল সম্প্রতি এ বিষয়ে গবেষণা করছে। পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানুষ কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে যেমন– ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা প্রভৃতির জন্য মানুষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে পরিবেশের সাথে মানুষের মিথষ্ক্রিয়ার পর্যালোচনাই ভূগোলের প্রধান বিষয়। এছাড়া আঞ্চলিক ভূগোলের আছে ঐতিহ্যগত ইতিহাস, অংকনবিদ্যা ভূগোলের নিজস্ব একটি বিষয়। পুরাতন প্রবাদ আছে "কোন কিছু যদি ম্যাপে প্রদর্শন করা না যায় তবে তা ভূগোল নয়।" বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক কৌশল যা অন্যান্য বিষয়েও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মানচিত্র একটি একক, শক্তিশালী এবং আকর্ষণীয় বিষয় যা শুধু ভূগোল বিভিন্ন মৌলিক বিষয়সমূহ বিশ্লেষণে ব্যবহার করে। মানচিত্র পৃথিবীতে মডেলস্বরূপ যা পয়েন্ট, রেখা, প্রতীক প্রভৃতির সাহায্য বাস্তবতাকে প্রকাশ করে। কম্পিউটার পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে মানচিত্র অংকনবিদ্যার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির (Geographic information system) ভূমিকা চিকিৎসা ভূগোলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্যার ডাডলি স্ট্যাম্প চিকিৎসা ভূগোলকে একটি গবেষণামূলক বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ভূগোলে আধুনিক সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে এ বিষয়কে আরো উপযোগী করে তোলা যায়। চিকিৎসা ভূগোলের কাজ হলো ভূগোলের নিপুণতা দিয়ে চিকিৎসাবিদ্যাকে সহজ করে দেয়া, যেখানে চিকিৎসকদের কোনো ভূমিকা নেই। চিকিৎসা ভূগোলের সুনির্দিষ্ট কাঠামো এখনো কুয়াশাচ্ছন্ন। অবিরত চেষ্টা এবং আন্তঃবিষয়ের সদস্যদের সহযোগিতায় এ সমস্যার সমাধান পাওয়া যেতে পারে। চিকিৎসা ভূগোল এমন একটি বিষয় যার কোনো শেষ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চিকিৎসাবিদ্যা বায়ু, পানি, মৃত্তিকা, উদ্ভিদ, প্রাণী, কীটপতঙ্গ, খাদ্যাভ্যাস, আচরণ, প্রথা, বসতবাড়ির ধরন, সরকার, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ছিল। নিদানতত্ত্বের বিশেষ মতবাদ কি ? এ প্রশ্নটি ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করে, যার ফলে বিভিন্ন রকম জীবাণুনাশক, টিকা, ক্লোরিনের সাহায্যে পানি শোধন, এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে উন্নত দেশে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে।

কোন স্থানের কোন শ্রেণির মানুষ কি ধরনের রোগে আক্রান্ত হয় তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। যে কোনো রোগের জন্য শুধু জীবাণুই দায়ী নয় বরং বংশগতি, চিকিৎসা ব্যবস্থা, বর্তমান রোগের পরিস্থিতি, ঘনবসতি, বায়ু চলাচল ব্যবস্থা, মানসিক অবস্থা রোগকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং মানুষের স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতনতা যত বাড়ছে সমাজবিজ্ঞান ততবেশি এ বিষয়ের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। গত কয়েক দশকে চিকিৎসা নৃতত্ত্ব, চিকিৎসা সমাজবিজ্ঞান, চিকিৎসা অর্থনীতি এবং চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের দ্রুত উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিকগণ বিশেষ রোগের জন্য কিছু সামাজিক বা অর্থনৈতিক কারণকে দায়ী করেন। তাঁরা সাম্রাজ্য বিস্তার এবং বাণিজ্যের উন্নতি রোগ বিস্তারে কোনো ভূমিকা রাখে কিনা তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। কৌশলগত পরিবর্তন সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ফলে স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত বিষয় যেমন পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, পানির ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং সম্পদের বণ্টন

পদ্ধতির সঠিক বাস্তবায়ন সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটায়। অর্থনীতির বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে অর্থকে আরো বেশি কার্যকর খাতে ব্যয় করা যায়। সমাজবিজ্ঞানী সমাজের বিভিন্ন দুর্বল দিক তুলে ধরতে পারেন। নৃতত্ত্ববিদ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিশ্বাস দূরীভূত করে সঠিক তথ্য প্রদান করতে পারে। এভাবে চিকিৎসা ভূগোল সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়ের ধারণা এবং পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে পারে।

চিকিৎসা ভূগোল প্রশিক্ষণে মহামারী তত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পরজীবীবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, স্বাস্থ্য প্রশাসন, পরিবেশ প্রকৌশল এবং জীব পরিসংখ্যান প্রভৃতি বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটে। অর্থাৎ চিকিৎসা ভূগোল প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে সম্পর্কের উন্নতি সাধন করে। তবে এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজন পেশাগত ভূগোলবিদ প্রয়োজন। যার কোনো পদ্ধতিগত ঝোঁক এবং আঞ্চলিক উৎসাহ নেই তাঁর পক্ষে ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাস্থ্য সমস্যার আংশিক বিষয়ও অনুধাবন সম্ভব নয়। চিকিৎসা ভূগোলের উন্নতি সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ, অনুধাবন এবং স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কে মানুষের প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করছে।

২.৫ প্রাসঙ্গিক লিখিত কাজের পর্যালোচনা

কুষ্ঠরোগের উপর প্রচুর পরিমাণ বই, প্রবন্ধ, সাময়িক প্রতিবেদন রয়েছে। কিন্তু ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশে এ বিষয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয় নি। জাতীয় প্রতিষেধক এবং সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (NIPSOM)-এ অধ্যয়নরত কিছু চিকিৎসক দেশের বিভিন্ন স্থানের কুষ্ঠরোগীদের উপর এবং কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের উপর গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। নিম্নে সেগুলো পর্যালোচনা করা হলো :

আলমগীর (১৯৮৭) "Review of leprosy control programme in Bangladesh". নামক প্রবন্ধে বাংলাদেশে সে সময়কার কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম তুলে ধরেন। সংক্ষেপে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতির বর্ণনা করেন। কুষ্ঠরোগের ইতিহাস, রোগতত্ত্ব, ধরন, চিকিৎসা ব্যবস্থা, বিশ্ব পরিস্থিতি ইত্যাদির উপরও আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন পারিবারিক সংস্পর্শে কুষ্ঠরোগ হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে এবং এটি সাধারণভাবে দারিদ্রের সাথে সম্পর্কিত। দীর্ঘদিনের বিশ্বাস, অতিরিক্ত ঘনবসতি রোগ সংক্রমণে সহায়তা করে। মানুষের শরীরের বাইরে মাইকোব্যাক্টেরিয়াম লেপ্রি (কুষ্ঠ জীবাণু) বেঁচে থাকতে জলবায়ু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নাসিকা নিঃসৃত রসে কুষ্ঠজীবাণু কমপক্ষে নয়দিন বেঁচে থাকতে পারে। লক্ষ্য করা হয়েছে যে আর্দ্রতা অনুকূল হলে এ জীবাণু ৪৬ দিন পর্যন্ত টিকে থাকে। উঁচু স্থান, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, কুষ্ঠরোগকে প্রভাবিত করে। এর সাথে সূর্যের আলোরও সম্পর্ক থাকতে পারে। কুষ্ঠরোগ বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা হলেও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কুষ্ঠরোগী নীলফামারী, রংপুর এবং দিনাজপুর অঞ্চলে অবস্থান করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তখন দেশে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের কাঠামো ছিল অত্যন্ত দুর্বল। অনিয়মিত চিকিৎসার ফলে প্রাথমিকভাবে সৃষ্ট ড্যাপসন প্রতিরোধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য ছিল একটি বিরাট হুমকি। তখনও বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোক এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব ছিল প্রধান সমস্যা। স্বাস্থ্যশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। শহর এবং গ্রামে সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য এবং রোগ সম্পর্কে স্বেচ্ছায় জানানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়। দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে জটিল রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। রোগীদের নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ এবং কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ সহকারীরা

প্রয়োজনে রোগীর বাসস্থানে গিয়ে খোঁজ নিবে, এ ধরনের একটি স্থানীয় প্রক্রিয়া চলতে থাকলে সামাজিক কুসংস্কার দূরীভূত হবে। উক্ত প্রবন্ধে বাংলাদেশের কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সম্বন্ধেই শুধু আলোচনা করেছে। কুষ্ঠরোগীদের শারীরিক, আর্থ–সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্যই সংগ্রহ করা হয় নি।

সামাদ (১৯৮৮) তার "Study on Medico Social Aspect of Leprosy Patients" নামক গবেষণা নিবন্ধে কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক অবস্থা এবং রোগ সম্পর্কে রোগীদের প্রকৃত ধারণা কি তা জানার চেষ্টা করেন। তিনি শুধু ঢাকার মহাখালী হাসপাতালে এবং দুটি ভ্রাম্যমাণ কুষ্ঠ ক্লিনিকের রোগীদের নিয়ে গবেষণা করেন। এ গবেষণায় নমুনা কুষ্ঠরোগীদের ৫৭.৪% পুরুষ এবং ৪২.৬% মহিলা, ২১–৩০ বছর বয়সের কুষ্ঠরোগী সবচেয়ে বেশি। ৮৬.৮% কুষ্ঠরোগী মুসলমান, ১০.৩% হিন্দু, এবং ২.৯% খ্রিস্টান। রোগীদের পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৮.৪% চাকরিজীবী, ১৯.৯% বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত। ২৮.৬% কৃষি, ৯.৬% ভিক্ষুক এবং ২৩.৫% রোগী অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত। ৮৯.৭% রোগী তাদের পেশার কোনো পরিবর্তন করে নি। ৭.৪% রোগী কুষ্ঠরোগের কারণে পেশা পরিবর্তন করেছে। শুধু ঢাকা শহরের রোগীদের উপর তথ্য সংগ্রহ করাতে পেশার এমন চিত্র এসেছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের রোগীদের নেয়া হলে কৃষি ক্ষেত্রে রোগীর হার আরও বেশি হতো। রোগের আগে ও পরে কুষ্ঠরোগীদের পেশার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া গেছে এ প্রবন্ধে। রোগের পরে ০–৫০০ টাকা মাসিক আয় শ্রেণির রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৮.৮% থেকে ৩৩.৮% এ উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে ১০০১–২০০০ টাকা মাসিক আয় শ্রেণির রোগীর সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে কমে ৪২.৭% থেকে ১৯১.%–তে নেমে এসেছে। ৫২% রোগীর পরিবারের সদস্য সংখ্যা চার এর উপর। বেশিরভাগ রোগী অতিরিক্ত ভিড় এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে। রোগের সংক্রমণতা সম্পর্কে ৫৫.৯% রোগীরই কোনো জ্ঞান নেই। রোগের ভাল হয়ে যাওয়ার সম্পর্কে ২৩.৫% রোগীর কোনো ধারণা নেই। রোগের কারণ সম্পর্কে ২৯.৪% রোগী বলেছে জীবাণু দ্বারা হয়। বাকি রোগীরা বাজে অভ্যাস, অভিশাপ, বা কোনো কৃতকর্মের ফল বলে মনে করেন। ৯২.৬% রোগীর বিশ্বাস ওষুধ প্রয়োগে কুষ্ঠরোগ ভাল হয়ে যায়। অন্যদের কোনো সঠিক ধারণা নেই। নমুনা রোগীদের ৮০.৯% বিবাহিত এবং ১৯.১% অবিবাহিত। বিবাহিতদের ৮৯.১% রোগ হওয়ার পূর্বেই বিয়ে করেছে। ৭.৫% রোগী রোগাক্রান্ত অবস্থায়ই বিয়ে করেছে। কিন্তু ১০০% রোগীই বিয়ের সময় রোগের কথা বলেনি। এ গবেষণায় আরো দেখা যায় ৬৭.৬% রোগী তাদের রোগের কথা আত্মীয় প্রতিবেশীর কাছে লুকায় না। কিন্তু বাকি ৩২.৪% কুষ্ঠরোগের কথা কাউকে বলে না। ২৬.২% রোগীর প্রতিবেশী তাদের প্রতি সহনশীল নয়। ২৩.৯% রোগীকে ঘৃণা করে। এভাবে বেশিরভাগ রোগীই সমাজে অবহেলার স্বীকার। এ গবেষণায় রোগীদের আর্থ–সামাজিক অবস্থা, রোগ সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। পারিবেশিক বা অবস্থানগত কোনো তথ্যই অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

আক্তার (১৯৯১) তাঁর Diploma in community Medicine ডিগ্রির জন্য লিখিত প্রবন্ধ "Study on social aspect among the community peoples of two generation in respect of leprosy" –এ নীলফামারী জেলায় দু'টি থানার দু'প্রজন্মের মোট দু'শ লোকের উপর গবেষণা কাজ পরিচালনা করেন। তিনি ১৫–৪০ বছর বয়সের লোকদের প্রথম প্রজন্ম এবং চল্লিশোর্ধ লোকদের দ্বিতীয় প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ গবেষণায় বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি কুষ্ঠরোগ আক্রান্ত এলাকায় মানুষের মতামত জানা যায়। প্রশ্নপত্র জরিপে উত্তর দাতাদের মধ্যে প্রথম প্রজন্মের ৮২% পুরুষ, ১৮% মহিলা, এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের ৮৮% পুরুষ, ১২% মহিলা। এদের মধ্যে ৮০% লোকের মাসিক আয় এক হাজার টাকার নিচে। ৬৫% অশিক্ষিত, ২০% এর রয়েছে

প্রাথমিক শিক্ষা। বেশিরভাগ নমুনা ব্যক্তি দিন মজুর (৩৪.৫%)। ১৯% কৃষক, ১৭% ব্যবসায়ী, ১০% ভিক্ষুক, ৮% ছাত্র।

প্রথম প্রজন্মের ৪৬% এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের ৪২.২% এর ধারণা কুষ্ঠরোগের কারণ হলো কোনো প্রকার খারাপ কাজ বা পাপপূর্ণ কাজ। প্রথম প্রজন্মের মাত্র ১৮.৫০% এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের ৭.২% জানে যে কুষ্ঠরোগ জীবাণু দ্বারা হয়। এ গবেষণা অনুযায়ী প্রথম প্রজন্মের ৬৭% এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের ৪৪% এর ধারণা কুষ্ঠরোগ বংশগত। দু'শ্রেণির কোনো পরিবারেই কুষ্ঠরোগী নেই। প্রথম প্রজন্মের ১৬% এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের ২৩% লোক এ রোগকে ঘৃণা করে। ৪২% প্রথম এবং ৬০% দ্বিতীয় প্রজন্মের উত্তর দাতারা কুষ্ঠরোগীদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে রাজি নয়। ৮৩% প্রথম এবং ৯২% দ্বিতীয় প্রজন্মের লোক কুষ্ঠরোগীর বাড়ি যেতেও রাজি নয়। এটি প্রমাণ করে যে সমাজে প্রচণ্ড ভীতি এবং ভুল ধারণা রয়ে গেছে। গবেষণায় আরো দেখা যায় মাত্র ১৯% প্রথম প্রজন্মের এবং ৩% দ্বিতীয় প্রজন্মের লোক কুষ্ঠরোগীকে আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছে।

এ গবেষণা একদিকে যেমন একটি স্থানের মানুষের আর্থ-সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে অপর দিকে কুষ্ঠরোগে সবচেয়ে বেশি দুর্গত এলাকার লোকের প্রতি ধারণা এবং রোগীদের প্রতি তাদের মনোভাব জেনে কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক পরিস্থিতি জানা যায়। ফলাফলে দেখা যায় ভীতি, কুসংস্কার, প্রথা, বিশ্বাস কুষ্ঠরোগকে আরো জটিল করে তুলেছে। তবে দ্বিতীয় প্রজন্মের চেয়ে প্রথম প্রজন্মের ধারণার কিছুটা উন্নতি দেখে আশা করা যায় ধীরে হলে ও পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে।

মতিউল্লাহ (১৯৯৩) Study on factors responsible for endemicity of leprosy in northern area of Bangladesh " নামক গবেষণা প্রতিবেদনটি Master's of Public Health Education" ডিগ্রি অর্জনের জন্য তৈরি করেন। এ উদ্দেশ্যে বগুড়া কুষ্ঠ ক্লিনিকের ১০০ জন কুষ্ঠরোগীর উপর প্রশ্ন-পত্র জরিপ করেন। তাঁর গবেষণা অনুযায়ী ৩০-৩৯ বছর বয়স শ্রেণি লোকের কুষ্ঠরোগ বেশি হয় এবং নারী পুরুষ অনুপাত ১ : ২.৪৪। ব্যাপকতার ধরন কিছু এলাকায় বেশি দেখা যায় ; যেমন : ১০০ জনের মধ্যে ২৩ জন রোগী এসেছে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ থানা থেকে যা ক্লিনিক কুষ্ঠ থেকে ৬০ কি.মি. দূরে এবং এরা সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের। ১১ জন রোগী পাওয়া গেছে যারা ইন্ডিয়া থেকে এসেছে, কুষ্ঠ ক্লিনিকের পাশেই কলোনীতে বাস করে। ৩৪% রোগীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের। শীঘ্র রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল। ২৭% রোগী চিকিৎসা গ্রহণের জন্য ৫০ কি. মি. বা তার চেয়ে বেশি দূরে থেকে আসে। ক্লিনিকটি কুষ্ঠরোগীদের রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে জীবন রক্ষাকারী ভূমিকা পালন করছে। এ গবেষণা আরো ব্যক্ত করে যে, কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক পরিস্থিতি মোটেই বদলায় নি। বেশিরভাগ রোগী তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের দ্বারা বিতাড়িত। খুব সামান্য সংখ্যক রোগীর রোগের কারণ, প্রকৃতি এবং চিকিৎসা সম্পর্কে সঠিক ধারণা রয়েছে। এর কারণ হলো দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং পুনঃ পুনঃ চিকিৎসা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। উল্লেখ্য কুষ্ঠরোগ সেরে যাওয়ার পরও অনুভূতিহীন স্থানে কোনো কারণে ঘা হতে পারে। তখন কুষ্ঠ জীবাণু নাও থাকতে পারে। কিন্তু কুষ্ঠরোগীরা তা বুঝতে পারে না। কুষ্ঠরোগের প্রতি ভুল ধারণার এটি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। অতিরিক্ত জনতার ভিড় এবং বড় পরিবার রোগের সংক্রমণে সহায়তা করে।

বহুদিনের পুরানো ভুল ধারণা এবং ভুল তথ্যের কারণে কুষ্ঠরোগ সমাজের প্রতিটি স্তরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এটিই কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণে প্রধান বাধা হিসেবে উক্ত গবেষণায় উল্লেখ করা হয়। এ প্রতিবেদনে রোগের ব্যাপকতার ভিত্তিতে স্থানকে নিম্নলিখিত পাঁচটি ভাগে ভাগ করেন :

(১) অনাক্রান্ত এলাকা : যেখানে কোনো সংক্রামক রোগী নেই এবং পাঁচ বছরের মধ্যে স্থানীয় কোনো নতুন রোগী দেখা যায় নি। অসংক্রামক রোগীর সংখ্যা প্রতি হাজারে এক এর কম থাকবে।

(২) কম আক্রান্ত এলাকা : যে স্থানে ব্যাপকতার হার প্রতি হাজারে ১–২.৫ এবং পাঁচ বছর কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ফলে নতুন রোগীর আবির্ভাব এবং পুরাতন রোগীর অপসারণের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য থাকবে।

(৩) মাঝারি ধরনের অঞ্চল : এমন ধরনের অঞ্চল যেখানে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার হার প্রতি হাজারে ২.৫–৭.৫ এবং প্রতি বছর খুব সীমিতসংখ্যক নতুন রোগী পাওয়া যায়।

(৪) বেশি রোগগ্রস্ত অঞ্চল : যে সকল স্থানে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার হার প্রতি হাজারে ৭.৫–১০ এবং পাঁচ বছর কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার পরও নতুন রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে তাকে বেশি রোগগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

(৫) খুব বেশি রোগগ্রস্ত অঞ্চল : ব্যাপকতার হার প্রতি হাজারে ১০ এর উপরে এবং নতুন রোগীর ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অঞ্চলকে খুব বেশি রোগাক্রান্ত এলাকা বলা হয়েছে।

কালাম (১৯৯৪) "A study on disability pattern of leprosy patients in a selected hospital in Bangladesh." নামক গবেষণা প্রতিবেদন তৈরির জন্য সিলেট কুষ্ঠ হাসপাতালের মোট ১২৩ জন রোগীর উপর প্রশ্নপত্র জরিপ পরিচালনা করেন। গবেষণায় দেখা যায় ১৪–৩৫ বছর বয়সের রোগীর সংখ্যা বেশি। নারী পুরুষ অনুপাত ১ : ৬.২। ৭৪% অশিক্ষিত রোগীদের পেশা কৃষি, এবং দিনমজুর। বেশিরভাগ রোগীর মাসিক আয় ১৫০০ টাকার নিচে। ৪৪.৭% রোগী রোগের জটিলতার কারণে তার পেশা পরিবর্তন করেছে। ৪৩.৯% রোগীর কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৪৫% এর আছে ভুল ধারণা। ৬০.২% রোগী শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ। এর মধ্যে ৫২.৭% রোগীর শুধু পায়ে সমস্যা, ২৯.৬% রোগীর পা এবং হাত দুটোতেই সমস্যা। এবং ২১% রোগীর শুধু হাতে, ৪.১% রোগীর চোখ এবং ১.৪% রোগীর নাকে সমস্যা আছে। বেশিরভাগ রোগী বহু ওষুধ (MDT) গ্রহণ করে (৫৭.৮%)। ৫১.২% রোগী অনিয়মিত চিকিৎসা নেয়। সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। কুষ্ঠরোগীদের অক্ষমতার হার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ৫১–৬০ বছর বয়স শ্রেণির। মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরা বেশি ভুক্তভোগী। আর্থ–সামাজিকভাবে নিম্ন শ্রেণির মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা যায়। অর্থনৈতিক অবস্থা রোগ এবং অক্ষমতা সৃষ্টিকে প্রভাবিত করে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগীর মধ্যে শারীরিক বিকলাঙ্গতা দেখা যায়। হাতের চেয়ে পায়েই সমস্যা বেশি রয়েছে। কুষ্ঠরোগে ভুক্তভোগীরা অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অশিক্ষা এবং সামাজিকভাবে অবহেলার ভয়ে চিকিৎসার জন্য দেরিতে আসে। চিকিৎসা নিলেও আবার অনিয়মিতভাবে নেয়। এগুলোই বিকলাঙ্গতা সৃষ্টির প্রধান কারণ। এ গবেষণায় দেখা যায় ৬০.২% রোগীর শারীরিক বিকলাঙ্গতা রয়েছে।

প্রবীর কুমার কুণ্ডু তাঁর এম.এস.সি. রিপোর্ট (১৯৯০)–এ কুষ্ঠরোগের সামাজিক এবং পারিবেশিক দিক তুলে ধরেন। সম্ভবত বাংলাদেশে এটিই প্রথম এবং একমাত্র জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে করা প্রতিবেদন। এ বিবরণীতে প্রথমেই উল্লেখ করা হয় বিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের আবেদন অনেক সময় ধরে পৃথিবীতে থাকলেও খুব কমসংখ্যক মাঠ পর্যায়ের গবেষণা হওয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতভেদ রয়ে গেছে। কুষ্ঠরোগের চিকিৎসাবিষয়ক দিক যেমন — রোগের কারণ, সংক্রমণতা, লক্ষণ, চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি ছাড়াও আর্থ–সামাজিক এবং পারিবেশিক প্রভাব খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। নীলফামারী

জেলার নীলফামারী পৌরসভার কুষ্ঠরোগীদের উপর পরিচালিত প্রশ্নপত্র জরিপে দেখা যায় বেশিরভাগ রোগী অত্যন্ত দরিদ্র এবং তারা পুষ্টিকর খাবার, উপযুক্ত পরিচ্ছদ, বসবাসের স্থানসহ জীবনের মৌলিক জিনিস জোগাতে অক্ষম। দরিদ্র এবং অশিক্ষিত জনগণ স্বাস্থ্যের পর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে একেবারেই সতর্ক নয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করায় অধিবাসীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এ গবেষণায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে বিহারী মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে এবং চা বাগানের শ্রমিকরা যারা মূলত দক্ষিণ ভারত, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশ থেকে বহু বছর আগে সিলেটে এসেছে তাদের মধ্যে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার হার বেশি। নীলফামারী উপজেলায় লোকসংখ্যার একটি বিরাট অংশ বিহারী মুসলমান। ঐ স্থানে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার হার বেশি হওয়ার এটি একটি প্রধান কারণ। পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন বসতবাড়ির ধরন, দরিদ্রাবস্থা, ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ, বায়ু চলাচলের অব্যবস্থা এবং সূর্যালোকের অনুপস্থিতি কুষ্ঠ জীবাণুর জীবন ধারণ এবং সংক্রমণকে সম্ভবত প্রভাবিত করে বলে অনুমান করা হয়।

বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কুষ্ঠরোগের উপর প্রথম জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে ডাঃ নূরুদ্দীন সামাজিকভাবে কুষ্ঠরোগের পরিস্থিতির উপর একটি ছোট বিবরণ প্রদান করেন। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার ৮০টি দেশ বা অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কুষ্ঠরোগী রয়েছে। এ সব অঞ্চলে গড়ে ব্যাপকতার হার প্রতি দশ হাজারে এক এর উপরে রয়েছে। সব মিলিয়ে কুষ্ঠরোগের ফলে অক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে দুই থেকে তিন মিলিয়ন রোগীর কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণে বহু ওষুধ প্রয়োগ পদ্ধতির উপর বর্ণনা দিয়ে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। বর্তমানে প্রয়োগকৃত এমডিটি (MDT)–এর একটা সাফল্যজনক ইতিহাস থাকলেও ভবিষ্যতে আরো সহজ পদ্ধতিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব দেন। কায়রোতে অনুষ্ঠিত এক সভায় বাংলাদেশ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের পুনঃ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক ডঃ আহসান আলী বাংলাদেশের কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বর্তমান পরিস্থিতির সূক্ষ্ম বর্ণনা প্রদান করেন। দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের পটভূমি, জাতীয় নির্দেশিকা, প্রশিক্ষণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রমের একটি খসড়া নক্সা প্রণয়ন করেন।

"Estimating the size of the leprosy problem : The Bangladesh experience". শিরোনামে Richardus J. H. এবং Croft R.P. কর্তৃক সম্প্রতি একটি ছোট প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।। এ উদ্দেশ্যে রাজশাহী বিভাগের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী এবং রংপুর জেলায় জরিপ কাজ চালানো হয়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনুমান করা হয় রাজশাহী বিভাগের উত্তরের জেলাগুলোর চেয়ে দক্ষিণের জেলাগুলোতে কুষ্ঠরোগের প্রকোপ কম। এ রিপোর্টেও ভারতের বিহার রাজ্য থেকে আসা জনগণের মধ্যে রোগীর পরিমাণ বেশি বলে উল্লেখ করা হয়। রাজশাহী বিভাগের উত্তরের আটটি জেলায় কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার হার প্রতি হাজারে পাঁচ, দক্ষিণের আটটি জেলায় প্রতি হাজারে দুই এবং দেশের অন্যত্র প্রতি হাজারে এক ধরা হয়। বাংলাদেশের অনুমানকৃত কুষ্ঠরোগীর চেয়ে এ হিসাব অনুযায়ী রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি দাঁড়ায়। এখানে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে গড়ে প্রতি হাজারে একজন কুষ্ঠরোগী ধরা হলেও ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত কুষ্ঠরোগীর সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা কোথাও সম্ভব হয় নি। অথচ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এ বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ।

২.৬ সারাংশ

উন্নত বিশ্ব ব্যতীত অন্যান্য দেশে চিকিৎসা ভূগোল এখনো একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। অথচ যে বিষয়ে যতবেশি সাধারণ মানুষের কাছাকাছি যেতে পারবে সে বিষয়ের সার্থকতা তত–বেশি। এ দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে দেখা যায় মানবকল্যাণমুখী বিষয়সমূহের একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে বিস্তৃত সুযোগ থাকার পরও কেন বাস্তবে কাজ হচ্ছে না এর পিছনে অনেকগুলো যুক্তি উপস্থাপন করা যায়। প্রধান কারণ হলো প্রতিটি মানুষের একান্ত নিজস্ব কিছু চাহিদা আছে। তারপর সে মানবকল্যাণমূলক চিন্তা ভাবনার সুযোগ পাবে। কিন্তু একটি অনুন্নত দেশে অনেক কষ্টের পরও নিজের মৌলিক চাহিদাগুলো মিটাতে মানুষ হিমশিম খায়। বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা চিন্তা করার সুযোগ পায় না। সাময়িক সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এছাড়া আন্তর্জাতিক চক্রের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে দীর্ঘদিনের পরনির্ভরশীলতা এবং অভ্যন্তরীণ সামগ্রিক অব্যবস্থার কারণে উন্নয়নশীল দেশের জনগণের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। একটি স্থানের সমস্যা ঐ স্থানের জনগণই চিহ্নিত করবে এবং দীর্ঘদিনের সাধনায় বেরিয়ে আশা একটি পদ্ধতির সাহায্য সমাধান করবে। এ পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে। তাই বলে উন্নত দেশসমূহে তৈরি হওয়া মডেল থেকে সাহায্য নেয়া যাবে না এ ধরনের কোনো বাধাবিঘ্ন থাকাটাও উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের একটি স্তরে পৌঁছানোর জন্য বহু সময় ধরে কাজ করে যেতে হয়। চিকিৎসা ভূগোলের ক্ষেত্রে কাজের সবে সূচনা হয়েছে। এর সাথে যদি সরকারি এবং সমাজের সংশ্লিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে আসেন তাহলে চিকিৎসা ভূগোলের ন্যায় একটি প্রয়োগযোগ্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হবে, মানবকল্যাণেও এর সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা যাবে।

তৃতীয় অধ্যায়
কুষ্ঠ : রোগতত্ত্ব

৩.১ কুষ্ঠরোগতত্ত্ব

কুষ্ঠরোগ একপ্রকার জীবাণু দ্বারা গঠিত সামান্য মাত্রায় সংক্রামক রোগবিশেষ। আমাদের সামাজিক জীবনে কুষ্ঠ একটি ঘৃণিত রোগের নাম। জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত এই রোগের কোনো জ্বালা যন্ত্রণা নেই। নেই কোনো অনুভূতি। অথচ এই রোগের জীবাণু অতি শান্তভাবে ধীরে ধীরে মানব দেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আক্রমণ করে হাত, পা, নাক, চোখ ও অন্যান্য অঙ্গ ক্ষয় করতে থাকে। মানুষ সঠিক সময়ে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা না করলে সে তার স্বাভাবিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারিয়ে পরিবার, সমাজ ও গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরনির্ভরশীল এক দুর্বিসহ জীবনযাপনে নিপতিত হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কুষ্ঠরোগ এখনও প্রধান সমস্যা। কুষ্ঠরোগ অধ্যুষিত দেশে বসবাসকারী অনেক লোক এখনো এ রোগকে এজন্ম অথবা পূর্বজন্মের কৃত কোনো পাপ কাজের পরিণতি, ডাকিনী, দুরাত্মা বা ভগবানের দেয়া শাস্তি বলে মনে করেন। কার্যত কুষ্ঠরোগ কুষ্ঠজীবাণুঘটিত দীর্ঘস্থায়ী কম সংক্রামক রোগ যা প্রাথমিকভাবে ত্বক, নাকের ঝিল্লি ও প্রান্তিক স্নায়ুকে আক্রান্ত করে। মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি (Mycobacterium leprae) নামক জীবাণু এ রোগ ঘটায়।

১৮৭৩ সালে নরওয়ের জীবাণুতত্ত্ববিদ ডঃ জি. এ. হ্যানসেন কুষ্ঠরোগ জীবাণুঘটিত বলে প্রমাণ করেন। সে সময় থেকে এ রোগ হ্যানসেন রোগ বলেও পরিচিতি পায়। কুষ্ঠরোগের দুটি প্রধান রূপ হলো—পসিব্যাসিলারী এবং মাল্টিব্যাসিলারী। মাল্টিব্যাসিলারী কুষ্ঠরোগীদের শরীরে জীবাণুর সংখ্যা খুব বেশি হয় এবং এরাই রোগ বিস্তারের প্রধান উৎস। পসিব্যাসিলারী কুষ্ঠরোগীরা অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক। রোগীর দেহে জীবাণুর সংখ্যা কম হওয়াতে সাধারণত অসংক্রামক হয় (উল্লাহ, ১৮৮৯)।

যদিও কুষ্ঠের মত রোগ স্বাভাবিকভাবে আর্মাডিল্লো, একটি শিম্পাঞ্জি ও দুটি ম্যাঙ্গাবী জাতের বাঁদরের মধ্যে দেখা গেছে তবুও মনে করা হয় যে, কুষ্ঠরোগ কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রধানত অচিকিৎসিত সক্রিয় মাল্টিব্যাসিলারী রোগীর দেহ থেকেই এ রোগ সুস্থ লোকের দেহে সংক্রামিত হয়। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে দীর্ঘ মেয়াদী সংক্রমণ প্রক্রিয়ায় কাঁচা ক্ষতসম্পন্ন কুষ্ঠরোগীর নাক এবং চামড়ার ঘা বা ক্ষত দিয়ে নির্গত লেপ্রায়েসিলান ফোঁটা বা ড্রপলেট (Droplets) হিসেবে সুস্থ লোকের শরীরে — বিশেষ করে ঘা বা ক্ষতসম্পন্ন চামড়া বা ত্বকে লেগে ঐ লোকের মধ্যে এ রোগের জীবাণুর সংক্রমণ ঘটায়। মানুষের শরীরে জীবাণু গঠিত রোগ হতে পারে, কুষ্ঠ তাদের মধ্যে সবচেয়ে জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী। মানুষের দেহে জীবাণু প্রবেশের অনেক পরে রোগের লক্ষণ দেখা যায়। ঠিক কতদিন পর রোগের লক্ষণ দেখা যাবে তা অবশ্য সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে গবেষণা থেকে জানা যায়, এ রোগের সংক্রমণের জন্য খুবই দীর্ঘদিনের জন্য রোগী ও সুস্থ লোকের ঘনিষ্ট সম্পর্কের দরকার হয়। কমপক্ষে ২—১৫ দিন এবং সর্বোচ্চ ৪০ বছর পর্যন্ত নথিবদ্ধ আছে। সাধারণত ১০-২০ বছর বয়স সীমার মধ্যে এ রোগ

সংক্রমণের হার বেশি দেখা যায়। এ রোগ ছেলেদেরই বেশি হয়। ভারতবর্ষে বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে এর অনুপাত হলো ২ : ১ (ম্যাকডুগাল ও ইয়ালকার, ১৯৮৯)। কুষ্ঠরোগ বংশগত নয়। কুষ্ঠরোগীকে পৃথক রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। সংক্রামক রোগীদের মাল্টিড্রাগ দিয়ে চিকিৎসা করলে কিছুদিনের মধ্যেই অসংক্রামক করে তোলা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় করাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

কুষ্ঠরোগের টিকা নিয়ে গবেষণা চলছে। তবে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা কত এবং তা সাধারণের ব্যবহারের জন্য কতটা নিরাপদ তা দেখতে হলে আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং বর্তমানে কুষ্ঠ প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় ও মাল্টিড্রাগ দিয়ে চিকিৎসা করে রোগের উৎস নির্মূল করা। অর্থাৎ কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধ করার উপায় এখনো মানুষের নাগালের বাইরে। মাল্টিড্রাগ প্রয়োগ করে এবং সামাজিকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করে এরোগ শুধু নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

৩.২ কুষ্ঠরোগের ইতিহাস

কুষ্ঠরোগ আধুনিক সভ্যতা ও শিল্পায়নের ফলে উদ্ভূত হয় নি। বিজ্ঞানের উন্নয়নের সাথে সাথে কুষ্ঠরোগের নতুন তথ্য পাওয়া সত্ত্বেও একে ঘিরে মানুষের ভয় ও ভ্রান্ত ধারণার আজও অবসান হয় নি (Thangaraj and Yawalkar, 1980)। সমাজ সংসার আজও এ রোগের কথা শুনলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ রোগের কারণে বিকলাঙ্গ হলে পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধব থেকে রোগী বিতাড়িত হয়ে পড়ে। অনেক রোগী তার চাকরি হারায়, বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়। আর জীবনযাপনের জন্য বেছে নেয় ভিক্ষাবৃত্তিকে। তারা নিজেদের প্রকৃত পরিচয় ভুলে পৃথক জাতি হিসেবে পরিচিতি পায়। এসব কারণেই কুষ্ঠরোগকে ঘিরে মানুষের ভয়ভীতি আরো বেশি হয়। এ ভয় থেকেই ভুল ধারণা, কুসংস্কার ও অবমূল্যায়নের উৎপত্তি হয়। এগুলোই কুষ্ঠ সমস্যা সমাধানের প্রধান অন্তরায়।

৪৬০০ খ্রিষ্টপূর্বে মিশরের প্যাপিরাসে কুষ্ঠরোগের কথা লিপিবদ্ধ আছে। ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বে পারস্য দেশের প্যাপিরাস লিপিতে কুষ্ঠরোগীদের শহর থেকে বহিষ্কারের কথা আছে। ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বে ঋগবেদে কুষ্ঠ শব্দটি উল্লেখ করা আছে। ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বে জাপানে প্রথম কুষ্ঠরোগের পরিচয় পাওয়া যায়। ৭৩০ খ্রিষ্টপূর্বে চীনের হুয়াংতির লেখায় কুষ্ঠরোগের স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বে ভারতীয় চিকিৎসকের লিখিত "শুশ্রুত সংহিতা" গ্রন্থে এ রোগের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে। বাইবেলেও এ রোগ সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ঋগবেদের মতানুসারে সংস্কৃত "কুষনাতি" অর্থাৎ ক্ষয়ে যাওয়া কথা থেকেই কুষ্ঠ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। চীন দেশে, খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ বছর আগের চিকিৎসা গ্রন্থ 'নাইজিং' এ কুষ্ঠরোগের লক্ষণগুলো ডাফেং নামে উল্লেখ আছে। জাপানেও এ সময়ের লেখায় কুষ্ঠরোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত মিশরের নীল ভ্যালিতে এ রোগের প্রথম উৎপত্তি হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০-৫০০ বছর আগের মিশরের মমি থেকে পাওয়া হাড়ের মধ্যে কুষ্ঠরোগ সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মিশরীয় মমির দেহে অস্থি বিকৃতি যে কুষ্ঠরোগের ফল তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। তবে ভারতবর্ষই এ রোগের উৎপত্তিস্থল বলে ধারণা করা হয়। কেননা রোগের যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ভারতবর্ষ থেকেই পাওয়া যায় (ম্যাকডুগাল ও ইয়ালকার, ১৯৮৯)।

সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬-৩২৭ সালে সম্রাট আলেকজান্ডারের সৈন্যরা ভারত থেকে ফেরার সময় কুষ্ঠরোগ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নিয়ে আসে। দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে কুষ্ঠরোগ আইসল্যান্ড থেকে ইতালি পর্যন্ত সারা ইউরোপ মহাদেশে খুবই ব্যাপক ছিল। সে সময় 'লেপার হোম' নাম

দিয়ে কুষ্ঠরোগীদের থাকার জন্য আলাদা বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছিল। কুষ্ঠরোগীদের সেখান থেকে বাইরে যেতে হলে সারা শরীর ঢেকে ঘণ্টার শব্দ করতে পথ চলতে হতো, যাতে সমাজের সকলে তার থেকে দূরে সতর্কভাবে থাকতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এর প্রভাব কমতে শুরু করলো এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ রোগ প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সম্ভবত স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে। ইউরোপ থেকে আগত লোকের কাছ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে আমেরিকাতে প্রথম কুষ্ঠরোগের সূচনা হয়। আফ্রিকা থেকে আনা ক্রীতদাসদের মাধ্যমে এ রোগ আমেরিকা বিশেষত ব্রাজিলে ছড়িয়ে পড়ে। চীন থেকে আগতদের মাধ্যমে এ রোগ উপসাগরীয় দ্বীপগুলোতে বিস্তার প্রভাব করে। এ রোগের বিস্তৃতি নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যায় ঃ

দুই আমেরিকা ← ইউরোপ ← গ্রীস ← ভারত → চীন → কোরিয়া → জাপান →

↕ ↕ (মৈত্রীই–১৯৮৯)

আফ্রিকা

উনবিংশ শতাব্দীতে কুষ্ঠরোগ ইউরোপ থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেলেও অজ্ঞাত কারণে নরওয়েতে এর প্রাদুর্ভাব ১% থেকে যায়। বিজ্ঞানীদের এ ব্যাপারে একান্ত গবেষণার ফলস্বরূপ ১৮৩৭ সালে কুষ্ঠরোগের জীবাণু আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। তখন কুষ্ঠরোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না। 'চাউলমুগরা' নামক বনৌষধীর তেলই ছিল একমাত্র চিকিৎসা ব্যবস্থা। ১৯৪১ সালে ড্যাপসন নামক ওষুধ কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এ ওষুধের ব্যাপক ব্যবহার চলতে থাকে। পরবর্তীতে এ ওষুধের বিপরীতে প্রতিরোধ ও সুব্যবস্থা গড়ে উঠায় চিকিৎসা ব্যাহত হয়। এ সমস্যা সমাধানে ১৯৮২ সাল থেকে মাল্টিড্রাগ থেরাপি প্রয়োগ করা হয়। চিকিৎসা ব্যবস্থায় ড্যাপসনের সাথে ক্লোফাজেমিন ও রিফ্যামপিসিন নামক আরো দুটি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কুষ্ঠরোগ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের একটি প্রধান সমস্যা। উন্নত দেশে ব্যাধিটির ব্যাপকতা কমেছে, তবে একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে একথা বলা যায় না। সংক্রমিত রোগীদের প্রায় এক–তৃতীয়াংশ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অক্ষমতার শিকার। শুধু রোগীর সংখ্যা দিয়ে এ সমস্যা আন্দাজ করা যায় না। সামাজিক ভয় রোগ নির্ণয়ের অক্ষমতার কারণে সত্যিকারের রোগীর সংখ্যাও নির্ণয় করা যায় না। তবে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ধারণা অনুসারে সারা পৃথিবীতে প্রায় ১.৫ কোটি কুষ্ঠরোগী আছে যাদের এক–তৃতীয়াংশই এ উপমহাদেশে বাস করে (Akhter, 1993)।

৩.৩ কুষ্ঠরোগের লক্ষণ

কুষ্ঠরোগের লক্ষণগুলোকে মৌলিক এবং অমৌলিক দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। মৌলিক লক্ষণ বলতে বুঝায় এ লক্ষণগুলো শুধু কুষ্ঠরোগীর বেলায়ই দেখা যায়। উল্লেখ্য কুষ্ঠরোগের লক্ষণের সাথে অন্যান্য রোগের লক্ষণের অনেক মিল রয়েছে। যেমন— দাদ, ছিয়ালী, চামড়ার যক্ষ্মা, সিফিলিস, সোরিয়াসিস, কালাজ্বর, বার্জাস রোগ, আমবাত ইত্যাদি। এগুলোকে অমৌলিক লক্ষণ বলে। নিম্নে প্রথমে মৌলিক লক্ষণ পরে অমৌলিক লক্ষণসমূহ উল্লেখ করা হলো।

মৌলিক লক্ষণ : (১) অনুভূতিহীন দাগ : মাথা, বগল ও কুচকি ব্যতীত শরীরের যে কোনো জায়গায় দেখা যেতে পারে।

(২) স্নায়ু মোটা : অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের স্নায়ু মোটা হতে পারে।

(৩) মাইকোব্যাকটিরিয়ায় লেপ্রি জীবাণু : সংক্রামক রোগীর চামড়ার রসে এ জীবাণু পাওয়া যায়।

কুষ্ঠরোগের বিভিন্ন রকম লক্ষণ

উৎস : কুষ্ঠরোগসম্পর্কিত বই থেকে সংগৃহীত।

কুষ্ঠরোগের বিভিন্ন রকম লক্ষণ

উৎস : কুষ্ঠরোগসম্পর্কিত বই থেকে সংগৃহীত।

সকল কুষ্ঠরোগীরই এ তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যে কোনো একটি বৈশিষ্ট্য থাকলেই সে কুষ্ঠরোগী বলে পরিগণিত হবে (Watson, 1946)।

একজন কুষ্ঠরোগী যদি তার রোগ প্রকাশের সাথে সাথে নিয়মিতভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করে তাহলে আধুনিক চিকিৎসায় খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যায়। কিন্তু যদি চিকিৎসা না করে তাহলে নিম্নলিখিত অমৌলিক লক্ষণসমূহ দেখা যাবে :

(১) শরীরে চুলকানিবিহীন গুটি উঠতে পারে,
(২) মুখ লালচে ফুলা ফুলা মনে হতে পারে,
(৩) কানের লতিতে গুটি উঠতে পারে বা মোটা হয়ে যেতে পারে,
(৪) নাক চ্যাপ্টা হতে পারে বা বসে যেতে পারে,
(৫) চোখ বন্ধ করবার ক্ষমতা হারাতে পারে,
(৬) চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে,
(৭) মুখ বাঁকা হয়ে যেতে পারে,
(৮) হাত-পা অনুভূতিহীন বা দুর্বল হয়ে যেতে পারে,
(৯) হাত ও পায়ের আঙ্গুল বাঁকা হয়ে যেতে পারে,
(১০) হাত ও পায়ে ঘা হতে পারে,
(১১) হাত ও পায়ের আঙ্গুল পচে পড়ে যেতে পারে।

উল্লিখিত লক্ষণগুলো সকল রোগীর ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় না। প্রথম চারটি লক্ষণ সংক্রামক রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। বাকি লক্ষণগুলো সংক্রামক, অসংক্রামক উভয় রোগীর বেলায়ই হতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে রোগী নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণ করলে রোগ মুক্ত হবে অর্থাৎ কুষ্ঠরোগের জীবাণু মুক্ত হবে। কিন্তু বিকলাঙ্গতা দূর করা যাবে না। স্নায়ুতন্ত্রের কোনো চিকিৎসা অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র বিকল হয়ে গেলে তার উন্নত কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি আজও আবিষ্কৃত হয় নি। কুষ্ঠরোগ অত্যন্ত দুঃখজনক এবং ভয়ানক হওয়ার কারণ হলো এ রোগের জীবাণু ধীরে ধীরে স্নায়ুতন্ত্র নষ্ট করে ফেলে। স্নায়ুতন্ত্র বিকল হয়ে গেলে ঐ স্থানগুলো অনুভূতিহীন হয়ে যায়। রোগ সেরে যাবার পরও অসাবধানতাবশত অনুভূতিহীন স্থানে ঘা হতে পারে। তখন তাকে কুষ্ঠরোগী বলা যাবে না।

৩.৪ কুষ্ঠরোগের শ্রেণিবিভাগ

কুষ্ঠরোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার সুবিধার্থে এ রোগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। নিম্নে একজন কুষ্ঠের শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো :

কুষ্ঠরোগের শ্রেণিবিভাগ

অবনিদানিক কুষ্ঠ

অনির্ধারিত কুষ্ঠ

মীমাংসিত কুষ্ঠ
* অসংক্রামক কুষ্ঠ
* সংক্রামক কুষ্ঠ
* মধ্যবর্তী বা বর্ডারলাইন কুষ্ঠ

অন্যান্য শ্রেণির কুষ্ঠ
* স্নায়ু কুষ্ঠ
* হিস্টয়েড কুষ্ঠ

মূলত কুষ্ঠ হয়েছে বলতে মীমাংসিত কুষ্ঠকে বুঝায়। অবনিদানিক ও অনির্ধারিত কুষ্ঠ হলে তা আবার নিজেই ভাল হয়ে যায়। সংক্রামক, অসংক্রামক এবং মধ্যবর্তী কুষ্ঠের শ্রেণিবিভাগ মূলত জীবাণুর পরিমাণের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। স্নায়ু কুষ্ঠে স্নায়ুরজ্জুগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মোটা হয়ে যায়। ত্বকে কোনো দাগ থাকে না। সংক্রামক কুষ্ঠের একটি নতুন শ্রেণি যা ত্বকে গোলাকার চকচকে গুটি সৃষ্টি করে তাকে হিস্টয়েড কুষ্ঠ বলে (Pearson, 1986)।

৩.৫ কুষ্ঠরোগের বিস্তার

একজন মাল্টিব্যাসিলারী কুষ্ঠরোগী অর্থাৎ যাদের শরীরে জীবাণুর সংখ্যা খুব বেশি তারা প্রতিদিন তার নিঃশ্বাসের সাথে ১০০ মিলিয়ন কুষ্ঠজীবাণু বের করে। কুষ্ঠজীবাণু মানুষের শরীর থেকে বেরিয়ে ধুলা বা কফ থুতুর মধ্যে বেশ কয়েকদিন বেঁচে থাকে। এসব জীবাণু প্রশ্বাসের মাধ্যমে সুস্থলোকের দেহে প্রবেশই রোগের সম্ভাব্য কারণ বলে অনুমান করা যায়। তবে শরীরের ভিতর কোথায় কিভাবে এ জীবাণু বৃদ্ধি পেতে শুরু করে তা আজও জানা যায় নি। সুস্থ অক্ষত ত্বকের মাধ্যমে কুষ্ঠজীবাণু প্রবেশ করে না। কেননা কুষ্ঠজীবাণু ত্বকের উপরিভাগে না থেকে বেশ গভীরে থাকে। অক্ষত ত্বক থেকে জীবাণু শরীরের বাইরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম বলে মনে করা হয়। রোগ বিস্তারের কারণ হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

(১) রোগীর সংক্রমণ ক্ষমতা।
(২) সুস্থ লোকের রোগ হবার প্রবণতা।
(৩) স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাসের অক্ষমতা।
(৪) রোগের উৎসের নৈকট্য।
(৫) রোগ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব।

৩.৬ কুষ্ঠরোগের কারণ

নরওয়েতে ১৮৭৩ সালে হ্যানসেন কর্তৃক আবিষ্কৃত কুষ্ঠজীবাণুই কুষ্ঠরোগের কারণ। সে সময় কুষ্ঠরোগকে ভগবান প্রদত্ত শাস্তিজনিত বা বংশগত অসুখ বলে মনে করা হতো। নরওয়ের ডাক্তার আরমান হ্যানসেন এসব কথা বিশ্বাস করেন নি। অবসর সময় তিনি কুষ্ঠরোগীর দেহ থেকে নেয়া কোষ ও তন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতেন। তিনি অসমিক এসিড দিয়ে ফিক্স করা ঐ তন্তুতে দণ্ডাকৃতির জীবাণু লক্ষ্য করেন। ছ-বছর পর ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানীর বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট নাইসার কুষ্ঠজীবাণুকে ফুকসিন ও জেনসিয়ান ভায়োলেট দিয়ে রং করার পরে হ্যানসেনের আবিষ্কার নতুনভাবে স্বীকৃতি পায়।

কুষ্ঠজীবাণু আবিষ্কারের পর হ্যানসেন গবেষণাগারে এ জীবাণুকে লালন করার চেষ্টা করা হয়। পসিব্যাসিলারী শ্রেণির কুষ্ঠরোগীর দেহের দাগে কুষ্ঠজীবাণুর সংখ্যা কম। মাল্টিব্যাসিলারী রোগীর দেহে একগ্রাম টিস্যু থেকে ৭০০০ মিলিয়ন জীবাণু পাওয়া যায়। যদিও কুষ্ঠজীবাণু ১৮৭৩ সালে আবিষ্কৃত হয় তবুও এখন পর্যন্ত এ জীবাণুকে গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন সম্ভব হয় নি। কুষ্ঠরোগের জীবাণুর নাম মাইকোব্যাক্টেরিয়াম লেপ্রি (Micobacterium leprae)।

৩.৭ সংক্রমণ ক্ষমতা

কুষ্ঠ সংক্রামক রোগ। মাইকোব্যাক্টেরিয়াম লেপ্রি (Mycobacterium lapriae) নামক জীবাণুর আক্রমণে এ রোগ হয়। এ জীবাণু খুব দুর্বল এবং বংশবিস্তার ক্ষমতা খুব ধীর গতিসম্পন্ন। একটি

জীবাণু থেকে আরেকটি জীবাণু তৈরি হতে সময় লাগে দুই থেকে ছয় সপ্তাহ। অথচ আমাশয় জীবাণু বংশবিস্তার করতে সময় লাগে মাত্র বিশ মিনিট। যক্ষ্মারোগের সাথে তুলনা করলে বলা যায় যক্ষ্মারোগ কুষ্ঠরোগের চেয়ে ১৫ গুণ বেশি সংক্রামক। বিশেষজ্ঞদের মতে বেশিরভাগ মানুষের কুষ্ঠজীবাণুকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে (উল্লাহ, ১৯৮৯)।

কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে মাত্র শতকরা বিশ হতে পঁচিশ জন রোগী রোগ ছড়াবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। অর্থাৎ তারা হবে সংক্রামক। বাকি শতকরা পঁচাত্তর হতে আশি জন রোগীর রোগ ছড়াবার কোনো ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ এ ধরনের রোগীরা হলো অসংক্রামক রোগী। সংক্রামক রোগীরা নিয়মিত চিকিৎসা নিলে অল্প সময়ের মধ্যেই অসংক্রামক হয়। অর্থাৎ নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যায় :

সংক্রামক রোগী ⟶ নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ ⟶ অসংক্রামক রোগী ⟶ নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ ⟶ সুস্থ মানুষ।

অনিয়মিতভাবে ওষুধ গ্রহণ করলে বিকলাঙ্গতার সম্ভাবনা থাকে। কোনো ব্যক্তির কুষ্ঠরোগ হওয়া, সংক্রামিত এবং অসংক্রামিত হওয়া নির্ভর করে ঐ ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতার উপর। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে রোগীকে চারভাগে ভাগ করা যায়।

(১) প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট ঃ এ ধরনের ব্যক্তির কুষ্ঠরোগ হবে না।

(২) প্রতিরোধ ক্ষমতা মধ্যম ঃ আক্রান্ত হলেও ওষুধ ছাড়াই ভাল হবে।

(৩) প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব অল্প ঃ অসংক্রামক রোগী হবে এবং অনিয়মিত ওষুধ গ্রহণের ফলে বিকলাঙ্গ হবে।

(৪) প্রতিরোধ ক্ষমতা মোটেই নেই ঃ সংক্রামক রোগী ওষুধ গ্রহণ করলে বিকলাঙ্গ হবে।

৩.৮ কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা

ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সহানুভূতি সহকারে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা করা প্রয়োজন। ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা ছাড়াও আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য রোগীর মানসিক সহায়তা প্রয়োজন। এ রোগের একটা বড় সমস্যা হলো দীর্ঘমেয়াদী ওষুধ খেতে হয়। তারপর আবার নিয়মিত স্বাস্থ্য শিক্ষা মেনে চলতে হয়। রোগীর অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হয়। রোগী বিশেষে চিকিৎসার পরিমাণ ও পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে। সাধারণত কুষ্ঠরোগীদের জন্য নিম্নলিখিত চিকিৎসাগুলোর প্রয়োজন হয়।

কুষ্ঠনাশক চিকিৎসা ঃ ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) অনুমোদন করে যে, রোগী বিশেষে দুই বা তিন প্রকার ওষুধ একই সাথে ব্যবহার করলে খুব তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করে। এ আধুনিক চিকিৎসায় যাদের চামড়ার রসে জীবাণু পাওয়া যায় না এ ধরনের বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে ড্যাপসন ১০০ মিলিগ্রাম প্রতিদিন এবং রিফামপিসিন ৬০০ মিলিগ্রাম মাসে একবার হিসাবে ছয়মাস ব্যবহার করা হয়। মাল্টিব্যাসিলারী বয়স্ক রোগীদের জন্য ড্যাপসন ১০০ মিলিগ্রাম প্রতিদিন, রিফামপিসিন ৬০০ মিলিগ্রাম মাসে একবার, ল্যামপ্রিন ৩০০ মিলিগ্রাম মাসে একবার রিফামপিসিনের সাথে এবং ল্যামপ্রিন ৫০ মিলিগ্রাম প্রতিদিন হিসাবে দুই বছর সেবন করতে হবে। এ ওষুধ প্রয়োগে মাইকোব্যাক্টেরিয়াম জীবাণু নাশ করা সম্ভব। ৩.১ সারণি থেকে কুষ্ঠরোগের আধুনিক ও কার্যকর চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

কুষ্ঠ প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ চিকিৎসা ঃ সকল রোগীর এ চিকিৎসা প্রয়োজন হয় না। মাল্টিব্যাসিলারী শ্রেণির রোগীদের দেহে কুষ্ঠজীবাণুর প্রতিক্রিয়া হিসেবে শরীরে অনেক এন্টিবডি

তৈরি হয়। অন্যান্য রোগে এন্টিবডিগুলো রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে, কুষ্ঠরোগে তা করে না। বরং শরীরে আরো জটিলতা সৃষ্টি করে। তখন শরীরে প্রতিক্রিয়া নাশক ওষুধ প্রেডনিসোলন অথবা ক্লোরোকুইন, প্যারাসিটামল ইত্যাদি দেয়া হয়।

ব্যায়াম চিকিৎসা ঃ কুষ্ঠরোগে স্নায়ুকে অকেজো করে ফেলে। এটি হাত, পা, মুখ ও চোখের স্নায়ুকে আক্রান্ত করে। ফলে এ সকল স্থানের মাংসপেশী দুর্বল হয়ে যায় এবং বিকলাঙ্গতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শরীরের যে সকল স্থানের স্নায়ু আক্রান্ত হয়ে পড়েছে সে সকল স্থানের মাংসপেশীকে সবল রাখার জন্য এবং বিকলাঙ্গতা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকর ব্যায়াম দরকার। রোগের শুরুতে চিকিৎসা করা হলে ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না।

শৈল্য চিকিৎসা ঃ হাত, পা ও চোখের বিকলাঙ্গতা দূর করার জন্য সম্প্রতি অস্ত্রোপচার করা হয়। সব ক্ষেত্রে এ চিকিৎসা কার্যকর হয় না। আবার চিকিৎসকের সংখ্যাও খুব কম।

পেশাগত চিকিৎসা ঃ যে সব রোগীর প্রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরা না পড়ার দরুন হাত, পা, চোখ, মুখের বিকলাঙ্গতা সৃষ্টির ফলে সাধারণ মানুষের মত কাজ করা সম্ভব হয় না তখন পেশা অনুযায়ী কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন যেমন, গৃহিণীর জন্য হাড়ি ধরার বেড়ির ব্যবস্থা করা।

সারণি ৩.১ : বয়স ও রোগের প্রকারভেদে কুষ্ঠরোগের কার্যকর চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র।

রোগের ধরন	রোগীর বয়স	চিকিৎসা :কর্মীর তত্ত্বাবধানে প্রতিমাসে ১ বার সেব্য	নিজ গৃহে নিজে মাসের বাকি ২৯ দিন সেব্য	সেবনের মেয়াদ
মাল্টিব্যাসিলারী কুষ্ঠ :	৬–৯ বছর	৩০০ মি: গ্রা: রিফ্যামপিসিন অথবা ১০০ মি: গ্রা: ক্লোফাজিমিন	২৫ মি: গ্রা: ডাপসন (প্রতিদিন) ৫০ মি: গ্রা: ক্লোফাজিমিন (সপ্তাহে ১ দিন)	২ বছর চলবে
	১০–১৪ বছর	৪৫০ মি: গ্রা: রিফ্যামপিসিন ১৫০ মি: গ্রা: ক্লোফাজিমিন	৫০ মি: গ্রা: ড্যাপসন ৫০ মি: গ্রা: ক্লোফাজিমিন (২টিই প্রতিদিন চলবে)	" ,,
	১৫+ বছর	৬০০ মি: গ্রা: রিফ্যামপিসিন ৩০০ মি: গ্রা: ক্লোফাজিমিন	১০০ মি: গ্রা: ড্যাপসন ৫০ মি: গ্রা: ক্লোফাজিমিন (২টিই প্রতিদিন চলবে)	,,
পসিব্যাসিলারী কুষ্ঠ :	৬–৯ বছর	৩০০ মি: গ্রা: রিফ্যামপিসিন	১০০ মি: গ্রা: ড্যাপসন	,,
	১০–১৪ বছর	৪৫০ মি: গ্রা: রিফ্যামপিসিন	৫০ মি: গ্রা: ডাপসন	৬ মাস
	৬–৯ বছর	৩০০ মি: গ্রা: রিফ্যামপিসিন	২৫ মি: গ্রা: ড্যাপসন	,,

উৎস : নিপসম, ঢাকা, ১৯৯৬।

BANSDOC Library * Dhaka *

বিকলাঙ্গতা প্রতিরোধবিষয়ক জ্ঞান ঃ একজন রোগী বিকলাঙ্গতা প্রতিরোধ করতে পারে শুধু প্রাথমিক অবস্থায় নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে। কুষ্ঠ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানই এ রোগের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার সহজ উপায়।

৩.৯ কুষ্ঠরোগের ফলাফল

খ্রিষ্টের জন্মের আগে থেকেই পৃথিবীতে কুষ্ঠরোগ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বে এর কোনো চিকিৎসা ছিল না এবং এ রোগের ফলে সৃষ্ট অঙ্গ বিকৃতির ফলে ভয় পেত। এ ভীতি যুগে যুগে স্থায়ী রূপ লাভ করে। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের ভুল ভাঙ্গছে না। যার ফলে সামাজিকভাবে জটিল পরিস্থিতি আজও বর্তমান। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে কুষ্ঠরোগের ফলাফল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

(১) শারীরিক বিকলাঙ্গতা : কুষ্ঠরোগের ফলে নিম্নলিখিত অঙ্গগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় :

- (ক) হাত পায়ের বিকৃতি।
- (খ) হাত পায়ের ক্ষত।
- (গ) হাত ও পায়ের আঙ্গুল ক্ষয় হয়ে পড়ে যাওয়া।
- (ঘ) বিকৃত স্থানে অসাড়তা।
- (ঙ) অন্ধত্ব।
- (চ) ভুরুর লোম পড়ে যাওয়া।

এত সূক্ষ্মভাবে আর কোনো রোগই মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। কুষ্ঠরোগ মানুষকে মেরে ফেলে না, জীবন্মৃত করে রাখে। আর এসব কারণেই কুষ্ঠরোগ ভগবানের দেয়া অভিশাপ হিসেবে মানুষের মনে স্থায়ী ধারণার সৃষ্টি করেছে।

সামাজিক ফলাফল : প্রাচীনকাল থেকেই সামাজিকভাবে কুষ্ঠরোগীরা অবহেলিত, নিগৃহীত ও বঞ্চিত। সমাজে স্থান না থাকায় কুষ্ঠরোগীর জীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ। রোগীরা নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করে। অথচ কুষ্ঠরোগের চেয়ে আরো অনেক বেশি ছোঁয়াচে ও অপ্রতিরোধ্য এইডস রোগীরাও সমাজে এতটা বঞ্চিত নয়।

অর্থনৈতিক : কুষ্ঠরোগ প্রান্তিক স্নায়ুসমূহকে নষ্ট করে ফেলে। যার ফলে বেশিরভাগ মানুষের হাত এবং আঙ্গুল প্রথমে আক্রান্ত হয়। পায়ে কাজের চাপ বেশি পড়ে বলে প্রথমেই নষ্ট হয়ে যায় পা। আর এদেশে বেশিরভাগ রোগীই মাঠে–ঘাটে কাজ করে। অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কখন যে ধীরে ধীরে কতটুকু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় রোগী তা লক্ষ্যই করে না। যখন কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা নির্বাহের পথ হিসেবে বেছে নেয়। সুতরাং তারা যখন বেকার হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের দেশে বেশিরভাগই দেখা যায় ৬/৭ জনের পরিবারে একজন মাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি, অর্থাৎ উপার্জন করে। সে অসুস্থ হলে সম্পূর্ণ পরিবারকে ভিক্ষার ঝুলি হাতে রাস্তায় নামতে হয়।

মানসিক ফলাফল : সমাজ থেকে অবহেলিত হওয়ার ভয়ে রোগী সবসময় রোগ লুকিয়ে রাখে এবং নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে যায়, এতে অনেক সময় রোগী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে (Koticha, 1990)।

৩.১০ কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে টিকা

কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে একটি উচ্চমানের, সুলভ ও সুগ্রাহ্য টিকা আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে। প্রথমে কুষ্ঠ প্রতিরোধে বি. সি. জি. টিকা দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু বি. সি. জি–র কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা খুবই সীমিত। বর্তমানে আর্মাডিল্লোর শরীরজাত কুষ্ঠজীবাণু এবং বি. সি. জি এক সাথে মিলিয়ে যে টিকা তৈরি করা হয়েছে সেটাই সবচেয়ে অনুকূল। উপরিউক্ত টিকা ভেনিজুয়েলার কারাকাসে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। কুষ্ঠজীবাণু সংক্রমণে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে যেহেতু অনেক সময় লেগে যায় সেহেতু তাদের এ টিকা পরীক্ষামূলকভাবে দেয়া হয়েছে। তাদের প্রতিরোধ শক্তির মূল্যায়ন করতে অন্তত দশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। ততদিন পর্যন্ত কুষ্ঠ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই নির্ভর করবে প্রাথমিক অবস্থায় কুষ্ঠরোগ নির্ণয়, নির্ণয়ের পর এমডিটি (MDT)–এর মাধ্যমে চিকিৎসা এবং জনসাধারণের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা দানের উপর। মনে রাখতে হবে টিকা আবিষ্কারের পর ও রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে গেলে টিকা দেওয়ার সাথে সাথে এমডিটি দিয়ে চিকিৎসা চালাতে হবে।

৩.১১ কুষ্ঠরোগের গবেষণার উল্লেখযোগ্য অবদান

কুষ্ঠ একটি প্রাচীন রোগ হলেও এ রোগের গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন প্রথম নরওয়ের বিজ্ঞানী ডঃ জি. এইচ. এ. হ্যানসেন ১৮৭৩ সালে। সারা পৃথিবীতে কমবেশি এ রোগের প্রকোপ থাকা সত্ত্বেও ১৮৭৩ সালের আগে কুষ্ঠ একটি অভিশাপ রোগ হিসেবেই পরিচিত ছিল। ডঃ হ্যানসেন আবিষ্কার করেন "কুষ্ঠ জীবাণুঘটিত রোগ, মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি" নামক এই জীবাণু কুষ্ঠরোগের কারণ বলে সারা পৃথিবীকে অবাক করে দেন। হ্যানসেনের জীবাণু অবিষ্কারের পর অর্থাৎ ১৮৭৩ সালের পরবর্তী সময়ে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। নিম্নে তা ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হলো :

১৮৭৪ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক কুষ্ঠ সম্মেলন বার্লিন–এ অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৮ সালে জার্মান চর্মতত্ত্ববিদ জেভাসন প্রথম "টিউবারকুলয়েড" শব্দটি কুষ্ঠরোগের বর্ণনায় ব্যবহার করেন। ১৯০৮ সালে ফ্রম এবং ইউটম্যান জার্মানীর ফ্রিবার্গে ড্যাপসন উৎপাদন করেন। ১৯৩১ সালে ম্যানিলার ফিলিপাইনে আন্তর্জাতিক কুষ্ঠ সংস্থা গঠিত হয়। ১৯৪১ সালে কুষ্ঠরোগের ওষুধ হিসাবে ড্যাপসনের ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৪৬ সালে ড্যাপসনের ব্যবহার ইন্ডিয়ায় শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে নাইজেরিয়ায় প্রথম ড্যাপসন নামক ওষুধটি খাওয়ার ওষুধ হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। উল্লেখ্য, পূর্বে এটি মালিশ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৯৫০ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে কুষ্ঠ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ১৯৫০ সালে ইন্ডিয়ার ভেলরের খ্রিষ্টান মেডিক্যাল কলেজে কুষ্ঠরোগের দ্বারা অকেজো হয়ে যাওয়া হাতে পায়ে অস্ত্রোপচারের কাজ শুরু করে।

১৯৫৪ সালে ল্যামপ্রিনের কার্যকর উপাদান ক্লোফাজেমিন উৎপাদন শুরু হয়। ১৯৫৪ সালে প্যারিসের রাউল ফেলেরো কর্তৃক বার্ষিক বিশ্ব কুষ্ঠ দিবসের সূচনা করা হয়। ১৯৫৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কুষ্ঠ সচিবালয় জেনেভাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালে সেপার্ড প্রথম জানান যে, ইঁদুরের পায়ের পাতায় কুষ্ঠজীবাণু কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। এ থেকেই কুষ্ঠজীবাণু গবেষণামূলক অনুসন্ধান কাজ শুরু হয়। ১৯৬২ সালে Browne এবং Hogerzeil প্রথম ল্যামপ্রিনের কার্যকারিতা সম্পর্কে রিপোর্ট দেন। ১৯৬৫ সালে Ridley এবং Jopling অনাক্রমণ্যতার উপর ভিত্তি করে কুষ্ঠরোগের পাঁচটি শ্রেণিবিভাগের প্রস্তাব দেন। ১৯৬৬ সালে কুষ্ঠবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা (International Federation of Anti-leprosy Association - ILEP) সুইজারল্যোন্ডের জেনেভায় গঠিত হয়। ১৯৬৮–৬৯ সালে যথাক্রমে রিফ্যামপেসিন এবং ল্যামপ্রিন নামক ওষুধ ব্যবহারের সূচনা করা হয়।

১৯৭৪ সালে ইউ.এন.ডি.পি, বিশ্ব ব্যাংক এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিষুবীয় রোগের গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ কার্যক্রমের সমন্বয়ে কুষ্ঠ অনাক্রম্যতা টাক্সফোর্স (The Immunology of Leprosy Task Force) গঠিত হয় ।

১৯৮২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বহু ওষুধ (Multidrug Therapy-MDT) প্রয়োগের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুমোদন লাভ করে। ১৯৮৪ সালে ভারতের নতুন দিল্লীতে দ্বাদশ আন্তর্জাতিক কুষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালে সিবাগাইগি কোম্পানি সুইজারল্যান্ডে কুষ্ঠ তহবিল প্রতিষ্ঠিত করে। (Thangarj and Yawalkar, 1986)।

দশ বছর এমডিটির কার্যকারিতা লক্ষ্য করে ১৯৯১ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে ২০০০ সালের মধ্যে বিশ্বে কুষ্ঠ ব্যাপকতার হার কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৩.১২ সারাংশ

রোগতাত্ত্বিক আলোচনায় দেখা যায় কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হলেও কিছু বিষয় এখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন রয়ে গেছে। এ রোগ কিভাবে কোন পথে মানুষের শরীরে সংক্রামিত হয় তা এখনো সঠিকভাবে খুঁজে বের করা সম্ভব হয় নি। জীবাণু প্রবেশের কতদিন পর রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে তাও সঠিকভাবে বলা যায় না। কোন পরিবেশ রোগের জীবাণুকে বেঁচে থাকতে এবং মানুষকে রোগাক্রান্ত হতে সহায়তা করে তা নিরূপণ করা যায় নি। চিকিৎসা ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদী হওয়ায় এবং ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকায় এ বিষয়েও একটি অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ করছে। এ রোগের ভয়ানক পরিণতির ভয়ে এ বিষয়ে গবেষণায় কেউ এগিয়ে আসতে চায় না। তারপরও যতটুকু আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে তাতে সার্বিক পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। রোগতাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান এখনো বিকাশোন্মুখ পর্যায়ে রয়েছে, সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নি। রোগতত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে সহজলভ্য চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার সম্ভব হবে। আর চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজ হলে শারীরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক সকল সমস্যার সমাধান হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কুষ্ঠরোগের অবস্থা : বিশ্ব ও বাংলাদেশ

৪.১ ভূমিকা

কুষ্ঠ একটি প্রচণ্ড ভীতি হিসেবে সহস্র বছরের বেশি সময় ধরে পৃথিবীতে টিকে আছে। পুরানো সভ্যতাগুলো যেমন ভারত, চীন, ও মিশরীয় সভ্যতায় এটি প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। যুগ যুগ ধরে ক্রমবর্ধিষ্ণু কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা এবং শারীরিক অক্ষমতার হিসেব কখনো নির্ণয় করা হয় নি। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিশ্বের রেজিস্ট্রীকৃত ২.৪ মিলিয়ন রোগীর মধ্যে ১.৭ মিলিয়ন রোগীর সাফল্যজনকভাবে এমডিটি (MDT) প্রয়োগের মাধ্যমে সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে (WHO, 1994)।

তীব্র সামাজিক কলঙ্ক এবং বৈষম্যতা সম্পূর্ণভাবে কুষ্ঠরোগ উচ্ছেদের সম্ভাবনাকে দুর্বল করে ফেলে। তা সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বে কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা একটি দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ। বিশ্বের ৭৯টি দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কুষ্ঠরোগী রয়েছে। বছরে ৬০,০০০০ নতুন রোগী চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এসব দেশে প্রায় ২৪০০ মিলিয়ন লোক বাস করে যেখানে কুষ্ঠ ব্যাপকতার হার দশ হাজার লোকসংখ্যায় এক এর বেশি। ইতোমধ্যে দুই থেকে তিন মিলিয়ন লোক চিরতরে অক্ষম হয়ে গেছে। এরা শরীরের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দুদিক থেকেই এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যে, কোনোভাবেই সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়। বিকলাঙ্গ কুষ্ঠরোগীদের বেশিরভাগই দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছে। ব্যাকটিরিয়া তাদের শরীরে প্রবেশ করে আক্রান্ত স্থান সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে ফেলেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিশ্বে কুষ্ঠ সমস্যার বাস্তবতা অনুমান করা সম্ভব হচ্ছে। প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝতে দুই হাজার সন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যে ধরনের নীতিমালার ভিত্তিতে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সারা বিশ্বে পরিচালিত হচ্ছে, বিশেষ করে আক্রান্ত দেশসমূহে, এতে সুস্পষ্ট একটা সঠিক পরিসংখ্যানিক তথ্য বেরিয়ে আসবে। বাংলাদেশেও এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। রোগের ব্যাপকতার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থানে দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। ১৯৯৫ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ দেশকেই জাতীয় কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় আনা হবে। বিশ্বে সময়ের সাথে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার হারের কিছুটা পরিবর্তন লক্ষণীয়। ১৯৮৭ সালের রিপোর্টে দেখা যায় মায়ানমারে ব্যাপকতার হার সবচেয়ে বেশি। ভারত, ব্রাজিল, এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশ পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে কুষ্ঠরোগের পরিস্থিতি এসব দেশে অনেক বেড়ে গেছে।

৪.২ পৃথিবীতে কুষ্ঠরোগের বর্তমান পরিস্থিতি

বিশ্বের ৭৯টি দেশে ২.৪ মিলিয়িন কুষ্ঠরোগী রয়েছে। ১৯৯৪ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী কুষ্ঠরোগের ফলে ক্রমশ স্থায়ী অক্ষমতার সৃষ্টি এবং প্রচণ্ড সামাজিক ভয়ের কারণে এটি পৃথিবীতে একটি একক স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ১৯৮০ সালের পূর্বে ড্যাপসন নামক ওষুধের মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা করা হতো। কিন্তু দীর্ঘদিন এ ওষুধ ব্যবহার করার ফলে

বিশ্বে রেজিস্ট্রিভুক্ত কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতা-১৯৮৭

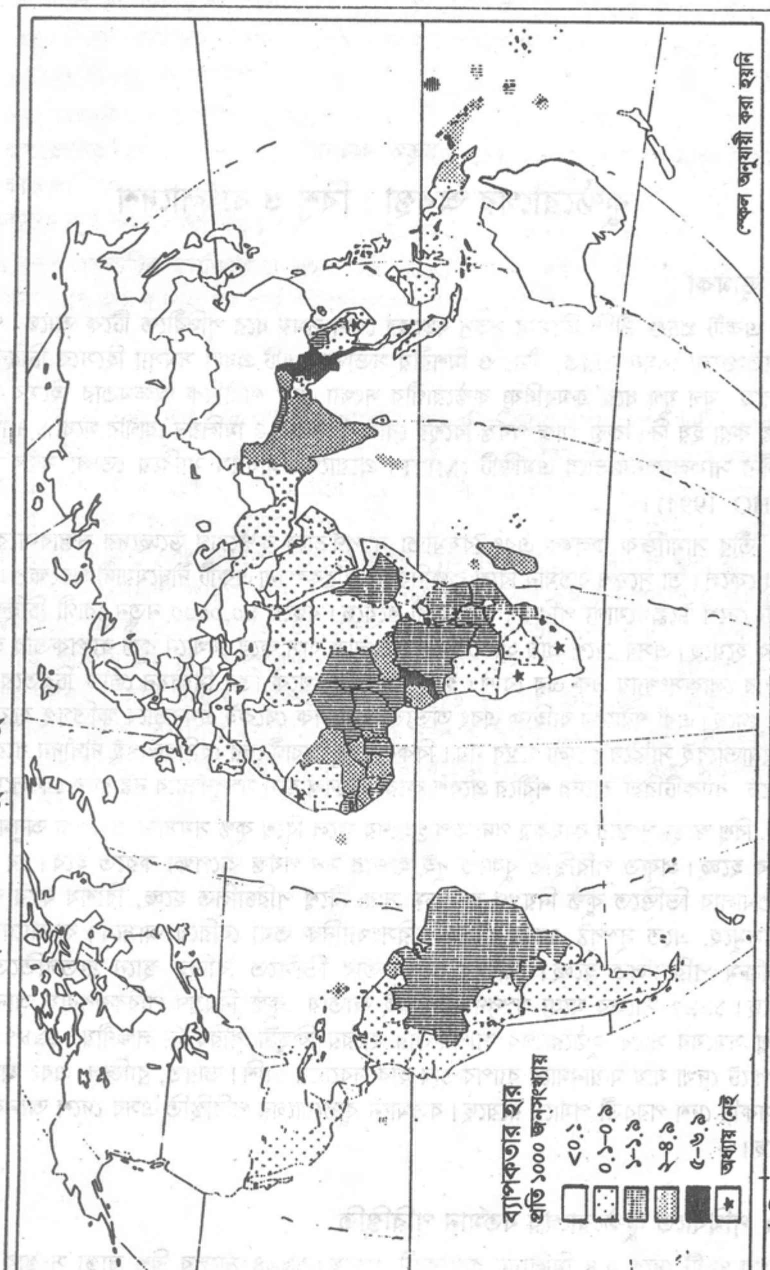

উৎস : কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, বাংলাদেশ।

বিশ্বে রেজিস্ট্রিভুক্ত কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতা-১৯৯৪

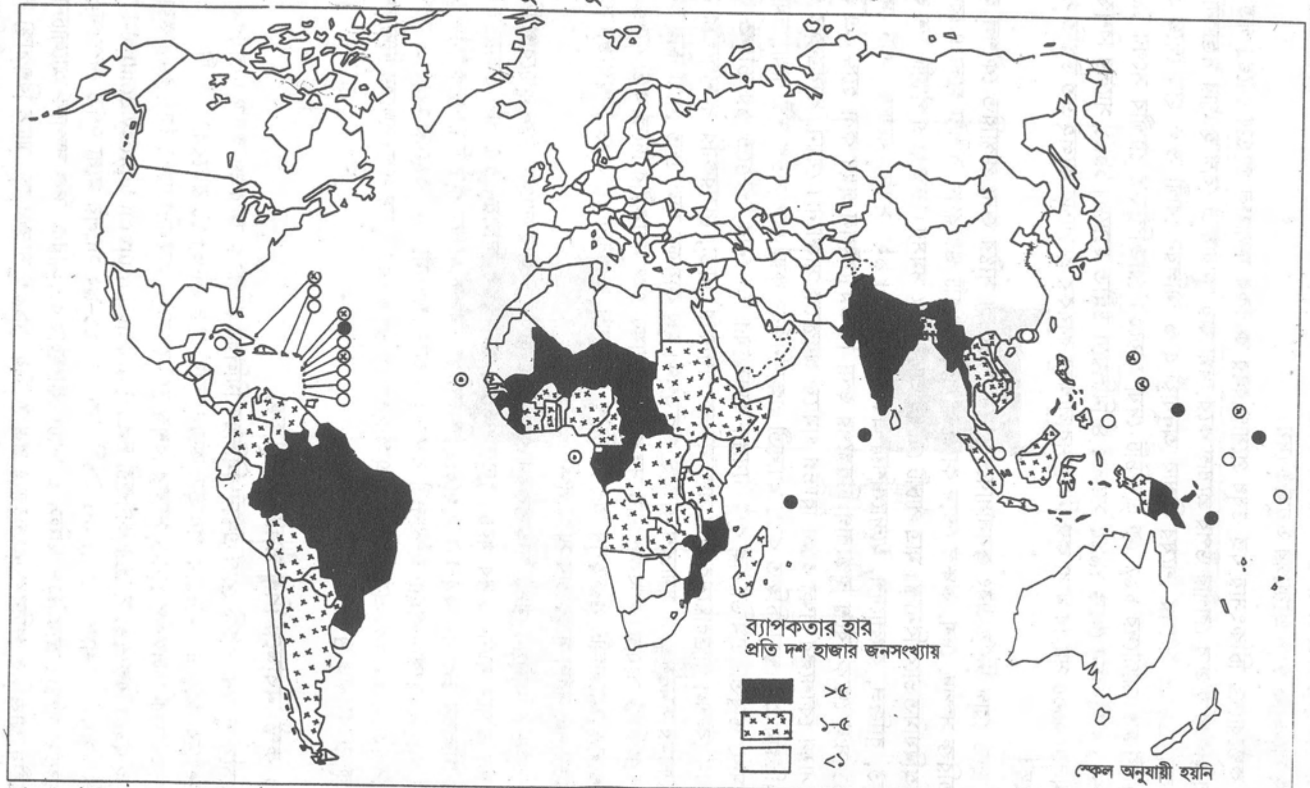

উৎস : কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, বাংলাদেশ।

ওষুধের বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৮২ সালে বহু ওষুধ প্রয়োগের অনুমতি দেয়।

কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় বহু ওষুধ প্রয়োগ করে কার্যকর ফলাফল পাওয়া গেছে। গত ১০ বছরে হাজার হাজার রোগীর উপর প্রয়োগ করে দেখা যায় পুনরায় এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা ১% এর কম। ১৯৯৩ সালের শেষের হিসাব অনুযায়ী ৫.৬ মিলিয়ন রোগী ভাল হয়ে গেছে এবং রেজিস্ট্রিকৃত রোগীদের ৮৯% কে এমডিটি দেয়া হয়েছে। রেজিস্ট্রিকৃত রোগীর সংখ্যা ১৯৯৪ সালের ১.৭ মিলিয়ন থেকে ১৯৯৫ সালে ৫.৪ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। ১৯৯১ সালের বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলনে ২০০০ সালের মধ্যে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যের কার্যকর প্রয়োগের ফলেই এত উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং জনসাধারণের মধ্যে সতর্কতা সৃষ্টির জন্য প্রস্তাবিত কৌশল হচ্ছে অতিরিক্ত সম্পদ, দেশ, অঞ্চল ভেদে কাজে লাগানো। একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এ রোগটি খুব অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত। মাত্র পাঁচটি দেশেই আছে ৬৫% সমস্যা। উল্লেখ্য এ পাঁচটি দেশ হচ্ছে ভারত, ব্রাজিল, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং মায়ানমার। ৯২% সমস্যা রয়েছে ২৫টি দেশে। ১৯৯১ সাল থেকে বিশ্বে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে। এ রোগ অপসারণ কৌশলের লক্ষ্য হলো বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থাকে সাজানো। যেমন, কার্যক্রমের জন্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত স্থান চিহ্নিত করা, মধ্যবর্তী লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং সর্তক দৃষ্টি রাখা, সমস্যার পরিমাণ, তীব্রতা, এমডিটিসহ কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সম্ভাবনার ভিত্তিতে স্তর চিহ্নিত করা। নিয়ন্ত্রণ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার, দাতা, বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাথে কার্যক্রমের সমন্বয় এবং সমাবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূল কার্যক্রম হলো দ্রুত রোগী চিহ্নিতকরণ এবং এমডিটি প্রয়োগ। পরিকল্পনায় সতর্কতা, মূল্যায়ন এবং মহামারীর দিকে কড়া নজর রাখা কৌশলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশ্বে কুষ্ঠরোগ অপসারণের প্রতি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যকর দল সর্বদা সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখছে।

প্রায় ৫ মিলিয়ন রোগী চিহ্নিতকরণ এবং এমডিটি চিকিৎসার মাধ্যমে উক্ত কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কৌশল এগিয়ে যাবে। এসব খরচ বাবদ ওষুধের জন্য ১৫০ মিলিয়ন ইউ. এস ডলারসহ মোট ৪২০ মিলিয়ন ডলারের হিসাব করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণকে চিহ্নিতকরণ এবং আগ্রহী সংস্থাসমূহের অংশীদারী কাজের মাধ্যমে আগামী ৫–৭ বছরের মধ্যে এ সম্পদের কার্যকর প্রয়োগ সম্ভব। প্রত্যেক ব্যক্তি এ প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহস্র বছরের নিদারুণ কষ্ট থেকে মানবসমাজ মুক্ত হতে পারে।

৪.৩ কুষ্ঠ নিরাময়ে বিশ্ব সমাজের ভূমিকা

সবচেয়ে পুরানো একটি রোগ এখনো মিলিয়ন মিলিয়ন লোককে আক্রমণ করছে। কার্যকর ওষুধ আবিষ্কার করে এ সমস্যাকে পরাভূত করার সময় এসে গেছে। ১০ বছরের এমডিটি ব্যবহারের উৎসাহব্যঞ্জক ফলস্বরূপ ১৯৯১ সালের বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলনে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়। একই বছরে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যকরী দল (Working group on leprosy control-LWG) কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কৌশলের খসড়া নক্সা তৈরি করে। ১৯৯১–৯২ সালের মধ্যে দুর্গত দেশসমূহ এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক অফিস আলোচ্য কৌশলের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করে জাতীয় আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তুতি নেয়। ১৯৯৩ সালের জুন মাসে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যকরী দল এবং প্রধান প্রধান বেসরকারি সংস্থা, বিশেষ করে ILEP এর সদস্যরা মিলিত হয়ে বিশ্ব কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কৌশল গ্রহণ, উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের উপর আলোচনা করে। বাস্তবে

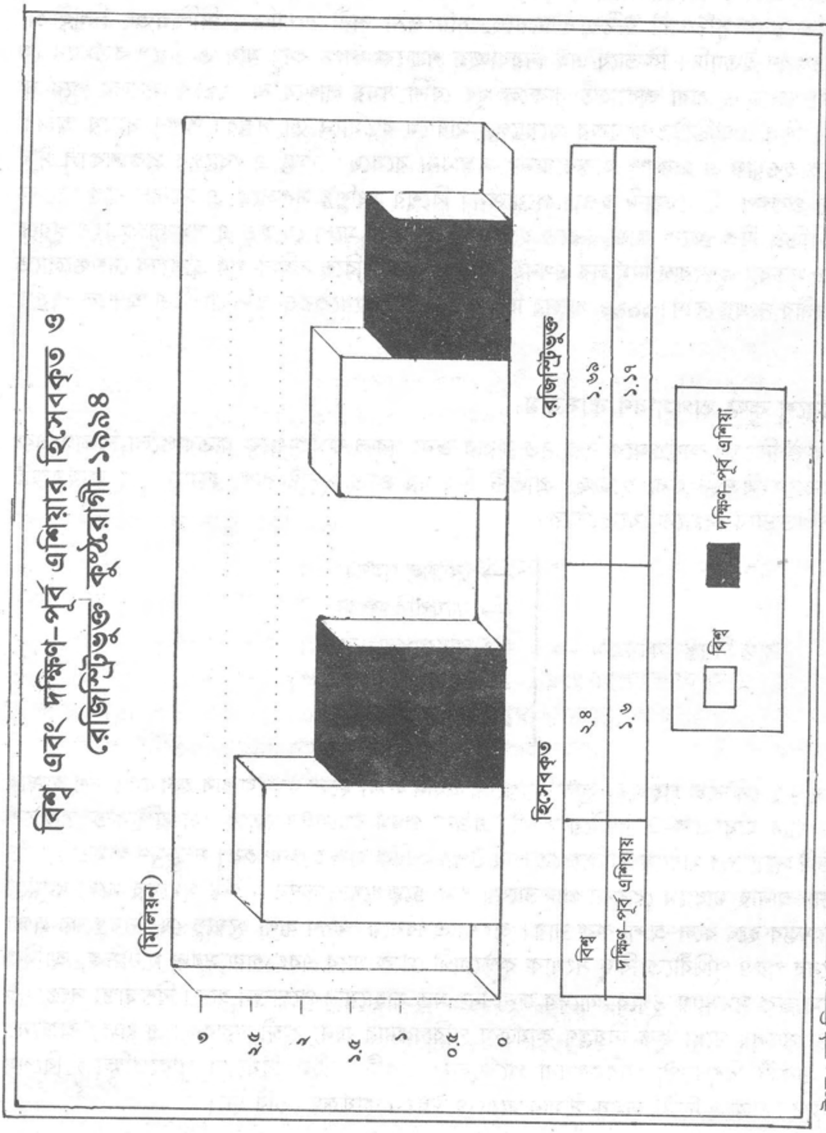

উৎস : কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, বাংলাদেশ।

এমন একটি সমস্যার সমাধান অত্যন্ত দুরূহ। কেননা এটি মানুষের স্মৃতিতে একটি দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণার ইতিহাস। কুষ্ঠ একটি বিশ্বাসঘাতক ধীর গতিসম্পন্ন রোগ যার সংক্রমণ পথ ভালভাবে জানা নেই এবং যা বিশ্বের দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশি দেখা যায়। প্রতিটি মহাদেশে এ রোগের একটি আতংক সৃষ্টিকারী ইতিহাস রয়েছে, যার জন্য দায়ী সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, নির্গৃহীতা, বহির্ভূতকরণ ইত্যাদি। কিভাবে এই নিরবচ্ছিন্ন শত্রুকে ধ্বংস করা যায় তা নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে এ ধারা অব্যাহত থাকলে খুব বেশি সময় লাগবে না। ১৯৮১ সালের পূর্বে যা অসম্ভব ছিল এমডিটির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে বর্তমানে তা সম্ভব। অল্প সময়ে অধিক কার্যকর হওয়ায় এ প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এ রোগের প্রকাশকাল দীর্ঘ হওয়ায় প্রকল্প দীর্ঘমেয়াদি হওয়া প্রয়োজন। বিশ্বের সংশ্লিষ্ট সকলকে এ সুযোগ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে কাজ করতে হবে। বহু সমস্যার মধ্যে যেহেতু এ সমস্যাকে বিশ্ব গুরুত্ব দিয়েছে সুতরাং কুষ্ঠরোগ নির্মূলের এখনই উপযুক্ত সময়। বিশ্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বেশি। ১৯৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী অর্ধেকেরও বেশি রোগী এ অঞ্চলে পাওয়া যায়।

৪.৪ বিশ্বে কুষ্ঠ অপসারণ কার্যক্রম

বিশ্বে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য সকল কর্মকাণ্ডকে কতকগুলো বিভাগ এবং উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সুদৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ কার্যক্রমটি নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যেতে পারে।

কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম →
- → কৌশল গ্রহণ।
- → কার্যপরিকল্পনা।
- → ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।
- → সাম্প্রতিক গবেষণা।
- → যৌথ কর্মকাণ্ড।

৪.৪.১ কৌশল গ্রহণ ঃ কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের প্রধান লক্ষ্য হলো ব্যাপকতার হার প্রতি দশ হাজার জনসংখ্যার মধ্যে এক-এ কমিয়ে আনা। এজন্য প্রথম বছরেই প্রত্যেক রেজিস্ট্রিকৃত রোগীকে এমডিটি প্রয়োগের মাধ্যমে সারিয়ে তোলার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। সংক্রমণ ক্ষমতার উৎস কমিয়ে আনার মাধ্যমে রোগের প্রাদুর্ভাবের হার উল্লেখযোগ্যভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। অবশ্য এ বিষয়ে স্মরণ রাখা হয়েছে যে, নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য অর্জনের পরও পৃথিবীতে কিছু সংখ্যক কুষ্ঠরোগী থেকে যাবে এবং তারা সর্বদা মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক সমস্যায় ভুগবে, যাদের জন্য নিয়মিত সাহায্যের প্রয়োজন হবে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা দুই হাজার সালের মধ্যে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা প্রয়োজন। একটি জটিল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ এলাকার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে এ উন্নয়ন কার্যক্রম তৈরি হয়।

কুষ্ঠরোগ বিভিন্ন দেশে এবং দেশের ভিতরের বিভিন্ন এলাকায় অসমভাবে বিন্যস্ত থাকে। দেশের উন্নত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা এবং তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অনুযায়ী আক্রান্ত দেশসমূহে কার্যক্রমের পার্থক্য হতে পারে। নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অবশ্যই গ্রহণযোগ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনের উপযোগী হতে হবে। যেমন, চীনের নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে লক্ষ্য অতিক্রম করে গেছে। ১৯৯২ সালের হিসাব অনুযায়ী ব্যাপকতার হার গড়ে প্রতি হাজারে ০.২। কিছু এলাকায় ছয় বছর

যাবৎ এমডিটি কার্যক্রম চালু থাকার পরও ব্যাপকতার হার প্রতি দশ হাজারে দুই রয়ে গেছে। যদিও নতুন রোগী চিহ্নিতকরণের হার শারীরিক অক্ষমতাসহ প্রতি লক্ষে ৩.২ – ১২.৭। এ ধরনের অনিয়মিত রোগের বন্টন বহুদিন যাবৎ স্থিতিশীল অবস্থায় আছে।

১৯৯৪ সালের তথ্য অনুযায়ী শুধু ভারতে রয়েছে মোট রেজিস্ট্রিকৃত কুষ্ঠরোগীর ৫৯%। বাংলাদেশ, ব্রাজিল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার এবং নাইজেরিয়া, এ ছয়টি দেশে মোট রোগীর ৮২%, বিশ্বের মোট ২৫টি দেশে ৯২% রোগী ; বাকি ৮% রোগী সম্পূর্ণ বিশ্বে ছড়িয়ে আছে।

কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ফলাফল বিভিন্ন সংস্থার গুণগত মানের উপর নির্ভর করে। দুর্গত দেশসমূহে সাধারণ স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রমের সাথে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে একীভূত করে এর উপর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রোগী চিহ্নিতকরণ এবং এমডিটি দ্বারা চিকিৎসা কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ। কুষ্ঠরোগীদের অক্ষমতার রোধ এবং পুনর্বাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমান কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে বিষয়গুলো সরাসরি জড়িত নয়। নিয়ন্ত্রণ কৌশলের মধ্যবর্তী লক্ষ্য এবং কার্যক্রমের উন্নতির উপর সর্বদা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে এমডিটি চিকিৎসার মাধ্যমে ব্যাপকতার হার কমিয়ে আনা। এমডিটি (MDT) চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রোগী কমিয়ে আনা সম্ভব হলে ব্যাপকতার হার কমানো শুধু শীঘ্র রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসার উপর নির্ভর করবে। প্রত্যাশিত লক্ষ্যে এমডিটি প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম তীব্রতর করা হলে হিসাবকৃত ব্যাপকতার হার, রেজিস্ট্রিকৃত ব্যাপকতার হার, অনুমানকৃত কুষ্ঠরোগের প্রসার এবং রোগী চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করা যাবে।

কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের কৌশলকে বাস্তবসম্মত করার লক্ষ্যে আরো সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়।

৪.৪.১.১ পূর্বপ্রেক্ষিত বিবেচনা করা ঃ কুষ্ঠরোগীর পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের জন্য গ্রহণযোগ্য কৌশল অনুমোদন করতে হবে যা অত্যন্ত সহজ এবং ব্যাপকভাবে কার্যে পরিণত করা সম্ভব হবে। এ কৌশলের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, অন্যান্য দাতা সংস্থা বিশেষ করে যারা অর্থনৈতিক ও অন্য কোনো সহযোগিতায় আগ্রহী তাদের মধ্যে একটি দৃঢ় অঙ্গীকারের সমন্বয় সাধনের আহ্বান জানানো হয়। সরকার এবং অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে ইতোমধ্যে এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য একটি বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.৪.১.২ প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড ঃ প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডে প্রথমেই একটি সুদূরপ্রসারী কার্যপরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। অথবা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য অর্জনের সুবিধা অনুযায়ী একাধিক পরিকল্পনাকে রূপান্তরিত করে অনুসরণ করা যেতে পারে। এসব পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্ষিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে।

দ্বিতীয়ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য সম্পদের সমন্বয় সাধনের উপর জোর দেয়া হয়। যেমন—এ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের জন্য আন্তর্জাতিক দ্বিমুখী সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে।

তৃতীয়ত সাধারণ স্বাস্থ্য কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। বিশেষ স্থান ব্যতীত দুটি ব্যবস্থা একসাথে পরিচালনার প্রয়োজন নেই। সাধারণ স্বাস্থ্য কার্যক্রমের এ বাড়তি দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ উপাদান, যেমন অতিরিক্ত জনশক্তি সরবরাহ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে তত্ত্বাবধানের এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.৪.১.৩ মূল কার্যক্রম ঃ প্রথমত রোগীর তালিকাভুক্তকরণকে আধুনিকীকরণ করা হয়। ব্যাপকতার হার, এমডিটি প্রয়োগ ইত্যাদি সময় অনুযায়ী পরীক্ষামূলকভাবে সহজ উপায়ে পরিদর্শনের জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয়ত, এমডিটি কার্যক্রম পরিচালিত করা, সকল রেজিস্ট্রিকৃত রোগী এবং নতুন রোগীদের মধ্যে এমডিটি প্রয়োগ করা কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কার্যক্রম এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য কোনো কোনো এলাকায় প্রাথমিক ব্যবস্থা থেকে শুরু করা লাগতে পারে। সকল সংক্রামক রোগীর ক্ষেত্রে এমডিটি প্রয়োগ অপরিহার্য। অবশ্য এর জন্য ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে নেয়া প্রয়োজন। পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ এবং ওষুধের গুণগত মানের নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, নির্দেশ অনুযায়ী চিকিৎসা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা শেষ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে রোগীকে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

চতুর্থত গুরুত্ব দেয়া হয় রোগী চিহ্নিত করার উপর। রোগীরা নিজেরাই রোগ সম্পর্কে অবহিত হয়ে হাসপাতালে আসবে, এভাবে গোষ্ঠীগতভাবে রোগের প্রতি সতর্কতা সৃষ্টি করা একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। নতুন রোগীর পরিবারের এবং তার সাথে সম্পর্কিত সবাইকে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে। বেশি আক্রান্ত স্থানে রোগী চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায়। প্রান্তিক এলাকার সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণ অবশ্যই কুষ্ঠরোগের প্রাথমিক লক্ষণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। যখন ব্যাপকতার হার অত্যন্ত কমে যাবে তখন রোগ নির্ণয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী লাগবে। নতুন রোগী চিহ্নিতকরণের সময় রোগীদের শারীরিক অক্ষমতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রোগ নির্ণয়ে সময়ের পরিমাণ অনুমান করা যাবে।

পঞ্চমত, অক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা, রোগ প্রতিরোধ এবং ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শীঘ্র আরোগ্য লাভ শারীরিক অক্ষমতা প্রতিরোধের সবচেয়ে সহজ উপায়। এমডিটি প্রয়োগের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগ সেরে যায় এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হলে যথাশীঘ্র রোগী নিজেই রোগের অভিযোগ করার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারতো।

৪.৪.১.৪ সমর্থনমূলক কার্যক্রম ঃ মূল কার্যক্রমের সাথে নিম্নলিখিত সমর্থনমূলক কর্মকাণ্ড কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

(১) রোগী এবং পরিবারকে উপদেশ প্রদান।
(২) গোষ্ঠীগত শিক্ষা প্রদান।
(৩) পর্যাপ্ত উদাহরণ সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড।
(৪) সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতি সাধন।

৪.৪.১.৫ মূল্যায়ন কার্যক্রম ঃ মূল্যায়ন কর্মকাণ্ডকে দুভাবে ভাগ করা হয়। প্রথমত কার্যক্রমের উপর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং মূল্যায়ন। বিশেষ লক্ষ্য অর্জন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সম্ভাব্য সমাধানের অগ্রগতি পরিমাপ করা। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দ্রুত সমস্যা সমাধানের উদাহরণ সৃষ্টি হতে পারে। অথবা অন্যভাবে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের স্বাস্থ্য পদ্ধতি গবেষণায় প্রয়োজনীয় পদ্ধতি বেরিয়ে আসতে পারে ।

দ্বিতীয়ত, কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার উপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এ কাজে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনে দুর্গত এলাকায় অনুসন্ধান কার্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে। সতর্কতা কেন্দ্রের কড়া নজরের ভিত্তি ভবিষ্যতের উপযোগী পদ্ধতি তৈরি করা সম্ভব হবে।

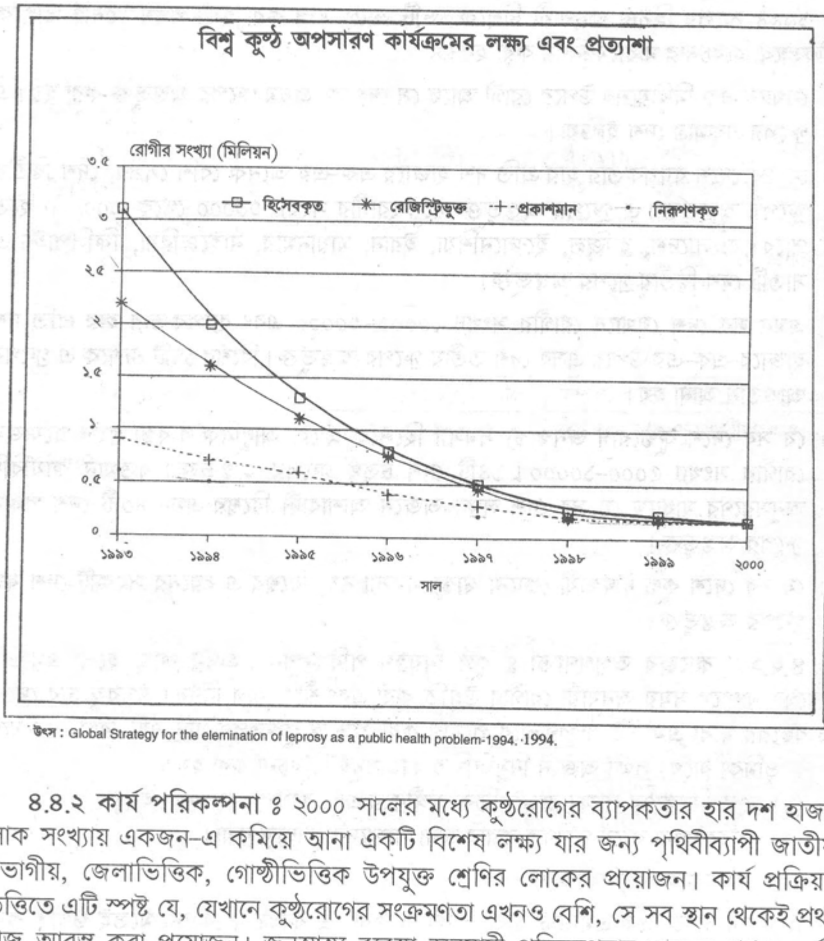

উৎস : Global Strategy for the elemination of leprosy as a public health problem-1994. 1994.

৪.৪.২ কার্য পরিকল্পনা ঃ ২০০০ সালের মধ্যে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার হার দশ হাজার লোক সংখ্যায় একজন–এ কমিয়ে আনা একটি বিশেষ লক্ষ্য যার জন্য পৃথিবীব্যাপী জাতীয়, বিভাগীয়, জেলাভিত্তিক, গোষ্ঠীভিত্তিক উপযুক্ত শ্রেণির লোকের প্রয়োজন। কার্য প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে এটি স্পষ্ট যে, যেখানে কুষ্ঠরোগের সংক্রমণতা এখনও বেশি, সে সব স্থান থেকেই প্রথম কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রথমে দুর্গত অঞ্চলের উপর গুরুত্ব দেয়া এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তারপর বিশ্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থানানুযায়ী কাজের লক্ষ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কুষ্ঠ রোগ অপসারণ কৌশলের প্রস্তাব দেয়। কুষ্ঠ ব্যাপকতার হার ১০০০০–এ ৪.৫ থেকে এক–এ আনা প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নেয়া হয় এবং অঞ্চল, দেশ, জেলা, গোষ্ঠী, যেখানে ব্যাপকতার হার বেশি তার উপর গুরুত্ব দেয়া হয় বেশি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার আওতায় যেতে পারে। বেশি আক্রান্ত স্থানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ অনুমোদন করা হবে। এ পদক্ষেপ যেমন পৃথিবীর মধ্যে কোনো দেশের উপর হতে পারে আবার দেশের ভিতরে কোনো দুর্গত স্থানের মধ্যেও হতে পারে।

৪.৪.২.১ আক্রান্ত দেশসমূহের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্তিকরণ ঃ ব্যাপকতা এবং কার্যকর বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বের দেশগুলোকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। মহামারী তত্ত্বের যৌক্তিক তথ্যের সঠিক সংখ্যা এবং হিসাবকৃত সংখ্যা থেকে অথবা রেজিস্ট্রিকৃত সংখ্যা থেকে ব্যাপকতার হার নির্ণয় করা যায়।

১৯৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বকে ৬টি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম তিনটি ভাগকে গভীরভাবে বিবেচনার মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

(১) যেখানে এক মিলিয়নের উপরে রোগী আছে সে দেশকে প্রথম গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ গ্রুপের একমাত্র দেশ ইন্ডিয়া।

(২) যে সব দেশে ব্যাপকতার হার প্রতি দশ হাজারে এক–এর অনেক বেশি সেসব দেশ দ্বিতীয় গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। এ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত দেশে রোগীর সংখ্যা ৩০০০০ থেকে ৩০০০০০ হতে পারে। বাংলাদেশ, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মায়ানমার, নাইজেরিয়া, ফিলিপাইন এ সাতটি দেশ দ্বিতীয় গ্রপের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) এমন সব দেশ যেখানে রোগীর সংখ্যা ১০০০০–৩০০০০ এবং ব্যাপকতার হার প্রতি দশ হাজারে–এক–এর উপরে এসব দেশ তৃতীয় গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বের ১৭টি দেশকে এ গ্রুপের আওতায় আনা হয়।

(৪) যে সব দেশে কুষ্ঠরোগ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে আরো আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন রোগীর সংখ্যা ৫০০০–১০০০০। ১৪টি দেশ চতুর্থ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান কার্যবিধি অনুসরণের মাধ্যমে যে সব দেশ লক্ষ্য অর্জনে আশাবাদী বিশ্বের এমন ৪০টি দেশ পঞ্চম গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) যে সব দেশে কুষ্ঠ দীর্ঘস্থায়ী কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা নয়, বিশ্বের এ ধরনের সবকটি দেশ ষষ্ঠ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত।

৪.২.২.২ কাজের অগ্রগণ্যতা ঃ কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার প্রথম কাজ হলো এমডিটি প্রয়োগের মাধ্যমে সময় অনুযায়ী রোগীর উন্নতি করা এবং শীঘ্র রোগ নির্ণয়। উপরন্তু চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে এমডিটি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি এটি রোগ সংক্রমণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। লক্ষ্য অর্জনে নিম্নলিখিত কাজসমূহ বিবেচনা করা হয়।

(১) কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং কার্যপরিকল্পনা গ্রহণ।

(২) পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার জন্য সম্পদের যোগাড় করা।

(৩) তথ্যসমূহ আধুনিকীকরণ।

(৪) সকল রোগীকে এমডিটি দ্বারা চিকিৎসা করা। এ কার্যক্রম কোনো মতেই স্থগিত করা যাবে না। ওষুধের পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং বণ্টন নিশ্চিত হতে হবে।

(৫) রোগী চিহ্নিত করে এমডিটি চিকিৎসার মাধ্যমে জনসাধারণের সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে দ্রুত রোগ নির্ণয়ে অবদান রাখতে পারে।

(৬) প্রশিক্ষণ বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এর জন্য মূল কার্যক্রম স্থগিত রাখা যাবে না।

(৭) অনুমোদিত পরিকল্পনার উন্নতি সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখা।

সারণি ৪.১ ঃ কুষ্ঠরোগের পরিস্থিতি এবং সময় অনুযায়ী কাজের অগ্রগণ্যতা।

কার্যক্রম	শ্রেণি	সময়	কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যম
রাজনৈতিক অঙ্গীকার	২	১৯৯৪ সাল	জাতীয় এবং আঞ্চলিক সভা
সম্পদ পুনর্বণ্টন	২	১৯৯৪ সাল	দাতা গোষ্ঠীর বৈঠক

তথ্য আধুনিকীকরণ	২	১৯৯৪ সাল	বিশেষ শ্রেণি
সকল তালিকাভুক্ত রোগীর এমডিটি দ্বারা চিকিৎসা ব্যবস্থা	১ ও ২	১৯৯৪ সাল	ওষুধ সরবরাহ ও মজুদ নিয়ন্ত্রণ
জাতীয় পরিকল্পনা পুনরালোচনা	২	১৯৯৪ সাল	হু (WHO) কর্মচারীদের প্রযুক্তিগত সহায়তা, বৈঠক এবং নির্দেশনা
নতুন রোগী চিহ্নিত-করণের অগ্রগামিতা	২	১৯৯৩-২০০০ সাল	এইচ এস আর (HSR), সাধারণ স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সাথে একীকরণ এবং স্ব-অভিযোগের ব্যাপ্তি
প্রশিক্ষণ এবং এইচ এস আর (HSR)	১ ও ২	১৯৯৪-২০০০ সাল	টাস্কফোর্স ; জাতীয় কার্যক্রম।
বাস্তবায়ন সতর্কতা	১ ও ২	১৯৯৩-২০০০ সাল	সম্পূর্ণ বার্ষিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ
নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন	১, ২ ও ৩	১৯৯৪-২০০০ সাল	তালিকাসমূহ পুনঃপরীক্ষাকরণ

উৎস : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য, ১৯৯৪।

কাজের অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কি পরিমাণ রোগী চিহ্নিত করা হবে এবং চিকিৎসা করা হবে তারও একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে।

৪.৪.২.৩ প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ঃ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণে এমডিটি প্রয়োগের ভিত্তিতে বিস্তীর্ণ এবং অবিরত কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম একটি উল্লেখযোগ্য সুযোগ। আক্রান্ত দেশসমূহে কুষ্ঠ অন্যান্য রোগের তুলনায় অগ্রগণ্যতা পায়। তবুও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ সম্ভাবনা নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ধরনের কৌশলের প্রয়োগে দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার হার নাটকীয়ভাবে কমে আসছে। কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে রোগ হ্রাস পাবে বলে আশা করা হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ বরাদ্দ করা হয়। নিম্নে সম্পদ বরাদ্দের একটি হিসাব দেয়া হলো ঃ

সারণি ৪.২ ঃ আঞ্চলিক ভিত্তিতে সম্পদ বরাদ্দকরণ।

অঞ্চল (WHO)	আরোগ্যকৃত রোগীর সংখ্যা	সম্পদ (মিলিয়ন, ইউএস ডলার)
আফ্রিকা	৩৪০০০০	৩৪
আমেরিকা	৩৮৩০০০	৩৭
ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশ	৮০০০০	১২
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	৪০৬০০০০	৩২৯
প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশ	১৩০০০০	২০
ইউরোপ	৭০০০	১
পৃথিবী	৫০০০০০০	৪২৫

উৎস : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য, ১৯৯৪।

উল্লেখ্য, ২০০০ সালের মধ্যে পাঁচ থেকে ছয় মিলিয়ন রোগী আরোগ্য লাভ করতে হবে। ৪০০-৫০০ মিলিয়ন (ইউএস ডলার) সম্পদের মধ্যে ওষুধ বাবদ ১২০-১৫০ মিলিয়ন এবং অন্যান্য

BAMSDOC Library Dhaka

কাজে ২৮০–৩৫০ মিলিয়ন (ইউএস. ডলার) পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করা হবে। সম্পদের প্রয়োজনীয়তার উপর বিস্তৃত তথ্য প্রদান করে শুধু কুষ্ঠ ইউনিটের অনুরোধে এ সম্পদ সরবরাহ করা হবে।

৪.৪.৩ **কার্যক্রম উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ** কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয়।

প্রশিক্ষণ (Training) ঃ অল্প সময়ের মধ্যে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অনুমোদন এবং মূল্যায়নের ফলে আক্রান্ত দেশগুলোতে কুষ্ঠ একটি স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অনেক কুষ্ঠরোগী এখনো ঐসব দেশের এমডিটি দ্বারা উপযুক্ত চিকিৎসা পাচ্ছে না। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কুষ্ঠ ইউনিট পাঁচ রকম প্রশিক্ষণের উদ্ভাবন করে। আর আর্থিক সহায়তা দেয় নেদারল্যান্ড সরকার। প্রশিক্ষণগুলোর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা বাড়ানো হয়। সব প্রশিক্ষণ সাধারণ কার্যকরী, নিয়মিত পুনরালোচনা এবং পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের প্রতিক্রিয়া নিয়মিত সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখা উচিত। কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সাথে জড়িত সকলে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নিয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ রোগী চিহ্নিত করে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

স্বাস্থ্য পদ্ধতি গবেষণা (Health System Research) ঃ কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য পদ্ধতি গবেষণার মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে ক্ষেত্র অনুযায়ী সমস্যা সমাধান করা যায়। কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য পদ্ধতি গবেষণা এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে বিভিন্ন দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে মূল্যায়ন করা যায়। এ পদ্ধতিগুলো সম্পর্ক অনুযায়ী কার্যকর এবং সাধারণ হওয়া উচিত। অগ্রবর্তী কাজ চিহ্নিত এবং স্থান ভিত্তিতে সমস্যা চিহ্নিত করে প্রয়োজন অনুযায়ী সমাধান করতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ১৯৯১ সালের কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার প্রথম বৈঠক কার্যকরী দল স্বাস্থ্য পদ্ধতি গবেষণার সুপারিশ করে এর উপর টাস্কফোর্স গঠন করে। টাস্কফোর্সের উদ্দেশ্য হলো ঃ

(১) কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা উন্নয়নে স্বাস্থ্য গবেষণা ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা।
(২) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নিকট স্বাস্থ্য পদ্ধতি গবেষণার প্রস্তাব উত্থাপন করা।
(৩) একই কর্মে উৎসাহী সংস্থাসমূহকে এক সাথে কাজ করার জন্য সাহায্য করা।

৪.৪.৪ **কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাম্প্রতিক প্রয়োজনীয়তা ঃ** নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

উন্নত চিকিৎসা ঃ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) অনুমোদিত এমডিটি প্রয়োগে অত্যন্ত সুফল পাওয়ায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাতীয় কার্যক্রমে এমডিটি প্রয়োগে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। মাত্র তিনটি ওষুধ রয়েছে যা প্রয়োগ করা হয়। যদি কোনো সংক্রামক রোগী চামড়ার রং পরিবর্তনের জন্য ক্লোফাজেমিন নামক ওষুধ প্রয়োগে সম্মত না হয় তার জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। আবার কোনো কোনো রোগী রিফেমপেসিন গ্রহণ করতে অক্ষম অথবা কোনো ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে গেলে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। ভবিষতের জন্য তাই নতুন ওষুধের প্রয়োজন, যা অল্প সময়ের মধ্যে কার্যকর হবে এবং দেরিতে রোগ নির্ণয়ের জন্য সৃষ্ট জটিলতায়, প্রতিক্রিয়ায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত স্নায়ুতন্ত্রের উন্নয়নে কাজ করবে। চিকিৎসা ব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে দ্রুত রোগ নির্ণয় ও অন্যান্য জটিলতা নির্ধারণ করা যায় এবং রোগীদের কাছে সস্তা ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়।

বাস্তবসম্মত গবেষণা ঃ তিনটি ওষুধ ওফ্লোক্সাসিন (Ofloxacin), ক্লারিথ্রোমাইসিন (Clarithromycin) এবং মিনোসাইক্লিন (Minocycline) সম্প্রতি কুষ্ঠ রোগের ওষুধ হিসেবে গবেষণা চলছে। গবেষণার মাধ্যমে এসব ওষুধের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং অল্প সময়ে কার্যকর হয় এমন ওষুধ আবিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন।

ভবিষ্যত নির্দেশনা ঃ বর্তমানে কিছু নতুন ওষুধ সহজলভ্য। এগুলোর উন্নয়ন করে সঠিক এবং নিয়মিত ব্যবহার প্রয়োজন। আক্রান্ত আটটি দেশের পনেরটি কেন্দ্রে ওফ্লোক্সাসিনসহ এমডিটি ব্যবহার করে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। নতুন ওষুধসমূহের কার্যকারিতার উপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। যখন কুষ্ঠরোগের রকমারী ওষুধ থাকবে তখন কার্যকর ওষুধসমূহ জনপ্রিয়তা পাবে। যেসব ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে সেগুলোর প্রয়োগ সীমিত হয়ে আসবে।

৪.৪.৫ যৌথ কর্মকাণ্ড ঃ স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী সকল সংস্থা সমন্বিতভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। তাদের আন্তরিক সহযোগিতায় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে। কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান দিয়েছে আন্তর্জাতিক এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ। বিশেষ করে জাপানের সাসাকাওয়া ফাউন্ডেশন, আই এল ইপি এবং বিশ্ব ব্যাংক। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কুষ্ঠ পরিস্থিতি মূল্যায়ন, কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, এমডিটি প্রয়োগের অনুমোদন প্রভৃতি বিষয়ে সহযোগিতা করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নতুন ওষুধ আবিষ্কারের গবেষণায়ও উৎসাহ প্রদান করে।

বিজ্ঞানী ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখতে পারে আই. এল. ই. পি. (ILEP) এর সদস্য ১৯৯৩ সালে ৭৪ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। তাদের উদ্দেশ্য হলো বেশিরভাগ রোগীর মধ্যে ২০০০ সালের মধ্যে এমডিটি প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। আই এল এ (ILA) বিভিন্ন ধরনের মাঠ কার্যক্রমের সহায়তা করে এবং বিশেষভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়সমূহের উপর জোর দেয়। আইএলইউ (ILU) উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সতর্কতা সৃষ্টি, কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহ এবং সরকারি বেসরকারিভাবে এমডিটি প্রয়োগে সহায়তা করে। জাপানের সাসাকাওয়া ফাউন্ডেশন, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে সহায়তা করে। কুষ্ঠ অপসারণ কার্যক্রম বিশেষভাবে সম্পদের সঠিক ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। এ কাজে প্রয়োজনীয় সম্পদ আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দাতা সরকারদের মাধ্যমে জোগাড় করা হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য কুষ্ঠ চিকিৎসায় কার্যকর এবং সহজে প্রয়োগযোগ্য ওষুধ আবিষ্কারের গবেষণায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

২০০০ সালের মধ্যে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ যৌথ প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। ইতোমধ্যে এর কিছু সাফল্য দেখা যাচ্ছে। অংশীদারী কার্যক্রম পরস্পর বিশ্বাস, বোধগম্যতা এবং শ্রদ্ধার উপর নির্ভরশীল। এটি একত্রে এক লক্ষ্যে কাজ করার একটি বিশেষ পদ্ধতি। একই লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করলে বিভিন্ন দিক যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ, সাধারণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের একীকরণ, স্থান অনুযায়ী আর্ত–সামাজিকভাবে রোগীদের পুনর্বাসন, এবং বিভিন্ন কৌশল ও আর্থিক লেনদেন সহজ হয়। মোটকথা, কার্যক্রমে এমন একটি জালের ন্যায় সম্পর্কের সৃষ্টি হবে যাতে বিশ্বে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে জড়িত কর্মীদের কাজের কোনো পার্থক্য থাকবে না। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ ধরনের কার্যক্রম অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য।

৪.৫ বিশ্বে কুষ্ঠরোগের স্থানভিত্তিক তথ্য

১৯৯১ সালের বিশ্ব সম্মেলনের সংকল্প অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের উন্নতির কারণ হলো আক্রান্ত দেশে এমডিটি প্রয়োগ, উপযুক্ত তথ্য নির্দেশনা এবং বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা

প্রাথমিকভাবে এমডিটির প্রয়োগ আক্রান্ত দেশগুলোতে অল্প সময়ে কুষ্ঠ পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। নিম্নে সারণির মাধ্যমে ১৯৯৪ সালের বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ৬টি অঞ্চলের রোগীর সংখ্যা, ব্যাপকতার হার, এমডিটি গ্রহণের হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ৪.৩ ঃ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন অঞ্চলে কুষ্ঠরোগের পরিস্থিতি।

অঞ্চল (দেশের সংখ্যাসহ)	তালিকাভুক্ত রোগী	ব্যাপকতার হার প্রতি ১০০০০	এমডিটি প্রয়োগ শেষ (%)	এমডিটি প্রয়োগ শেষ (সংখ্যা)	এমডিটি প্রয়োগ চলছে (%)
আফ্রিকা (৩৪)	১৫৫৫৩৬	২.৯৬	৬৫. ০২	২৫৭৭৫৭	৮৬.৮৪
আমেরিকা (১৬)	২৭৬৪৯৮	৩.৭১	৩৮.১৩	৫৫২৫১	৪৮.৪৪
ভূমধ্য সাগরের পূর্বাংশ (৩)	২২৫৯৪	০.৫৫	৯১. ৮৮	২৯৯০৭	৯৬.৫১
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (৯)	১১৭৩৬৩০	৮.৫৭	৫৩.৮৯	৫১২৩৯৫৮	৯১.৪১
প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশ (১৭)	৫৭৯৭২	০.৩৭	৮৯.৭২	১৩২৩৩২	৯৬.৮৭
ইউরোপ	৪৯২৭	০.০৬	৪৭.৪৯	২১৩৪	৬৩.৩৬
মোট (৭৯)	১৬৯১১৭	৩.১০	৫৪.০৬	৫৬০১৩৩৯	৮৯.৩৫

উৎস : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য, ১৯৯৪।

সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী ৫৪% রেজিস্ট্রিকৃত রোগীকে এমডিটি প্রয়োগ করা হয়েছে। অচিরেই এ সংখ্যা ৮৯% পৌছাবে। ১৯৮৫ সাল থেকে ৫.৬ মিলিয়ন রোগী ভাল হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো দেশে রোগ নির্ণয় এবং কার্যকর চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অঞ্চল অনুসারে রেজিস্ট্রিভুক্ত রোগী-১৯৯৪

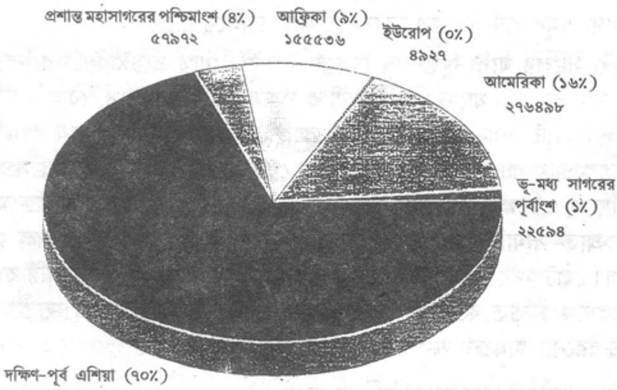

উৎস : Global Strategy for the elemination of leprosy as a public health problem-1994.

৪.৬ আক্রান্ত ২৫টি প্রধান দেশের কুষ্ঠরোগের পরিস্থিতি

৭৯টি দেশে স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে কুষ্ঠ থাকলেও বিশ্বের ২৫টি দেশে ৯২% রোগী রয়েছে। পরিকল্পনার জন্য হিসাবকৃত রোগীর ভিত্তিতে দেশগুলোকে ক্রমান্বয়ে সাজানো হয়েছে। এ শ্রেণি বিন্যাসের সাথে রেজিস্ট্রিকৃত রোগী অথবা ব্যাপকতার হারের সাথে সামঞ্জস্য নাও থাকতে পারে।

সারণি ৪.৪ ঃ আক্রান্ত ২৫টি প্রধান কুষ্ঠরোগের পরিস্থিতি।

দেশ	রেজিস্ট্রিকৃত রোগী	ব্যাপকতার হার	এমডিটি প্রয়োগকৃত রোগী	এমডিটি প্রয়োগ (%)	এমডিটি প্রয়োগ শেষ
ইন্ডিয়া	৯৯৫২৮৫	১১.৩৪	৫১৬৪১৩	৫১.২০	৪৫৫৭১২৬
ব্রাজিল	২২৩৫৩৯	১৪.৩০	৭২৬৯৪	৩২.৫২	২৩০০৮
বাংলাদেশ	১৯৯৩২	১.৬৩	১৩০০৭	৬৫.২৬	৩৫৬১৮
ইন্দোনেশিয়া	৭০৯৬১	৩.৭১	৪৫৯৩১	৬৪.৫৯	৭৭৯৩৩
মায়ানমার	৫৬৪১০	১২.৯৮	৩১৬৪৬	৫৬.১০	১০১৯৯৮
নাইজেরিয়া	৩৬৯০৭	৪.১৭	২২৪৭৩	৬০.৮৯	২২৫১
ফিলিপাইন	১৫৩১৭	২.৩৪	১৪৭৫১	৯৬.৩০	২৮৪৯১
ইরান	২৬২৭	০.৪৬	২৬২৭	১০০.০০	—
নেপাল	২১৭০২	১০.৮৯	১৬৪২৬	৭৫.৬৯	২৫১৩৭
সুদান	৪৫৭৯	১.৭১	৪৫৭৯	১০০.০০	২৪৭৮
জায়ারে	৮১৯০	২.১৬	৫৪৬০	৬৬.৬৭	৪১৯৫৭
ইথিওপিয়া	১৫৬৭৩	৩.০০	১২০৫৯	৭৬.৯৪	৫০৫৭৮
মোজাম্বিক	১২৮৩৮	৭.৭৭	৫৪১৩	৪২.১৬	৫৩৩
গিনি	৬৯৪২	১১.৩৬	৬৯৪২	১০০.০০	১৮৩৬৬
কলম্বিয়া	১৫৯৩১	৪.৬৫	৭৪৪৯	৪৬.৭৬	১৬৬৮
আইভরিকোস্ট	৩৭৬২	২.৯০	৩৬০২	৯৫.৭৫	১৬১৬৩
ভিয়েতনাম	৯৪৪৯	১.৩৬	৭৪২৩	৭৮.৫৬	২৩২৮৪
মালি	৮০০০	৮.১৫	৪৮০০	৬০.০০	৩২৭৯
মাদাগাস্কার	৫৩৬৯	৪.১৯	৫৯৬৯	১০০.০০	৯১১৮
চাঁদ	৬৯৫২	১১.৬৪	৭৬১	১০.৯৫	২৪৭২
মেক্সিকো	৮৯৩৮	০.৯৭	৬১৮৭	৬৯.২২	৪৪১৭
কম্বোডিয়া	১৬২৭	১.৮৮	১৬২৭	১০০.০০	৩১৫২
নাইজার	৬৫৬৩	৭.৯৬	১৬৯০	২৫.৭৫	১৬৬২
থাইল্যান্ড	৬৮১৯	১.১৯	৬৬৬৭	৯৭.৭৭	৩৬০৫৪
মিশর	৩৩৩৮	০.৬১	৩৩৩৮	১০০.০০	১৬০২৪
মোট	১৫৬৭৬৪৪৯	৭.৩৩	৮১৯২৩৪	৫২.২৬	৫৩৪৮৭৩৭

উৎস : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য, ১৯৯৪।

৪.৭ আক্রান্ত দেশগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ভারতের আয়তন প্রায় ৩২৫০০০০ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৮৪৪০০০০০০। দেশটি ৮° উত্তর অক্ষাংশ হতে ৩৭° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত, ৬৮° পূর্ব দ্রাঘিমা হতে ৯৮° পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, বর্ণ, ভাষাগত বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যের জন্য

ভারতকে একটি ক্ষুদ্র মহাদেশ বলা যায়। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ২৫৯ জন। শ্রমশক্তি ৫৬%, শিক্ষিতের হার ৩৮%, নগর বাসিন্দা ২৮%, এবং মাথাপিছু আয় ৩৫০ ডলার। পৃথিবীর মধ্যে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার হার সবচেয়ে বেশি ভারতে। কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার ভিত্তিতে ব্রাজিল দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ব্রাজিলের আয়তন ৮৫১২০০০ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ১৫৩৭৭১০০০, প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৮, শ্রমশক্তি ৫৮%, শিক্ষিতের হার ৭৬%, নগর বাসিন্দা ৭৬%, মাথাপিছু আয় ২৪৩৪ ডলার। তৃতীয় স্থানে আছে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এটি ২০°৩৪ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬°৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৮৮°১´ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯২°৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়তন ১৪৪০০০ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ১১৭৯৭৮০০০। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৮১৬। শ্রমশক্তি ৫০%, শিক্ষিতের হার ৩২.৪%, নগর বাসিন্দা ২২%, মাথাপিছু আয় ২১ ডলার।

নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত মালয়েশিয়া, ও ফিলিপিনের এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অবস্থিত। ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জ। এর আয়তন ১৯১০০০০ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ১৯১১৬৬০০০, প্রতি বর্গকিলোমিটারে ঘনত্ব ১০০। শ্রমশক্তি ৫৭%, শিক্ষিতের হার ৮৫%, নগর বাসিন্দা ২৫%, মাথা পিছু আয় ৪৩০ ডলার। মায়ানমার (বার্মা) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত দেশ যার আয়তন ৬৮০০০০, লোকসখ্যা ৪১২৭৯০০০। উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুবিশিষ্ট এ অঞ্চলে মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কৃষিপ্রধান দেশ মায়ানমার বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজের সাথে জড়িত। অর্থনৈতিকভাবে বেশি স্বচ্ছল নয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী এ পাঁচটি দেশেই বেশিরভাগ কুষ্ঠরোগী রয়েছে।

বিশ্বে নিরূপণকৃত কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতা-১৯৯৪

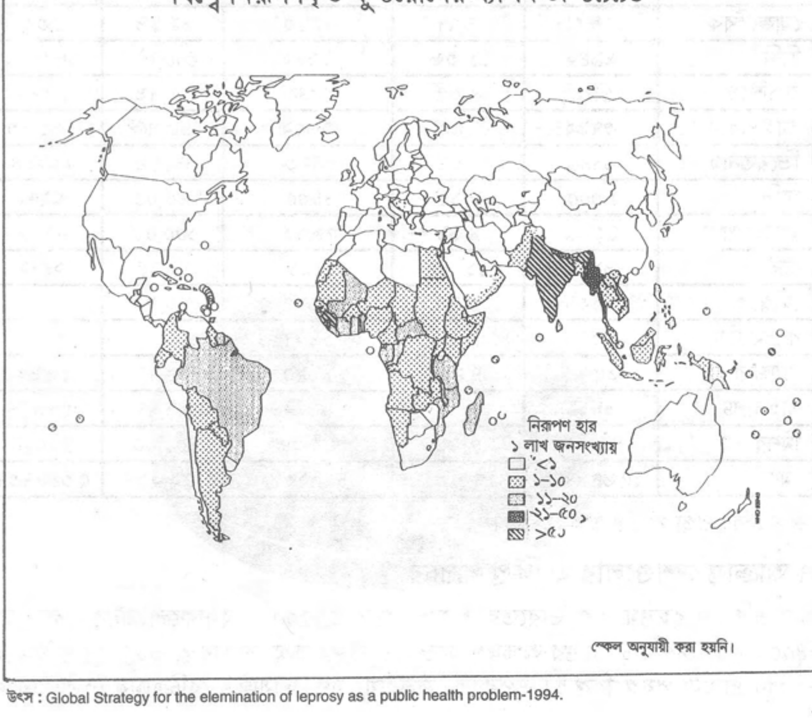

উৎস : Global Strategy for the elemination of leprosy as a public health problem-1994.

অবশিষ্ট বিশটি দেশের মধ্যে ফিলিপাইন, ইরান, নেপাল, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। দেশগুলোর মধ্যে ভিয়েতনাম এবং নেপাল অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় আছে। ১২টি দেশ আফ্রিকা মহাদেশে এবং মাত্র দুটি দেশ রয়েছে আমেরিকায়। ম্যাক্সিকো শিক্ষার হার এবং মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে উন্নত। বেশিরভাগ দেশই অনুন্নত। উন্নত দেশগুলোতে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে সহজ হবে বলে আশা করা যায় এবং ফলাফলও ভাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাস্তবে তা দেখার জন্যই দুই হাজার সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

সারণি ৪.৫ ঃ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত দেশসমূহের মৌলিক তথ্য।

দেশ	আয়তন	জনসংখ্যা	ঘনত্ব বঃকিঃ	শ্রমিক (%)	শিক্ষিত (%)	নগরবাসিন্দা (%)	আয় (বার্ষিক)
ইন্ডিয়া	৩২৫০০০০	৮৪৪০০০০০০	২৫৯	৫৬	৩৮	২৮	৩৫০
ব্রাজিল	৮৫১২০০০	১৫৩৭৭১০০০	১৮	৫৮	৭৬	৭৬	২৪৩৪
বাংলাদেশ	১৪৪০০০	১১৭৯৭৮০০০	৮১৬	৫০	২৯	২২	২১০
ইন্দোনেশিয়া	১৯১০০০০	১৯১১৬৬০০০	১০০০	৫৭	৮৫	৪৫	৪৩০
মায়ানমার	৬৮০০০০	৪১২৭৯০০০	৬১	৫২	১৪	২৪	৪২০
নাইজেরিয়া	৯২৪০০০	১০৮৮৬৫০০০	১১৮		৪২	২৩	২৫০
ফিলিপাইন	৩০০০০০	৬৬৪৭০০০	২২২	৫৬	৮৬	৪১	৬৬৭
ইরান	১৬৫০০০০	৫৫৬৪৭	৩৪	৫০	৪৮	৫৫	১৮০০
নেপাল	১৪১০০০	১৯১৩৮০০০	১৩৬	৫৩	২৯	৮	১৬০
সুদান	২৫১০০০০	২৫১৬০০০০	১০		২০	৩৫	৪২০
জায়ারে	২৩৪৪০০০	৩৫৩৩০০০০	১৫		৫৫	৪৪	২৬০
ইথিওপিয়া	১২২৩০০০	৫১৩৭৫০০০	৪২	৫১	১৮	১১	১২১
মোজাম্বিক	৭৮৭০০০	১৪৭১৮	১৯	৪৭	১৪		৩১৯
গিনি	২৪৬০০০	৭২৬৯০০০	৩০	৫১	৩৫	২৬	৪৩০
কলম্বিয়া	১১৩৯০০০	৩২৫৯৮০০০	২৯	৪৭	৮০	৬৫	১১৯০
আইভরিকোস্ট	৩২০০০০	১২০৭০০০০	৩৮	৫৮	৪৫	৪৭	৭৯০
ভিয়েতনাম	৩৩০০০০	৬৮৪৮৮০০০	২০৮	৫০	৭৮	২০	২০০
মালি	১২০৪০০০	৯১৮২০০০	৮	৫৪	১০	২২	২০০
মাদাগাস্কার	৫৮৭০০০	১১৮০২০০০	২০	৪৯	২২		২৩০
চাঁদ	১২৭১০০০	৫০৬৪০০০	৪		১৭	২৩	১৯০
মেক্সিকো	১৯৭২০০০	৮৮৩৩৫০০০	৪৫	৪২	৮৮	৭২	২৩৭৩
কম্বোডিয়া	১৮২০০০	৬৫৯২০০০	৩৬		৫০	১০	৯৬০
নাইজার	১২৬৭০০০	৭৬৯১০০০	৭	৪৯	১৩	২১	২৯০
থাইল্যান্ড	৫১০০০০	৫৪৮৯০০০০	১০৭	৮৯	৮৯	২০	১১৭০
মিশর	১০০০০০	৫৪১৪০০০০	৫৪	৫৩	৪৪	৪৪	৬৩০

উৎস : World Almanac সহ বিভিন্ন উৎস থেকে সংকলিত।

৪.৮ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ২০°৩৪ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৮৮°০১ থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ অবিভক্ত ব্রিটিশ বাংলার শতকরা ৬৪ ভাগ এবং আসামের সিলেট জেলার অধিকাংশ স্থান নিয়ে গঠিত হয়েছে। আয়তন ১৪৭৫৭০ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ১১১.৪ মিলিয়ন, বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১৭ ٪, নারী পুরুষ অনুপাত ১০০ : ১০৬। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৭৫৫ (পরিসংখ্যানিক তথ্য, ১৯৯১)।

বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম, পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য মিজোরাম ও মায়ানমার। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত। বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা ৪৭১১.১৫ কিলোমিটার। এর মধ্যে বাংলাদেশ–ভারত সীমারেখার দৈর্ঘ্য ২৮০ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ ভূভাগ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর–পূর্ব দিক থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একযোগে এ সুবিশাল বদ্বীপের সৃষ্টি করেছে। সীমিত উচ্চভূমি ছাড়া সমগ্র দেশ এক বিস্তীর্ণ বৈচিত্র্যহীন সমভূমি। ভূপ্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ, সিলেট জেলার উত্তর–পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণাংশ টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহের অন্তর্গত। উত্তর–দক্ষিণে বিস্তৃত এ পাহাড়গুলোকে আসামের লুসাই এবং মায়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয় বলে ধরা হয়। দক্ষিণ–পূর্বের এ পাহাড়গুলোর গড় উচ্ছতা ৬১০ মিটার। কিন্তু পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে এদের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাংশের বরেন্দ্র ভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় বা উচ্চভূমিসমূহকে প্লাইস্টোসিন কালের সোপান বলা হয়। প্রায় ২৫০০০ বছর পূর্বে এসব সোপান গঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। রাজশাহী বিভাগের প্রায় ৯৩২০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বরেন্দ্র ভূমি বিস্তৃত। মধুপুরের গড় ও ভাওয়ালের গড় গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার ৪১০৩ বর্গ কি.মি. জুড়ে রয়েছে। লালমাই পাহাড়ের আয়তন ৩৩.৬৫ বর্গ কি.মি.। প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহের উচ্চতা সমতল ভূমি থেকে ৬ থেকে ৪৫ মিটার পর্যন্ত দেখা যায়।

টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ নদী বিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। বছরের পর বছর বন্যার সাথে প্রবাহিত পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে পলল সমভূমি গঠিত হয়, বাংলাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে সমভূমির ঢাল ক্রমশ নিচু হয়ে সমুদ্র সমতলের সাথে মিশে গেছে। সমভূমির স্থানে স্থানে বহু নিম্ন ভূমি বা জলাশয় দেখতে পাওয়া যায়।

পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা তিন প্রধান নদীর উপ–নদী, শাখা–নদী এবং অন্যান্য সর্পিল গতিবিশিষ্ট নদীগুলো জালের ন্যায় দেশের সর্বত্র বিস্তৃত রয়েছে। প্রধান তিনটি নদী মিলিত হয়ে এবং অন্যান্য নদীগুলোও সব বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

কর্কটক্রান্তি বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে চলে গেছে। সাগর সান্নিধ্য এবং মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতা খুব বেশি মাত্রায় অনুভূত হয় না। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। জুন মাসের প্রারম্ভে বঙ্গোপসাগর থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের পাহাড়িয়া এলাকায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অক্টোবর মাস পর্যন্ত পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটায়। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকালে দেশে সর্বোচ্চ উষ্ণতা বিরাজ করে। কালবৈশাখী ঝড় গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গ্রীষ্মকালের শেষার্ধে

প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে বর্ষাকালকে একটি স্বতন্ত্র ঋতু হিসাবে ধরা যায়। এর পরই আসে শীত ঋতু, তখন তাপমাত্রা থাকে সবচেয়ে কম এবং বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। শীতকালে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৪° সেলসিয়াস ও ২১° সেলসিয়াস। গড় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৯৯৪ মি.মি. থেকে ৩৪৫৪ মি. মি.।

সমগ্র বাংলাদেশের ২২৫৮৪ বর্গ কি.মি. অরণ্যময়। এ হিসাবে মোট আয়তনের ১৬% বনভূমি। বাস্তবে বিভিন্ন কারণে বনাঞ্চলের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। পত্রিকার খবর অনুযায়ী বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ ৯% এ নেমে এসেছে। বনভূমিগুলো বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল এবং খুলনা অঞ্চলে অবস্থিত। উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বনভূমি তিনভাগে বিভক্ত। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে অতি বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট সেগুন, গর্জন, জারুল, সামারী, চাপালিশ, তেলসুর, কড়ই বৃক্ষ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি সৃষ্টি করেছে। প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহে ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি রয়েছে। এ বনভূমির ৯৫% বৃক্ষই শাল। দেশের দক্ষিণ–পশ্চিম কোণে রয়েছে স্রোতজ বনভূমি সুন্দরবন। সুন্দরী, গড়ান, গেওয়া সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ। বন দেশের মূল্যবান সম্পদ। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমির বাঁশের উপর নির্ভর করে সুবৃহৎ কর্ণফুলী কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানায় সুন্দরবনের গেওয়া বৃক্ষ কাঁচামালরূপে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া রেলপথের স্লিপার, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি, সাম্পান নৌকা তৈরি, ঘরের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে জ্বালানি কাঠ হিসেবেও বনজ সম্পদের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে মৎস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিজ সম্পদ। শতকরা ৭৩ ভাগই মিঠা পানির মাছ। দেশের ৭১৬ কি.মি. দীর্ঘ তটরেখার কাছে অগভীর সাগর জলে প্রচুর সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য আধুনিক কলাকৌশল, হিম গুদাম এবং উন্নত বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, স্বেত মৃত্তিকা, কাচবালি, খনিজ তেল এবং চুনাপাথর বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য খনিজ দ্রব্য। বগুড়া এবং রাজশাহী অঞ্চলে উন্নতমানের কয়লা পাওয়া গেছে। এছাড়া সিলেট, ফরিদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর অঞ্চলে পীটজাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে ব্যবহারের জন্য এখনো কোথাও উত্তোলন আরম্ভ হয় নি। উল্লেখ্য, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লা উত্তোলনের কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। ২/১ বছরের মধ্যে উত্তোলন কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্য। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত গ্যাসক্ষেত্রসমূহে এক লক্ষ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সংরক্ষিত আছে বলে অনুমান করা হয়। বিভিন্ন শিল্পে এবং জ্বালানিস্বরূপ প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিস্তীর্ণ সমভূমি, উর্বর মৃত্তিকা ও বৃষ্টিবহুল জলবায়ু বাংলাদেশকে একটি উৎকৃষ্ট কৃষিভূমিতে পরিণত করেছে। কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশ হলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে কৃষিক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে বাংলাদেশের বহুবিধ সমস্যা রয়েছে। এদেশের জনপ্রতি আবাদী জমির পরিমাণ পৃথিবীর অন্যান্য জনবহুল ও কৃষিপ্রধান দেশের তুলনায় কম। দেশের ২০১৫৭৫৬৪ একর ভূমি কৃষিকাজের উপযুক্ত। মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ ০.২৫ একর। ধান, তেলবীজ, ডাল, গম ইত্যাদি প্রধান খাদ্যশস্য। পাট, চা, আখ, তামাক প্রধান অর্থকরী ফসল। খাদ্যশস্যে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রতি বছর ২৫০০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়।

শিল্পক্ষেত্রে বাংলাদেশ খুব উন্নত নয়। এ পর্যন্ত দেশে যে স্বল্পসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পগুলোর মধ্যে পাট, বস্ত্র, চিনি, কাগজ, সিমেন্ট, সার এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বৃহৎ শিল্পের মধ্যে চট্টগ্রামের লোহা ও ইস্পাত শিল্প, গাড়ি সংযোজন কারখানা, মেশিনটুলস ফ্যাক্টরী ইত্যাদির সম্ভাবনা রয়েছে। এসব শিল্পকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন।

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি জনসংখ্যার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। উপযুক্ত জনশক্তি ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদসমৃদ্ধ দেশও অর্থনৈতিক উন্নয়নে আশানুরূপ অগ্রগতি লাভ করতে পারে না। ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৬০৫ জন। ১৯৯১ সালের হিসাবে ৭৫৫ জনে এসেছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম জনবহুল দেশ। কিন্তু আয়তনের দিক থেকে ৯০ তম। জনবসতির বণ্টনের হার সর্বত্র সমান নয়। ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকার উর্বরতা, কর্মসংস্থানের সুবিধা প্রভৃতি কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। শিল্প-বাণিজ্যে দেশের অনগ্রসরতার কারণে নগরায়নের হার অতি নগণ্য। প্রায় সকল শহরই শাসনকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। শিল্প শহরের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

বাংলাদেশের পরিবহণের উপর দেশের ভূপ্রকৃতির যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থায় নদীপথ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ নদী উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত বলে রেলপথগুলো মোটামুটি উত্তর-দক্ষিণে সম্প্রসারিত। পূর্ব-পশ্চিমে রেলপথে ভ্রমণ সময়সাপেক্ষ, প্রাকৃতিক কারণে উন্নতমানের সড়ক নির্মাণ ব্যয়বহুল। নির্মিত সড়কগুলো অনেক ক্ষেত্রেই রেলপথ কিংবা নদীপথের সম্পূরক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। দ্রুত পরিবহণরূপে অভ্যন্তরীণ বিমানপথ অতি গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ একদিকে শিল্পে অনুন্নত, অপরদিকে তৈরি পণ্যের বিশাল বাজার এবং খাদ্য ঘাটতি এলাকা। ফলে বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী, শিল্পসংক্রান্ত কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, ভোগ্যপণ্য প্রভৃতি আমদানির জন্য বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমাগত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন। চট্টগ্রাম বন্দর আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু অন্যান্য দেশের সাথেই নয় দেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন বিষয়ে বৈষম্য বিরাজ করছে। এসব বৈষম্য দূর করে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।

৪.৯ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। যে কোনো দেশের নাগরিকদের জীবনযাত্রার ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ বস্ত্র ও বাসস্থানের মত স্বাস্থ্য অন্যতম প্রধান চাহিদা। স্বাস্থ্য বলতে শুধু ব্যাধি বা দৌর্বল্যের অনুপস্থিত বুঝায় না— স্বাস্থ্য হচ্ছে পরিপূর্ণ দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থবোধসম্পন্ন একটি ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থা। পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য একটি বিমূর্ত আদর্শ যা অর্জন করা পুরাপুরি সম্ভব না হলেও তার অব্যাহত প্রচেষ্টা ব্যক্তি বা জনজীবনের জন্য অপরিহার্য। তাই কোনো দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক দায়িত্ব হিসাবে স্বীকৃত।

স্বাস্থ্যনীতি এবং অবকাঠামো ঃ বাংলাদেশ সরকার নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যনীতি অনুসরণ করে।

(১) জীবনের মৌলিক চাহিদাসমূহ সরবরাহ করে।

(২) গ্রাম উন্নয়ন।

(৩) পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

(৪) মা এবং শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা।
(৫) জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং মৃত্যু ও অসুস্থতার হার কমানো (Ali 1995)।

স্বাস্থ্য-সুবিধা এবং জনশক্তি

(১)	হাসপাতাল : গ্রামভিত্তিক	ঃ	৪০০
	শহরভিত্তিক	ঃ	৪৯০
	মোট	ঃ	৮৯০
(২)	হাসপাতাল বেডের সংখ্যা	ঃ	৩৪৩৫৩
	রেজিস্টার্ড ডাক্তার	ঃ	২২৫০০
(৩)	জনসংখ্যা ও চিকিৎসক অনুপাতা	ঃ	৫০৫৪ : ১
(৪)	মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা	ঃ	সরকারি ঃ ১৩ টি
		ঃ	প্রাইভেট–০৪ টি
(৫)	সরকারি ওষুধালয়ের সংখ্যা	ঃ	১৩৬২ টি
(৬)	মাতা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র	ঃ	৯৬ টি
(৭)	কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা ক্লিনিক	ঃ	৪৪ টি
(৮)	হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ		ঃ ২২ টি
(৯)	স্বাস্থ্যে নিয়োজিত মোট জনসংখ্যা	ঃ	৭৪৪ জন
(১০)	মাথাপিছু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা		ঃ ৮১ টি
(১১)	খাতে সরকারি ব্যয় (বার্ষিক)	ঃ	৮৬ টি
(১২)	পরিবার প্রতি চিকিৎসকের স্বংখ্যা		৪৯২ (Statistical Pocket Book-1994)।

সারাদেশে বিস্তৃতভাবে স্বাস্থ্য কার্যক্রম চালু আছে এবং প্রত্যেক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় লোকসংখ্যা রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুটি ভাগে পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

(১) স্বাস্থ্য পরিদপ্তর।
(২) পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর।

বাংলাদেশের পাঁচটি বিভাগে স্বাস্থ্য কার্যক্রমের বিভাগীয় পরিচালক রয়েছেন। ৬৪টি জেলায় রয়েছে সিভিল সার্জন, যিনি জেলার স্বাস্থ্যবিষয়ক সকল কার্যক্রমের পরিচালক। ৪৬০ টি থানার মধ্যে ৩৯৭ টিতে রয়েছে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। প্রতিটি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গড়ে নিম্নলিখিত পর্যায়ের কর্মী নিয়োজিত :

(১)	থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	১ জন
(২)	মেডিক্যাল অফিসার	৮ জন
(৩)	স্বাস্থ্য সহকারী	৫৫ জন
(৪)	সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক	১১
(৫)	স্বাস্থ্য পরিদর্শক	৩–৪ জন
(৬)	চিকিৎসা সহকারী	২ জন
(৭)	ল্যাব–টেকনিশিয়ান	২ জন
(৮)	সহকারী পরিসংখ্যানিক	১ জন

বাকি ৬৩টি থানা যেখানে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেই সেখানেও একজন থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার এবং একজন মেডিক্যাল অফিসার আছেন।

প্রতিটি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩১টি বেড রয়েছে। প্রতিটি থানা ৫--১৪ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। মোট ইউনিয়নের সংখ্যা ৪৫৫১টি। এক–তৃতীয়াংশ ইউনিয়নে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র রয়েছে। অবশিষ্ট ইউনিয়নে আছে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র। এগুলো থানার নিয়ন্ত্রণে দেশের একেবারে প্রান্তিক এলাকায় কাজ করে।

সুতরাং দেখা যায় বাংলাদেশে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য অবকাঠামো রয়েছে এবং সাথে প্রয়োজনীয় কর্মচারী এবং সহকারী কর্মচারী রয়েছে প্রচুর। কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় পর্যাপ্ত নয় (Ali-1995)।

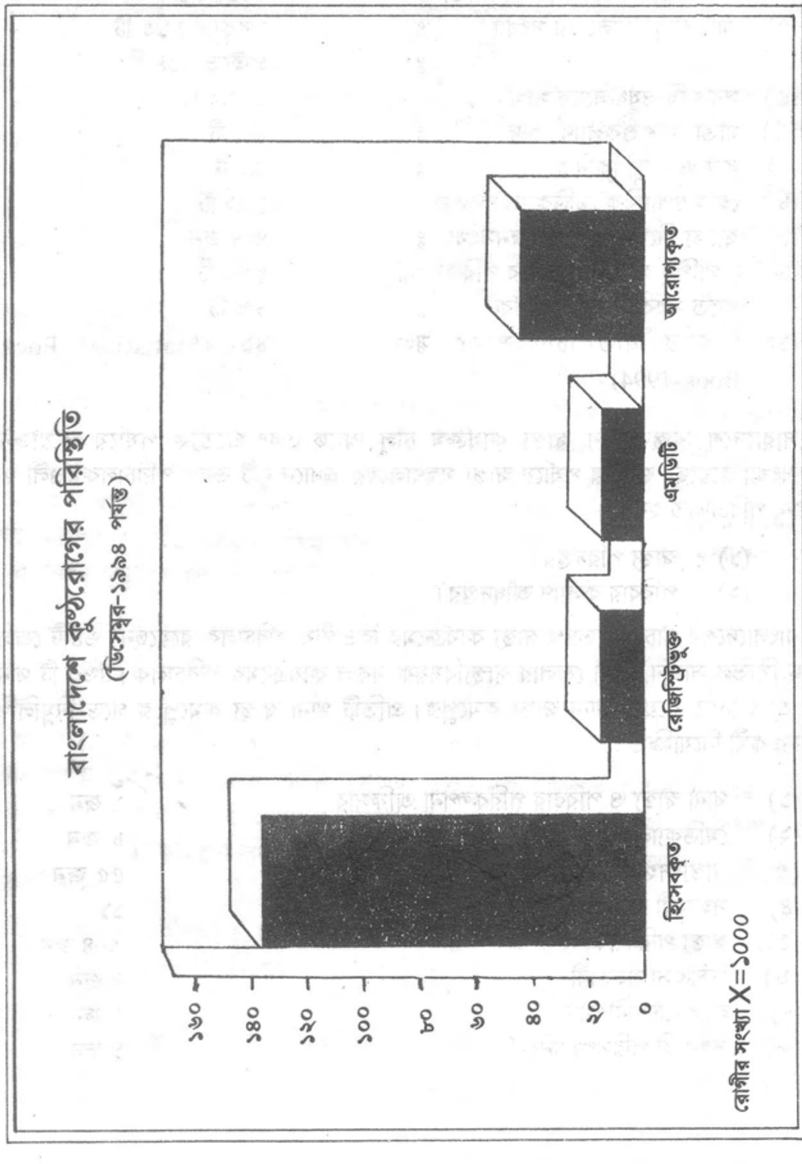

উৎস : কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, বাংলাদেশ।

৪.১০ বাংলাদেশে কুষ্ঠ রোগের প্রেক্ষাপট

যক্ষা, ক্যান্সারের ন্যায় কুষ্ঠ বাংলাদেশের আরেকটি অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা। কিন্তু ১৯৮১ সনের পূর্বে এ সমস্যার উপর তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নি। চিকিৎসা ব্যবস্থাও যেমন প্রয়োজনের তুলনায় একেবারে নগণ্য ছিল তেমনি এ সমস্যার উপর কোনো গবেষণাও হয় নি। ১৯৪৫ সালের "Leprosy in Bangla" নামক প্রবন্ধে সম্ভবত এ এলাকার কুষ্ঠরোগ বিষয়ে সবচেয়ে পুরাতন তথ্য পাওয়া যায়। প্রবন্ধের তথ্য অনুযায়ী তখন পশ্চিমবঙ্গে কুষ্ঠরোগ খুব বেশি ছিল। ব্যাপকতার হার প্রতি হাজারে ১০–৩০ জন। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে ব্যাপকতার হার প্রতি হাজারে ৫–৯ জন। দক্ষিণ–পূর্ব বাংলার বদ্বীপ জেলাগুলোতে ব্যাপকতার হার ছিল প্রতি হাজারে পাঁচ এর নিচে, যা বর্তমান বাংলাদেশকে বুঝানো হয়েছে। ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকতার হার ধরা হয়েছিল প্রতি হাজারে ১.৩ জন। এতে মোট রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০০০০। ১৯৯০ সালে বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ব্যাপকতার হার ধরা হয় প্রতি হাজারে ২.৫ জন। এ হিসেবে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭৫০০০। এ সংখ্যা প্রতিবেশী দেশসমূহের ব্যাপকতার হারের ভিত্তিতে ধরে নেয়া হয়। দেশের ভিতরে কোনো গবেষণা করা হয় নি। বর্তমানে চিহ্নিত ১৩৬০০০ সংখ্যাটি মূলত ১৯৬৫ সালের হিসাব থেকে এমডিটি (MDT) গ্রহণ শেষ এমন রোগীকে বাদ দিয়ে ধরে নেয়া হয়েছে (Richardus 1994)।

বাংলাদেশে কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরম্ভ হয় ১৯৬৫ সাল থেকে। তখন অল্প কয়েকটি থানায় ড্যাপসন নামক ওষুধের সাহায্যে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা করা হতো। ১৯৮৪ সালে ১২০টি থানায় কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়। দেশের প্রত্যেকটি স্থানে কুষ্ঠরোগ সমানভাবে বিন্যস্ত নয়। উপরিউক্ত ১২০টি থানার স্থানীয় রোগ হিসেবে কুষ্ঠরোগকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৮৫ সাল থেকে একক ওষুধের পরিবর্তে বহু ওষুধ (MDT) প্রয়োগ শুরু করা হয়। একই সময়ের কুষ্ঠ এবং যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের জন্য Mycobacterial Disease control (MBDC) প্রকল্পটি গঠিত হয়। এম বি ডি সি–এর (MBDC) পরিচালক দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪৩টি জেলায় যে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ ক্লিনিক রয়েছে সেগুলির সমর্থন লাভ করবে। তারপর দেশের ৪৬০টি থানার মধ্যে ১২০টি থানার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ পদ্ধতি খুব সীমিত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার কুষ্ঠ অপসারণের জন্য সারা দেশে গ্রামভিত্তিক কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত নেয় (ALi-1995)। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে বাংলাদেশের যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

৪.১১ বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা

বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পূর্বে তেমন জোরালো ছিল না। সরকারিভাবে মাত্র তিনটি হাসপাতাল রয়েছে। হাসপাতাল তিনটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপিত হয়েছে। যথা :

(১) মহাখালী কুষ্ঠ হাসপাতাল
(২) সিলেট কুষ্ঠ হাসপাতাল এবং
(৩) নীলফামারী কুষ্ঠ হাসপাতাল।

বর্তমানে সারাদেশে সরকারিভাবে সাধারণ স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সাথে কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ প্রকল্পকে একীভূত করার কাজ চলছে। দেশের সর্বত্র এ কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়েছে বলে আশা করা যায়। কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি থানাকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বহুদিন ধরে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় বেসরকারি সংস্থাসমূহ কাজ করছে। বর্তমান প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এসব বেসরকারি সংস্থাসমূহকে কার্যক্রমের আওতায় আনা। পরবর্তী পৃষ্ঠায় স্থানানুযায়ী বেসরকারি সংস্থাসমূহের নাম এবং চিকিৎসা সুবিধা দেখানো হলো।

সারণি ৪.৬ ঃ বাংলাদেশে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের তালিকা।

ক্রম	বেসরকারি সংস্থার নাম	অবস্থান	হাসপাতাল বেড	প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা	মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম
১	স্যালভেশন আর্মি (Salvation Army)	ঢাকা	—	—	হ্যাঁ
২	স্যালভেশন আর্মি (Salvation Army)	যশোহর	—	—	হ্যাঁ
৩	ডেমিয়েন ফাউন্ডেশন (Damien Foundation)	জলছত্র (টাঙ্গাইল)	৪০	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৪	ডেমিয়েন ফাউণ্ডেশন (Damien Foundation)	ধানঝুরি (দিনাজপুর)	৬০	—	হ্যাঁ
৫	স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন (HEED)	কমলগঞ্জ (মৌলভী বাজার)	৪০	হ্যাঁ	—
৬	প্রাইম সিস্টার্স (Prime Sisters)	খুলনা	১৫	—	—
৭	রংপুর–দিনাজপুর পল্লী প্রকল্প (RDRS)	লালমনিরহাট	—	—	হ্যাঁ
৮	ড্যানিশ–বাংলাদেশ ল্যাপ্রসি মিশন (DBLM)	নীলফামারী	১০০	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৯	ড্যানিশ–বাংলাদেশ ল্যাপ্রসি মিশন (DBLM)	ঠাকুরগাঁও	১০	—	—
১০	চন্দ্রঘোনা লেপ্রসি সেন্টার	চন্দ্রঘোনা	১০০	হ্যাঁ	হ্যাঁ

উৎস : Technical guide and operational manual for leprosy control in Bangladesh, 1993.

উল্লেখ্য বেসরকারি সংস্থাও দ্রুতগতিতে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে। ময়মনসিংহে ডেমিয়েন ফাউন্ডেশন (Damien Foundation) ইতোমধ্যে একটি হাসপাতাল চালু করেছে। এভাবে সারাদেশে সরকারি কার্যপদ্ধতি বেসরকারি সংস্থা কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে একই লক্ষ্যে একই কার্যক্রম অনুসরণ করে কাজ পরিচালনা করছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রণীত নির্দেশ অনুসারে জাতীয় কার্যক্রম চালু হয়। ২০০০ সন পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলবে।

৪.১২ বাংলাদেশে কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলন (WHA)–এ ২০০০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার সুপারিশ অনুযায়ী এ রোগের ব্যাপকতার হার প্রতি দশ হাজারে ১৩.৬ থেকে কমিয়ে ১–এ আনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সমর্থনে ১৯৯২ সালে

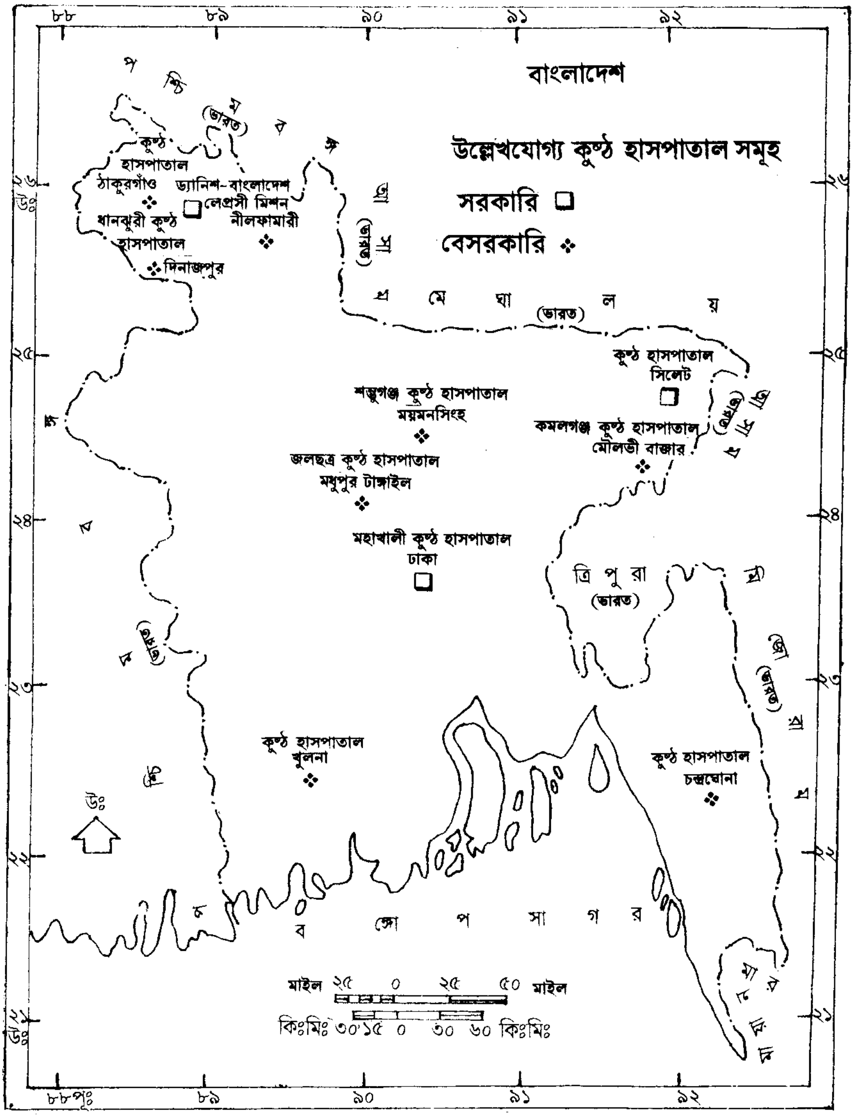

উৎস : Technical guide and operational manual for leprosy control in Bangladesh-1994

"Future Development of Tuberculosis and Leprosy Control Services in Bangladesh" প্রকল্প নতুন করে কার্যক্রম শুরু করে। এর প্রধান লক্ষ্য হলো ২০০০ সনের মধ্যে সারাদেশে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিস্তৃত করা। এ প্রকল্পে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন পরিকল্পনা তৈরি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং সকল কার্যক্রমের উপর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ভিন্ন। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হলো ২০০০ সালের মধ্যে সারা দেশকে এ প্রকল্পের আওতায় আনা। আর কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হলো ৯৬–৯৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ দেশকে এ প্রকল্পের আওতায় এনে ২০০০ সালের মধ্যে ব্যাপকতার হার কমিয়ে আনতে হবে। প্রকল্পের (জুলাই ১৯৯৩–জুন ১৯৯৪) পাঁচটি

বিভাগের পাঁচটি জেলার চল্লিশটি থানায় এ কার্যক্রম চালু করা হয়। একই সময়ে স্থানীয় রোগ হিসেবে চিহ্নিত ৩৭ টি জেলার ১২০ টি থানাকে বহু ওষুধ (MDT) প্রয়োগের আওতায় আনা হয়। এর মধ্যে ২৮টি থানায় বেসরকারি সংস্থাসমূহ কাজ করছে। প্রকল্প প্রণয়নের প্রথম বছর থেকেই বহু ওষুধ (MDT) প্রয়োগ কার্যক্রমের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

৪.১২.১ মূল লক্ষ্য ঃ ২০০০ সালের মধ্যে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার হার কমিয়ে দশ হাজারে এক–এ এনে স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে কুষ্ঠরোগের নিয়ন্ত্রণ করা।

৪.১২.২ উদ্দেশ্য ঃ বাংলাদেশে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে ক্রমান্বয়ে দেয়া হলো ঃ

(১) ১৯৯৬–৯৭ সালের মধ্যে দেশের রেজিস্ট্রিভুক্ত রোগীদের মধ্যে বহু ওষুধ (MDT) প্রয়োগ কার্যক্রম চালু করা।

(২) প্রকল্পের পাঁচ বছরে ৮৫% এলাকা এমডিটি (MDT) কার্যক্রমের আওতায় এনে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার হার কমিয়ে আনতে হবে।

(৩) কার্যকর তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ কৌশল (I.E.C.) প্রয়োগ করে কুষ্ঠরোগের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বেচ্ছায় রোগের সম্পর্কে জানাতে এবং সামগ্রিক কুসংস্কার দূর করতে উৎসাহিত করা।

(৪) কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে তথ্য সংগ্রহ, সতর্কতা এবং মূল্যায়নে সাধারণ ও কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা।

(৫) শীঘ্র রোগ নির্ণয় এবং নিয়মিত ওষুধ গ্রহণের মাধ্যমে বিকলাঙ্গতার হার শতকরা পাঁচ–এ নামিয়ে আনা।

(৬) নির্দিষ্ট সময়ে নতুন রোগীর সংখ্যা কমিয়ে এনে কুষ্ঠরোগের সংক্রমণের হার কমানো (Technical Guide and Operational Manual for Leprosy Control in Bangladesh, 1993)।

৪.১২.৩ বাংলাদেশে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে গৃহীত কৌশলসমূহ ঃ কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পকে কার্যকর এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ অবলম্বন করা হচ্ছে :

(১) থানার ন্যায় দেশের প্রান্তীয় ইউনিটগুলোতে চিহ্নিত কুষ্ঠরোগীকে নির্দিষ্ট সময় এমডিটি প্রয়োগ করা। এ কার্যক্রম প্রতিটি থানার প্রতিটি গ্রামে সম্প্রসারিত করা।

(২) কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পকে দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সাথে একীভূত করে কৌশলগত সমর্থন এবং নির্দেশনা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৩) কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কৌশল, কার্যক্রম, ও চিকিৎসায় সমরূপতা আনয়নের জন্য সরকারি–বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমর্থন, সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন করা।

(৪) কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে তথ্য সংগ্রহের জন্য সাধারণ, কার্যকর এবং গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি চালু করা।

(৫) কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কাজে সতর্কতা সৃষ্টি এবং জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য কার্যকর তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

(৬) সকল সাধারণ পেশাজীবী, চিকিৎসা, সেবা ও প্যারামেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহের উপযুক্ত ভূমিকা এবং কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কাজে তাদের সমর্থন আদায়ের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

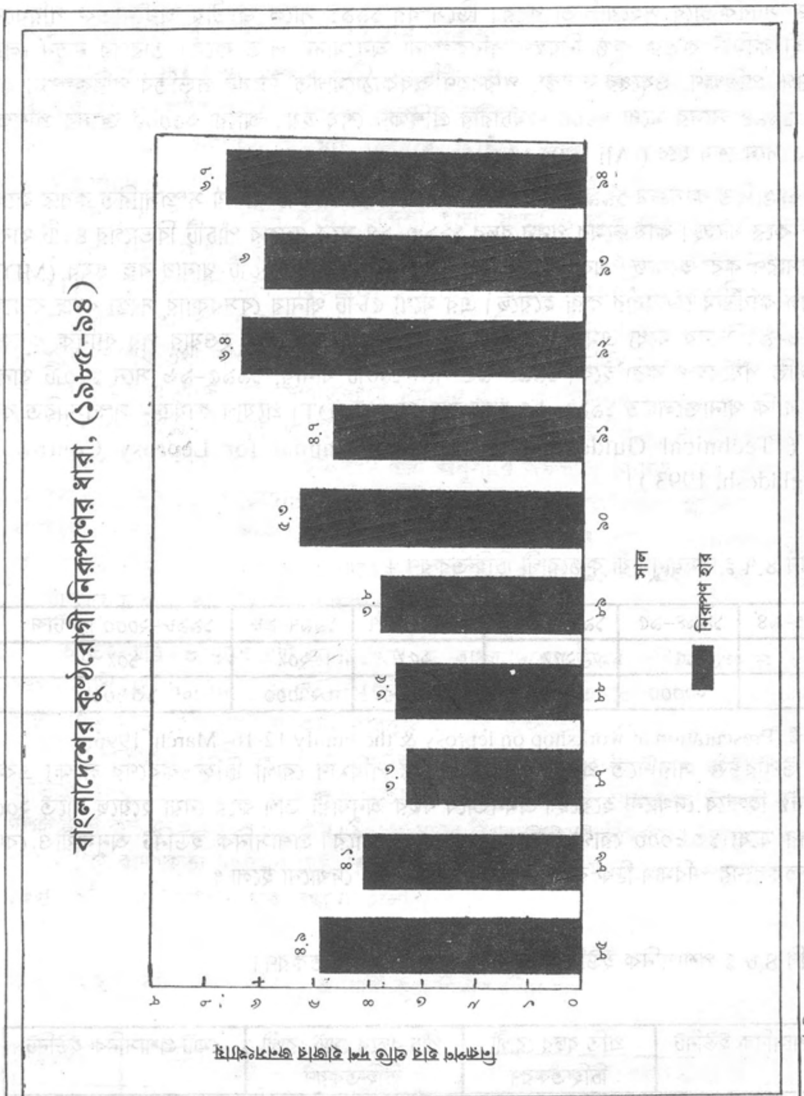

৪.১২.৪ বাংলাদেশে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়ে কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঃ বাংলাদেশের সাধারণ স্বাস্থ্য কার্যক্রমের পরিচালক সারাদেশে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, থানা পর্যায়ের কর্মীদের সহযোগিতায় কাজ করেন। সাধারণ স্বাস্থ্য কার্যক্রম গ্রাম থেকে বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ

[illegible] প্রভাবে সহযোগিতা করে। ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের [illegible] কমিটি কর্তৃক কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অনুমোদন লাভ করে। তারপর নতুন লোক [illegible], ওষুধের ব্যবস্থা, পরিবহন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রভৃতির পরিকল্পনা করা [illegible] সনের মধ্যে ৪০০০ কর্মচারীর প্রশিক্ষণ শেষ হয়। আরো ২০০০০ জনের প্রশিক্ষণ [illegible] হবে (Ali 1995)।

প্রকল্পে [illegible] কার্যক্রম ১৯৯৬–৯৭ সনের মধ্যে দেশের ৪৯৭ টি থানায় সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে [illegible] কার্যক্রমের প্রথম বছর ১৯৯৩–৯৪ সনে দেশের পাঁচটি বিভাগের ৪০টি থানায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং স্থানীয় রোগ হিসেবে চিহ্নিত ১২০টি থানায় বহু ওষুধ (MDT) [illegible] করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮০টি থানায় বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে। [illegible] সনের মধ্যে এমডিটি (MDT) প্রয়োগ কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর বার্ষিক কাজের [illegible] পর্যবেক্ষণ করা হবে। ১৯৯৪–৯৫ সনে ১০০টি থানায়, ১৯৯৫–৯৬ সনে ১৫০টি থানায় [illegible] বাকি থানাগুলোতে ১৯৯৬–৯৭ সনে বহু ওষুধ (MDT) প্রয়োগ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা [illegible] (Technical Guide and Operational Manual for Leprosy Control in Bangladesh, 1993)

সারণি ৪.৭ : সময়ানুযায়ী কুষ্ঠরোগী চিহ্নিতকরণ ।

১৯৯৩–৯৪	১৯৯৪–৯৫	১৯৯৫–৯৬	১৯৯৬–৯৭	১৯৯৭–৯৮	১৯৯৮–২০০০ খ্রিস্টাব্দ
[illegible]	১৫%	২৫%	২৫%	২০%	১৫%
[illegible]	২০০০০	৩৪০০০	৩৪০০০	২৭০০০	১৩৬০০

[illegible] (Presentation at workshop on leprosy & the family 12-16- March, 1996.

উপরিউক্ত সারণিতে প্রত্যেক বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ রোগী চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে একটি [illegible] হয়েছে। এমনভাবে বছর অনুযায়ী ভাগ করে নেয়া হয়েছে যাতে ২০০০ [illegible] রোগী চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রশাসনিক ইউনিট অনুযায়ীও রোগী [illegible] পরিমাণ ঠিক করে নেয়া হয়। নিম্নে এটি দেখানো হলো :

সারণি ৪.৮ : প্রশাসনিক ইউনিট অনুসারে কুষ্ঠরোগী চিহ্নিতকরণ।

প্রশাসনিক ইউনিট	প্রতি বছরে রোগী চিহ্নিতকরণ	পাঁচ বছরে মোট রোগী চিহ্নিতকরণ	মোট প্রশাসনিক ইউনিট
প্রতি জেলা	৪২৫	২১২৫	৬৪
প্রতি থানা	৫৯	২৯৫	৪৬০
প্রতি ইউনিয়ন	৬	৩০	৪৫৫০
প্রতি ওয়ার্ড	১	১০	১৩৬০০

[illegible] Presentation at workshop on leprosy & the family 12-16 March, 1996) ।

উপর্যুক্ত রোগী চিহ্নিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত লোক নিয়োগ এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা [illegible] কিন্তু [illegible] সাথে বাস্তব পরিস্থিতির অনেক পার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। [illegible] কুষ্ঠরোগ প্রতিটি স্থানে সমভাবে বর্তিত নয়।

৪.১৩ বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের বর্তমান পরিস্থিতি

১৯৯৪ সালের বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বর্ণনা অনুযায়ী বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১৩৬০০০। এ হিসাবে কুষ্ঠ সমস্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে কুষ্ঠ সমস্যাকে গুরুতর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশ সরকার "Future Development of Tuberculosis and Leprosy Control Services in Bangladesh" নামক জাতীয় প্রকল্প গঠন করে। উদ্দেশ্য হলো যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করা, কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে সতর্ক করে তোলা এবং ১৯৯৫ সালের মধ্যে বহু ওষুধ (DMT) প্রয়োগ কার্যক্রমকে সহজলভ্য করে দেয়া। যদিও সরকারি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অংশে বহু বছর যাবৎ কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে তথাপি এ সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। কুষ্ঠরোগীর স্থানানুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যা নিরূপণ করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এ কাজ বাস্তবসম্মতভাবে সমাপন করা কোনোদিনই সম্ভব হবে না। এর পিছনে তিনটি কারণ প্রধান। প্রথমত, কুষ্ঠরোগ চিহ্নিতকরণে সমস্যা ; দ্বিতীয়ত, সামাজিক ভয়ে রোগীরা সহায়তা করবে না। তৃতীয়ত, কুষ্ঠরোগ স্থান অনুসারে সমভাবে বিন্যস্ত নয়। তারপরও একটি আনুমানিক সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে জরিপ প্রক্রিয়া, কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের তথ্য এবং স্থানীয় ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জ্ঞানের আলোকে বাংলাদেশের মোট কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা নির্ণয় করা যেতে পারে। তবে কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের প্রকৃত তথ্য পাওয়ার জন্য আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটি জানা গেছে যে, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বেশি (Richardus and Croft 1993)। ১৯৯৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট কুষ্ঠরোগীর মাত্র ২৫% রোগী সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। নতুন রোগীদের ৬৫% রাজশাহী বিভাগের উত্তরাংশের। বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যাবলী অত্যন্ত নিখুঁত বলে তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মতে রাজশাহী বিভাগের উত্তরাংশ অপেক্ষা দক্ষিণাংশে কুষ্ঠ ব্যাপকতার হার কম। ১৯৯০ সালে বিশ্বব্যাংকের পরিদর্শনের ভিত্তিতে বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় মানচিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের জেলা ভিত্তিক ব্যাপকতার হার দেখানো হলো ।

সারণি ৪.৯ ঃ বাংলাদেশে বিভাগ অনুযায়ী কুষ্ঠরোগীর বণ্টন চিত্র।

বিভাগ	রেজিস্ট্রিভুক্ত রোগী (১৯৯৪)			নতুনভাবে নিরূপণকৃত রোগী (১৯৯৪)		
	এম বি	পি বি	মোট	এম বি	পি বি	মোট
রাজশাহী	৫১৪৭	৩১৩২	৮২৭৯	১৫৯৭	৩১৯২	৪৭৮৯
ঢাকা	২৬৬২	১৩৭০	৪০৩২	৮৫৮	১০৭২	১৯৩০
খুলনা	২৭৭	৩৮৩	৬৬০	১৩২	৩৬৫	৪৯৭
বরিশাল	১১	২	১৩	১০	৭	১৭
চট্টগ্রাম	১৬৩৭	৪৮৯	২১২৬	৪৬৫	২৮৫	৭৫০
মোট	৯৭৩৪	৫৩৭৬	১৫১১০	৩০৬২	৪৯২১	৭৯৮৩

উৎস : অপ্রকাশিত তথ্য, বাংলাদেশ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, ১৯৯৪।

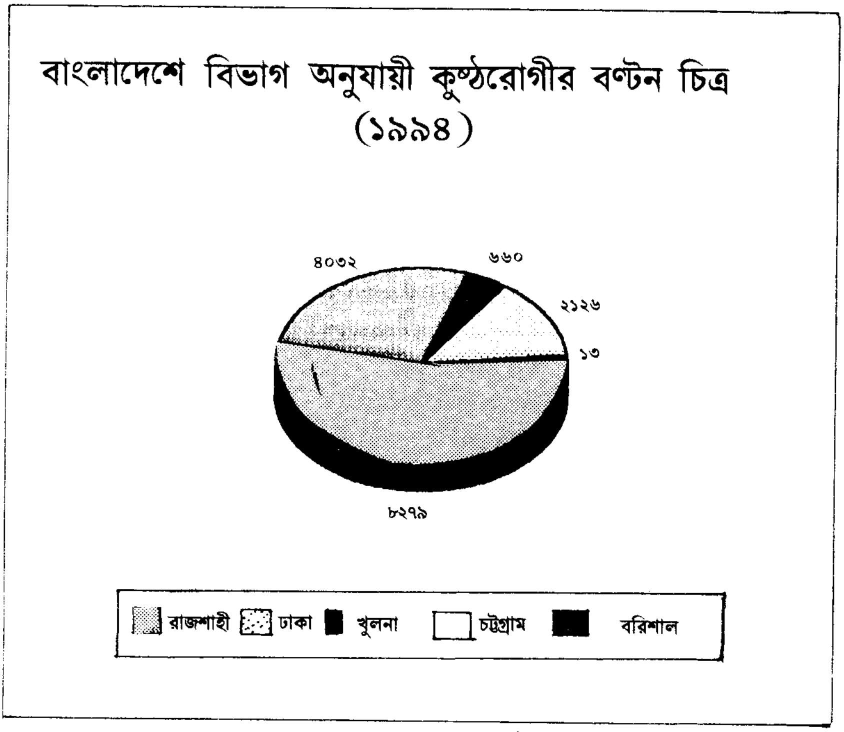

উৎস : অপ্রকাশিত তথ্য, বাংলাদেশ যক্ষ্মাও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প।

সারণি ৪.১০ : বাংলাদেশে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের পরিসংখ্যানিক তথ্য (১৯৮৫–৯৬)।

বছর	রেজিস্ট্রিকৃত মোট রোগী	আরোগ্য লাভকৃত রোগী	নতুন রোগীর সংখ্যা	এমডিটি প্রয়োগকৃত রোগীর সংখ্যা
১৯৮৫	৫৫২৩০	৮৭৭	৪৮৩৪	৫২১৫১
১৯৮৬	৬০৩৪৮	১২৮৪৪	৫১১৮	৪৩২১৬
১৯৮৭	৬৩৬৯৭	১১২২৪	৩৩৪৯	৪৬৫৬৫
১৯৮৮	৬৭৩৬৩	৩১৯৭২	৩৬৭৬	২৮১০৩
১৯৮৯	৭১৪৩০	৪০৯৯৪	৪০৫৭	২২১৬৮
১৯৯০	৭৭১৭৮	৪২৯৯৫	৫৭৪৮	২৫০৩৩
১৯৯১	৪২৪০৭	৪৮৪৪৩	৫২২৯	২৩৯৬৪
১৯৯২	৪৯৭১৪	৫৮৯৬১	৭৩০৩	১৯৯৩২

উৎস : অপ্রকাশিত তথ্য (কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, বাংলাদেশ)।

৪.১০ সারণি অনুযায়ী আরোগ্য লাভকৃত রোগীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে। ফলে রেজিস্ট্রিকৃত রোগীর সংখ্যা কমে গেছে। নতুন রোগীর সংখ্যা এবং এমডিটি প্রয়োগকৃত রোগীর পরিমাণও বাড়ছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৩টি জেলার ১৯৫টি থানায় এবং ৭টি শহরে বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে।

সারণি ৪.১১ : স্থানানুযায়ী বেসরকারি সংস্থার **(NGO)** তালিকা।

বিভাগ	জেলা	থানার সংখ্যা	এনজিও (NGO)-র নাম
রাজশাহী মোট জেলা ১৬টি। ১২টিতে বেসরকারি সংস্থা কাজ করে। মোট থানা সংখ্যা ১২৩৮৮টি, ৮৮টি এনজিও পরিচালিত।	১. লালমনিরহাট	৫	আরডি আর এস (RDRS)
	২. কুড়িগ্রাম	৯	
	৩. দিনাজপুর	১৩	টিএলএম (TLM)
	৪. নওগাঁ	১১	,,
	৫. জয়পুরহাট	৫	,,
	৬. নওয়াবগঞ্জ	৫	ডিবি এলএম (DBLM)
	৭. নীলফামারী	৬	
	৮. ঠাকুরগাঁও	৫	,,
	৯. পঞ্চগড়	৫	,,
	১০. রংপুর	৮	
	১১. গাইবান্ধা	৭	
	১২. সিরাজগঞ্জ	৯	পরিবর্তন
চট্টগ্রাম ১৫টি জেলার ৫টিতে এনজিও কাজ করে। ১২২টি থানার ৪৯টিতে এনজিও কাজ করে।	১৩. সুনামগঞ্জ	১০	এইচই ইডি (HEED)
	১৪. সিলেট	১১	
	১৫. মৌলভীবাজার	৯	,,
	১৬. হবিগঞ্জ	৮	,,
	১৭. চট্টগ্রাম	১৪	,, সিএল সিপি (CLCP)
ঢাকা ১৭টি জেলার ৬টিতে এনজিও কাজ করে ১৯৯টি থানার ৫৮টিতে এনজিও কাজ করে	১৮. টাঙ্গাইল	১১	টিএলসিপি (TLCP)
	১৯. জামালপুর	৭	
	২০. শেরপুর	৫	,,
	২১. কিশোরগঞ্জ	১৩	,,
	২২. ময়মনসিংহ	১১	ডেমিসেন ফাউন্ডেশন
	২৩. নেত্রকোনা	১১	,,

উৎস : অপ্রকাশিত তথ্য (কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, বাংলাদেশ)।

বাংলাদেশে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের পরিসংখ্যানিক তথ্য)
(১৯৮৫-৯২)

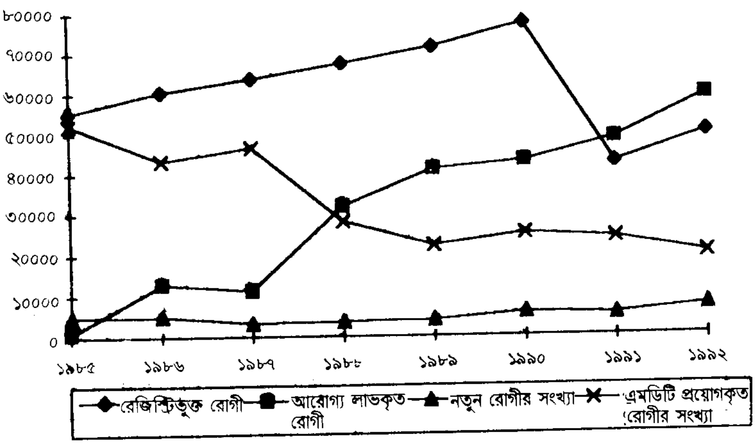

উৎস : অপ্রকাশিত তথ্য, বাংলাদেশ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প,

[illegible].১৪ শহর এলাকার কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

শহর এলাকায় কুষ্ঠরোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। সম্প্রতি এ সমস্যার কারণ এবং সমাধান নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান চিন্তাভাবনা করছে। উন্নত অনুন্নত উভয় দেশেই শহরে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা গ্রামের তুলনায় বেশি রয়েছে। এর পিছনে অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। নিম্নে কারণগুলো আলোচনা করা হলো :

প্রথমত, শহরের বেশিরভাগ মানুষ ঘনবসতিপূর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে। যার ফলে রোগের উৎপত্তির যেমন একটা অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যায় তেমনি ঘনবসতির ফলে রোগ ছড়ানোর সুযোগও বেশি।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক কারণে গ্রামের কুষ্ঠরোগীরা শহরে চলে আসে। শহরে কেউ কাউকে চিনে না। অপরদিকে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নিলে আয়েরও একটা ভাল পথ খুঁজে

পায়। এরা বেশিরভাগই অশিক্ষিত এবং অর্থনৈতিকভাবে নিম্ন শ্রেণির। বস্তির ন্যায় ঘিঞ্জি এলাকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এদের বসবাস। শহর এলাকায় রোগ ছড়ানোর প্রধান উৎস।

তৃতীয়ত, কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো শহর এলাকাকে ভিত্তি করে শহরের কেন্দ্রে বা তার আশেপাশে গড়ে উঠেছে। এ হাসপাতালগুলো পরোক্ষভাবে শহরে কুষ্ঠরোগ বিস্তারে সহযোগিতা করে।

উপরিউক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের জন্য শহর এলাকায় দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। গ্রামের চেয়ে শহরেই কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বেশি জোরদার হওয়া উচিত। অবশ্য উন্নয়নশীল দেশে যেখানে নগরায়ণের হার কম আর উন্নত দেশে নগরায়ণের হার বেশি এসব দিকও বিবেচনায় আনতে হবে। বাংলাদেশে ৪.১২ সারণিতে উল্লেখিত শহরগুলোতে বেসরকারি সংস্থাসমূহ কাজ করছে।

সারণি ৪.১২ : বাংলাদেশে শহর এলাকায় বেসরকারি সংস্থার তালিকা।

বিভাগ	জেলা	শহর	এনজিও (NGO) –র নাম
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী	স্ব–উন্নয়ন
খুলনা	খুলনা	খুলনা	প্রাইম সিস্টার্স (Prim Sisters)
ঢাকা	ঢাকা	মিরপুর	স্যালভেশন আর্মি
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	কক্সবাজার	সিএলসিপি (CLCP)
	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	”
	বান্দরবান	বান্দরবান	”
	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	”’

উৎস : অপ্রকাশিত তথ্য, যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের শহর এলাকায় সরকারি ব্যবস্থায়ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমস্ত সরকারি–বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ একই প্রকল্পের আওতায় একই পদ্ধতি একই লক্ষ্যে বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

৪.১৫ সারাংশ

বাস্তবসম্মতভাবে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রয়োগ হলে দুই হাজার সালের মধ্যে কুষ্ঠরোগের হার কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অধিক আক্রান্ত দেশসমূহে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পুনঃমূল্যায়ন এবং তীব্রতর করা লাগতে পারে। পরবর্তী কয়েক বছরে ব্যাপকতার হার কমিয়ে আনা গেলেও অসুস্থতার হার কমিয়ে আনতে আরো কিছু সময় বেশি লাগবে। কেননা কুষ্ঠরোগ সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে কয়েক বছর। এছাড়া রোগ নিয়ন্ত্রণে একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু তা বাস্তবে কতটা সফলতা বয়ে আনতে পারবে তাও বিবেচনার বিষয়। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অবিরত তা বাস্তবে কতটা সফলতা বয়ে আনতে পারবে তাও বিবেচনার বিষয়। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অবিরত যৌথ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যে দেশ যতবেশি এ কার্যক্রমকে কাজে লাগাতে পারবে সে দেশ ততবেশি লাভবান হবে। কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণের এ পরিকল্পনা আক্রান্ত দেশসমূহের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ। আর নিঃসন্দেহে এটি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটি মানব কল্যাণমুখী উদ্যোগ।

পঞ্চম অধ্যায়

কুষ্ঠরোগ : পারিবেশিক প্রভাব

৫.১ ভূমিকা

কুষ্ঠরোগের সাথে পরিবেশ, আর্থ–সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, সংস্কৃতি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত। বর্তমানে এ রোগের কার্যকর ওষুধ আবিষ্কারের ফলে পূর্বের কুসংস্কারপূর্ণ পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়া উচিত। তাই জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য রোগ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়া প্রয়োজন। শিক্ষিত সমাজ এখনো অন্যান্য রোগের মত কুষ্ঠরোগকে সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না। অশিক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলের উপর যদি আবার কুষ্ঠ হয় তবে তার জীবনে নামে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা। সমাজ থেকে তাকে বহির্ভূত করা হয়, চাকরিচ্যুত করা হয়, এমনকি স্কুল থেকে পর্যন্ত ছাঁটাই করে দেয়া হয়। যার ফলে কুষ্ঠরোগীরা মানসিকভাবেও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। তাই এ রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসাগত, সামাজিক প্রভৃতি দিক থেকে ব্যাপক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমাদের দেশে এ ধরনের গবেষণা নেই বললেই চলে। সামান্য যা কিছু গবেষণা আছে তাও চিকিৎসাবিষয়ক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সামগ্রিকভাবে গবেষণা হয় না বলে দেশে এ ধরনের গবেষণার মূল্যায়নও করা হয় না, অথচ উপযুক্ত গবেষণার অভাবে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পরিচালিত কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কতটা বাস্তব সফল হবে তা সন্দেহজনক। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এ যুগান্তকারী পদক্ষেপ আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে জড়িত কয়েকজন ছাড়া তেমন কেউই অবগত নয়। বাংলাদেশের মত একটি দেশ যেখানে শিক্ষিতের হার মাত্র ৩২.৪%, বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে, যাদের জীবনের মৌলিক চাহিদা মিটাতে নাভিশ্বাস উঠে তাঁদের আবার সামাজিক সমস্যা ভাবার মত মানসিক স্বস্তি কোথায়। তারপরেও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পদক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়িত হলে অনেক কাজ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তার জন্য যে শ্রম, অর্থ ব্যয় হবে সাধারণ মানুষ সচেতন হলে এবং সহায়তা করলে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে পর্যাপ্ত কাজ সম্ভব হতো। আলোচ্য ক্ষুদ্র গবেষণায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের মোট ১৫০ জন রোগীর উপর প্রশ্নপত্র জরিপ চালানো হয়। জরিপের মাধ্যমে রোগীদের রোগ সম্পর্কে ধারণা কি, তাঁদের পারিবেশিক এবং আর্থ–সামাজিক প্রকৃত তথ্য বের করে আনার চেষ্টা করা হয়, সব জরিপ কার্যটি কুষ্ঠ হাসপাতালের ভিত্তিতে করা হয়েছে। কেননা সাধারণভাবে কুষ্ঠরোগীরা রোগ লুকিয়ে রাখে বলে ভিক্ষুক শ্রেণি ব্যতীত রোগী হাসপাতালের বাইরে পাওয়া অসম্ভব। দেশের ৫টি হাসপাতালের বহির্বিভাগে এবং ভর্তিকৃত রোগীদের উপর জরিপ কাজ চালানো হয়। নমুনা জরিপের ভিত্তিতে গবেষণার লক্ষ্য অনুযায়ী এ অধ্যায়ে কুষ্ঠরোগীদের সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হবে।

৫.২ কুষ্ঠরোগীর ব্যক্তিগত তথ্য

আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য হলো সমাজে কারা, কোন শ্রেণির লোক, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এবং কোন পরিবেশ কুষ্ঠরোগকে প্রভাবিত করে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁজে বের করা। সেজন্য

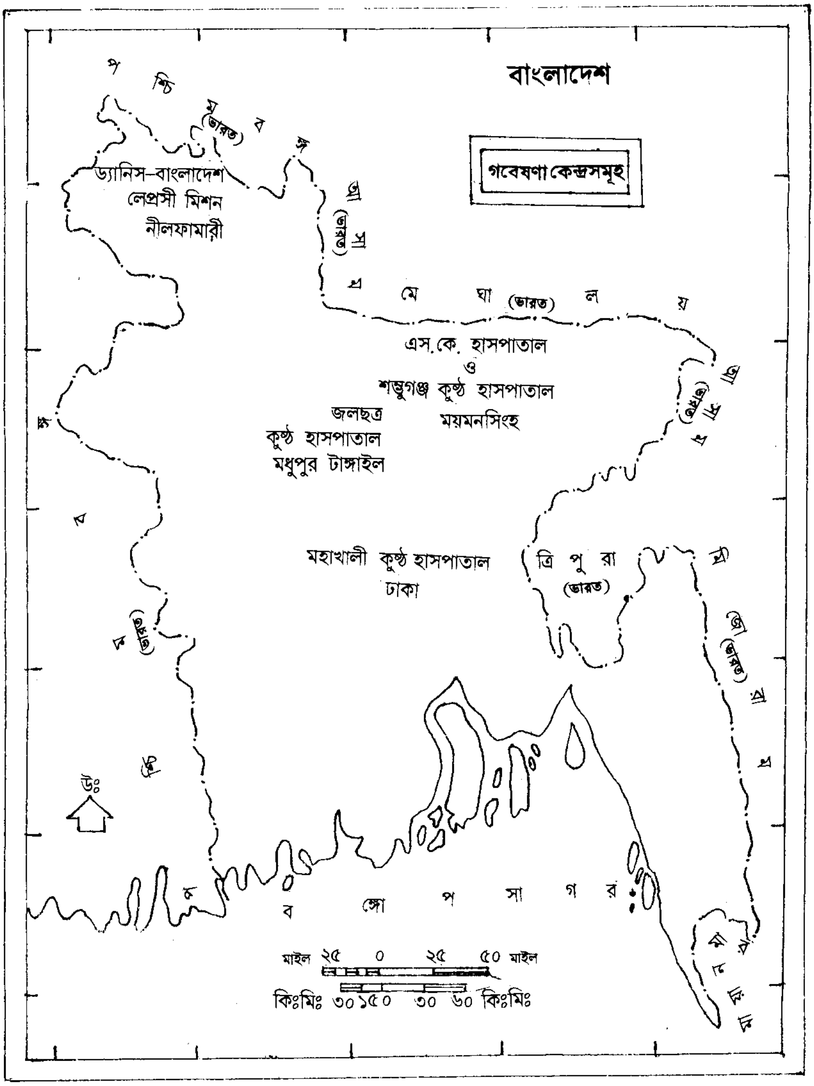

উৎস : প্রশ্ন পত্র জরিপ, ১৯৯৪-১৯৯৫ ।

প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে রোগীদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবেশিক এবং রোগ সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হয়। সব তথ্য স্পষ্ঠভাবে নেয়ার জন্য রোগীদের সাথে প্রথম ব্যক্তিগত পরিচয়ের মাধ্যমে একটি সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। নিম্নে ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হলো।

৫.২.১ কুষ্ঠরোগীর বয়স : নমুনা কুষ্ঠরোগীদের বয়সের মাধ্যমে কোন বয়সে এ রোগের ব্যাপকতার হার বেশি তা নির্ণয় করা যায়। কেন বেশি হতে পারে তাও অনুমান করা যেতে পারে।

সারণি ৫.১ : নমুনা কুষ্ঠরোগীদের বয়সভিত্তিক বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা (%)
০ – ৯ বছর	৩	২.৫ %
১০ – ১৯ বছর	২১	১৪.০ %
২০ – ২৯ বছর	৩৩	২২.০ %
৩০ – ৩৯ বছর	২৯	১৯.৩ %
৪০ – ৪৯ বছর	৩৮	২৫.৩ %
৫০ – ৫৯ বছর	১৩	৮.৭ %
৬০ – ৬৯ বছর	৯	৬.০ %
৭০ – ৭৯ বছর	৩	২.০ %
৮০ +	১	০.৭ %
মোট	১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.১ সারণিতে দেখা যায় ১০–৫৯ বছর বয়সের কুষ্ঠরোগী রয়েছে ৮৯%। ১০ বছর বয়সের নিচে আছে মাত্র ২% আর ৬০ বছর বয়সের উপরে আছে ৯% রোগী। মানুষের যখন কাজ করার মত বয়স হয় এবং বিভিন্ন পরিবেশে মেলামেশা করে তখনই তাদের এ রোগ দেখা যায়। অর্থাৎ কর্মক্ষম বয়সে কুষ্ঠরোগ বেশি হয়।

৫.২.২ লিঙ্গ অনুযায়ী কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ঃ লিঙ্গভেদে কুষ্ঠরোগের প্রভাব কেমন তা দেখার জন্য এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যদি কোনো পার্থক্য থাকে তবে তার কারণ উদ্‌ঘাটন করে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

সারণি ৫.২ ঃ নুমনা রোগীর লিঙ্গভিত্তিক বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা (%)
পুংলিঙ্গ	৯৮	৬৫.৩ %
স্ত্রীলিঙ্গ	৫২	৩৬.৭ %
মোট	১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.২ সারণিতে লিঙ্গভিত্তিক বণ্টন চিত্র দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, জরিপকৃত নমুনা কুষ্ঠরোগীদের ৬৫.৩% পুরুষ এবং ৩৬.৭% মহিলা। সব শ্রেণির কুষ্ঠ হার নারীর চেয়ে পুরুষের বেশি এবং নারী পুরুষের অনুপাত ১ : ২ (Yawalker-1989)। উল্লেখ্য, নমুনা জরিপে অনুপাত প্রায় কাছাকাছি এসেছে। গবেষণা জরিপে দেখা গেছে যে ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘ দিনের শারীরিক মেলামেশা, কায়িক শ্রমে নিযুক্তি এবং বেশি সময় ধরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, যেখানে উক্ত রোগের জীবাণু বাহক অবস্থান করতে পারে, সেসব স্থানে অবস্থানের ফলে মহিলাদের চেয়ে স্বাভাবিকভাবে পুরুষগণ বেশি হারে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত বা সংক্রামিত হয়ে থাকেন।

৫.২.৩ কুষ্ঠরোগীর ধর্ম ঃ ধর্ম দৈনন্দিন জীবনের উপর একটি স্থায়ী প্রভাব ফেলে। ধর্মীয় আচার আচরণ এ রোগের উপর কোনো প্রভাব ফেলে কিনা তা নির্ণয় করা যায় ধর্ম ভিত্তিক তথ্য থেকে।

সারণি ৫.৩ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীদের ধর্মভিত্তিক বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা (%)
মুসলমান	১২৯	৮৬.০ %
হিন্দু	১৯	১২.৭ %
খ্রিস্টান	১	০.৭ %
বৌদ্ধ	১	০.৭ %
মোট	১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.৩ সারণি অনুযায়ী নমুনা কুষ্ঠরোগীর ৮৬% মুসলমান, ১২.৭% হিন্দু, ০.৭% খ্রিস্টান এবং ০.৭% বৌদ্ধ। আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের দেশের জাতীয় ধর্মভিত্তিক বণ্টনের সাথে এটি প্রায় মিলে গেছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮৬% মুসলমান, ১২.১% হিন্দু, ০.৬% বৌদ্ধ এবং ০.৩% খিস্টান। সুতরাং কুষ্ঠরোগের প্রসারে ধর্মের কোনো সুস্পষ্ট প্রভাব নেই বললেই চলে।

৫.২.৪ কুষ্ঠরোগীদের শিক্ষা ঃ স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষিত ব্যক্তিরা সার্বিকভাবে সচেতন হয়ে থাকে। তাই শুধু কুষ্ঠ নয়, যে কোনো রোগই শিক্ষিত মানুষের কম হয়। তারপরও যেহেতু জীবাণু শিক্ষিত অশিক্ষিত বিবেচনা করে আক্রমণ করে না তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে অশিক্ষিতদেরই কুষ্ঠ রোগ হয়। তবে তাদের বেশি হয় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কুষ্ঠরোগের বেলায় কি পরিস্থিতি তা নির্ণয়ের জন্য প্রশ্নপত্র জরিপ চালানো হয়।

সারণি ৫.৪ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীদের শিক্ষাভিত্তিক বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা (%)
নিরক্ষর	৭৬	৫০.৭ %
নামসই	১৩	৮.৭ %
প্রাথমিক	৩৩	২২.০ %
মাধ্যমিক	১৬	১০.৭ %
উচ্চ মাধ্যমিক	৮	৫.৩ %
স্নাতক	৪	২.৭ %
মোট	১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

উপর্যুক্ত সারণি অনুযায়ী ৫০.৭% কুষ্ঠরোগী নিরক্ষর। ৮.৭% কুষ্ঠরোগী সামান্য নামসই করতে পারে। এ দুটি মিলিয়ে প্রায় ৬০% রোগী অশিক্ষিত। বাকি ৪০% রোগী শিক্ষিত। যদিও জাতীয় শিক্ষার হারের চেয়ে কুষ্ঠরোগীদের শিক্ষার হার বেশি (জাতীয় শিক্ষার হার ৩২.৪%)। রোগীদের

শিক্ষার হার আরো বেশি হতে পারে। কেননা শিক্ষিত রোগীরাই রোগ লুকিয়ে রাখে বেশি। সামাজিক বয়কটের ভয় তাদের বেশি, মানসিকভাবেও শিক্ষিত কুষ্ঠরোগীরা বেশি হতাশাগ্রস্ত। তবে অশিক্ষিতদের মাঝে এ রোগ বেশি। ৭২.২% শিক্ষিত কুষ্ঠরোগী পাওয়া যায় ১৯৯০ সালের গবেষণায় (Kundu 1990)। আলোচ্য গবেষণায় শিক্ষিত এবং স্বচ্ছল রোগীদের উপর একটু বেশি খেয়াল রাখা হয়েছে বলে অন্যান্য গবেষণার তুলনায় শিক্ষার হার কিছুটা বেশি এসেছে।

৫.২.৫ কুষ্ঠরোগীদের স্থায়ী ঠিকানা ঃ প্রশ্নপত্র জরিপের জন্য বাংলাদেশের যেসব এলাকায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বেশি সেসব এলাকার মধ্য থেকে তিনটি অঞ্চলে কাজ করা হয়। সাধারণত কুষ্ঠ হাসপাতালের আশেপাশের এলাকায়ই রোগীর সংখ্যা বেশি দেখা যায়। এখন রোগের ব্যাপকতা অনুযায়ী হাসপাতাল গড়ে উঠেছে, হাসপাতাল না হওয়াতে রোগের প্রকাশ বেশি ঘটেছে, এ প্রশ্ন জাগ্রত হওয়ায় বাংলাদেশের কোথায় যে রোগীর সংখ্যা বেশি আর কোথায় কম তা অনুমান করা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম সারাদেশে সম্পূর্ণভাবে চালু হওয়ার পর এ সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করা যায়। নমুনা জরিপের ভিত্তিতে নিম্নে জেলা ভিত্তিক সংখ্যা দেখানো হলো।

সারণি ৫.৫ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীদের জেলাভিত্তিক বন্টন চিত্র।

জেলার নাম	সংখ্যা	শতকরা (%)
ঢাকা	২০	১৩.৩ %
ময়মনসিংহ	২৫	১৬.৭ %
নীলফামারী	২১	১৪.০ %
রংপুর	১৫	১০.০ %
নেত্রকোনা	৮	৫.৩ %
টাঙ্গাইল	৭	৪.৭ %
কুমিল্লা	৬	৪.০ %
শেরপুর	৪	২.৭ %
পঞ্চগড়	৪	২.৭ %
জামালপুর	৩	২.০ %
কিশোরগঞ্জ	৩	২.০ %
লালমনিরহাট	৩	২.০ %
গাইবান্ধা	৩	২.০ %
মাদারীপুর	৩	২.০ %
ফরিদপুর	৩	২.০ %
নোয়াখালী	৩	২.০ %
বরিশাল	৩	২.০ %
সিরাজগঞ্জ	২	১.৩ %
ঠাকুরগাঁও	২.	১.৩ %
শরিয়তপুর	২	১.৩ %

বি. বাড়িয়া	২	১.৩ %
গাজীপুর	২	১.৩ %
মুন্সীগঞ্জ	২	১.৩ %
রাজশাহী	১	০.৭ %
বগুড়া	১	০.৭ %
দিনাজপুর	১	০.৭ %
চট্টগ্রাম	১	০.৭ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.৫ সারণিতে রোগীদের জেলাভিত্তিক বণ্টন দেখানো হয়েছে। দেশের তিনটি অঞ্চলের পাঁচটি হাসপাতালে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। পাঁচটি হাসপাতালের মধ্যে ময়মনসিংহ এস. কে. হাসপাতাল কুষ্ঠ হাসপাতাল নয়, সেখানে রোগী দেখার পর জটিল রোগীদের জলছত্র অথবা শম্ভুগঞ্জ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। জলছত্র ব্যতীত চারটি হাসপাতালই জেলা সদর বা তার আশেপাশে অবস্থিত এবং এসব হাসপাতালে ঐ জেলার রোগীই বেশি পাওয়া যায়। জলছত্র হাসপাতালেরও অধিকাংশ রোগী ময়মনসিংহের। ১৫০ জন নমুনা কুষ্ঠরোগীর ৫০ জন মহাখালী কুষ্ঠ হাসপাতাল, ৫০ জন নীলফামারী ড্যানিশ–বাংলাদেশ লেপ্রসি মিশন, ২০ জন জলছত্র হাসপাতাল, ২০ জন শম্ভুগঞ্জ হাসপাতাল এবং ১০ জন ময়মনসিংহ এস. কে. হাসপাতাল থেকে রোগীদের প্রশ্নপত্র জরিপ করা হয়। মোট কুষ্ঠরোগীর ১৬.৭% রোগী পাওয়া গেছে ময়মনসিংহে। জরিপ অনুযায়ী ময়মনসিংহ সবচেয়ে বেশি কুষ্ঠ অক্রান্ত স্থান। নীলফামারী এবং ঢাকায় পাওয়া গেছে ১৩.৩% করে মোট ২৬.৬% রোগী। টাঙ্গাইলের আছে মাত্র ৭.৭% রোগী। সব মিলিয়ে যেসব স্থানের হাসপাতালসমূহে জরিপ কাজ চালানো হয় সেসব স্থানের রোগীই হচ্ছে মোট ৪৭.৬%। বাকি রোগীরা অন্য জেলা থেকে এসেছে। অন্য জেলার মধ্যে রংপুরের রোগী পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশি (১০%)। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, হাসপাতাল যে জেলায় অবস্থিত তার পাশের জেলা হিসেবে এবং কুষ্ঠরোগ ব্যাপকতার হারও ঐ স্থানে বেশি হতে পারে। মহাখালী হাসপাতালে পরিচালিত জরিপে দেশের বিভিন্ন স্থানের রোগীদের পাওয়া যায়। ঢাকা ব্যতীত এখানে কুমিল্লা জেলার রোগী পাওয়া গেছে বেশি। এ জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের কুষ্ঠরোগ ব্যাপকতার হারের সার্বিক চিত্র ফুটে উঠেনি। ময়মনসিংহ এবং নীলফামারীর বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যকর পদক্ষেপের ফলে যে পরিমাণ রোগী চিহ্নিতকরণ সম্ভব হয়েছে দেশের অন্যান্য এলাকায় এ ধরনের কাজ হলে প্রকৃত চিত্র পাওয়া যেত। আর ঢাকায় অধিক রোগী পাওয়ার কারণ হলো অধিক জনসংখ্যা। ঢাকা শহরেও পরিকল্পিত উপায়ে রোগী চিহ্নিত করে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হলে আরো প্রয়োজনীয় লোকবল, যন্ত্রপাতি এবং সর্বোপরি হাসপাতালের প্রয়োজন। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

৫.৩ রোগ ও আনুষঙ্গিক তথ্য

রোগীদের রোগ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হাসপাতালে আসার আগে মোটেই থাকে না। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর শুধু রোগের চিকিৎসাই করা হয় না, রোগ সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ পরিচর্যার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। কেননা কুষ্ঠরোগ একটি দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক এবং জটিল রোগ হিসেবে শুধু চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগ সারানো সম্ভব নয়। উল্লেখ্য এ ধরনের ব্যবস্থা বেসরকারি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হাসপাতালেই বেশি কার্যকর।

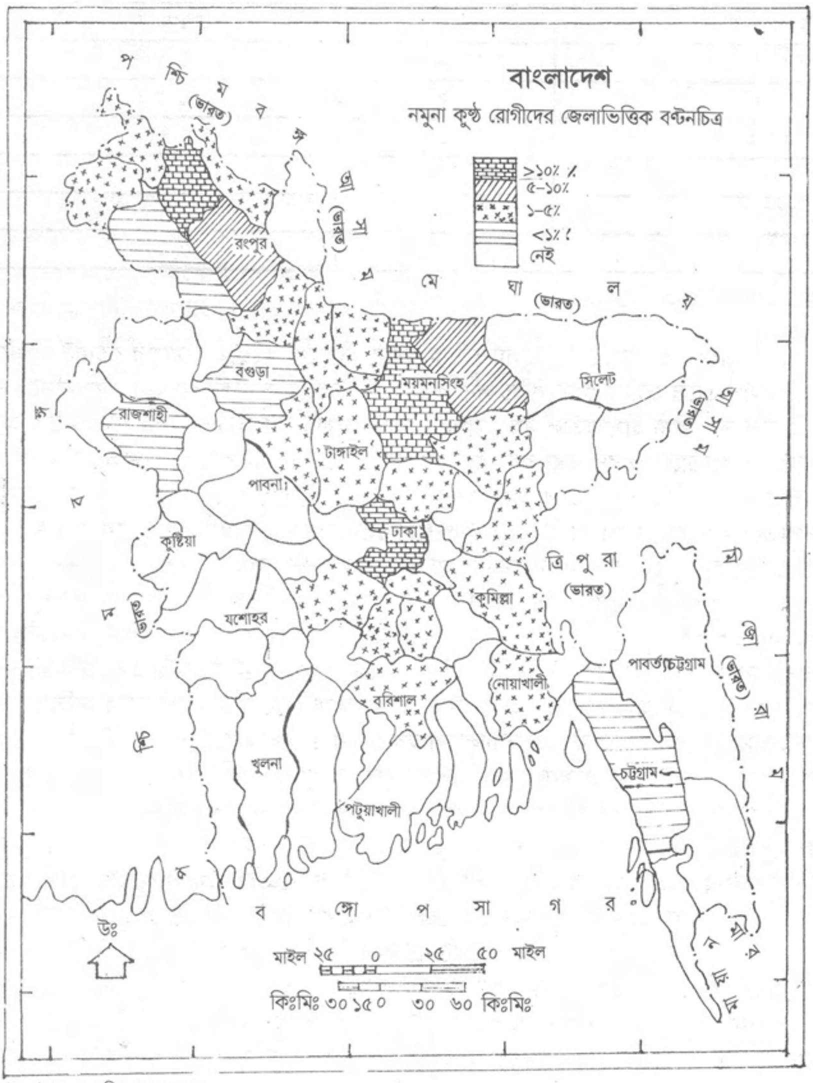

উৎস : প্রশ্ন পত্র জরিপ, ১৯৯৪ ১৯৯৫

৫.৩.১ রোগ গ্রস্ততার সময় ঃ কুষ্ঠরোগ একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ। অনুভূতি এবং যন্ত্রণাবিহীন হওয়ায় প্রথম রোগীরা এ রোগের প্রতি তেমন কোনো গুরুত্বই দেয় না। যে সব রোগী এক বছরের কম সময়ের মধ্যে ধরা পড়েছে তাদের বেশিরভাগই বেসরকারি সংস্থার স্বাস্থ্য কর্মীদের একটি নির্দিষ্ট স্থানের সব লোককে পরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ সম্ভব হয়েছে। রোগে অনেকদিন ভোগার পিছনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, কুষ্ঠরোগটির আরো অনেকগুলো রোগের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। চিকিৎসকগণের রোগ নির্ণয় করতেই অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। কুষ্ঠরোগ দীর্ঘস্থায়ী–এ রোগের চিকিৎসায় দীর্ঘদিন নিয়মিত ওষুধ খেতে হয় যা আমাদের দেশের অশিক্ষিত অসচেতন মানুষের দ্বারা খুবই সম্ভব হয়।

সারণি ৫.৬ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীদের রোগ গ্রস্ততার সময়ের বণ্টন চিত্র।

শ্রেণী	সংখ্যা	শতকরা (%)
< ১ বছর	২৬	১৭.৩ %
১ – ৫ বছর	৬৪	৪২.৭%
৫ – ১০ বছর	২১	১৪. %
১০ – ১৫ বছর	১০	৬.৭ %
১৫ – ২০ বছর	১০	৬.৭ %
২০ – ২৫ বছর	৪	২.৬ %
২৫ – ৩০ বছর	৮	৫.৩ %
> ৩০	৭	৪.৭%
মোট	১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.৬ সারণি অনুযায়ী ৪২.৭% রোগী ১–৫ বছর যাবৎ রোগে ভুগছে। ৫–১০ বছর ভুগছে ১৪% রোগী। ১০ বছরের অধিক ভুগছে ২৬% রোগী। ১–৫ বছর ধরে আক্রান্ত রোগীদের বেশিরভাগ সময় রোগ নির্ণয় করতে অতিবাহিত হয়েছে। বর্তমানে নিয়মিত ওষুধ খাচ্ছে এবং সতর্কতার সাথে চলছে। দশ বছরের অধিক যারা ভুগছে তাদের বেশিরভাগই হাতে পায়ে ঘা। কেননা বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালের পূর্বে এমডিটি দ্বারা চিকিৎসা ছিল না। রোগ ভাল হয়ে যাওয়ার পরও অসাবধানতাবশত অনুভূতিহীন স্থানে পুনরায় ঘা হতে পারে। এটি কুষ্ঠজীবাণুবিহীনও হাতে পারে আবার ঘায়ের মধ্যে নতুন করে জীবাণু প্রবেশও করতে পারে।

সারণি ৫.৭ : নমুনা রোগীদের অসুস্থ অবস্থা হতে রোগ ধরা পড়ার মধ্যবর্তী সময়ের বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা (%)
< ১ বছর	৫৭	৩৮ %
১ – ৫ বছর	৬৫	৪৩.৩%
৫ – ১০ বছর	১৭	১১.৩ %
১০ – ১৫ বছর	৫	৩.৩ %
১৫ – ২০ বছর	৩	২ %
২০ – ২৫ বছর	২	১.৩ %
২৫ – ৩০ বছর	১	০.৭%
মোট	১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.৩.২ অসুস্থ থেকে রোগ ধরা পড়ার মধ্যবর্তী সময় ঃ আমাদের দেশে চিকিৎসার সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে অসচেতন। এর প্রধান কারণ হলো সংখ্যায় অন্যান্য রোগীর চেয়ে কুষ্ঠরোগী খুব কম, তার উপর চামড়ার অন্যান্য রোগের সাথে মিল এবং ভাল চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রচার, প্রচারণা না থাকার ফলে রোগ ধরা পড়তে প্রচুর সময় লেগে যায়। কুষ্ঠ মানুষকে মেরে ফেলে না এবং সাময়িকভাবে তেমন কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে না বলে রোগীরাও গুরুত্ব দেয় না।

এক বছরের কম সময়ের মধ্যে ধরা পড়েছে ৩৮% রোগী, অর্থাৎ এর সবাই সম্প্রতি ধরা পড়েছে। বর্তমানে এ রোগের উপর কিছু কাজ হচ্ছে বিধায় সাধারণ মানুষ এবং চিকিৎসক উভয়েই কুষ্ঠরোগের প্রতি সচেতন হয়েছে। ৪৩.৩% রোগীর রোগ ১-৫ বছরের মধ্যে ধরা পড়েছে। পাঁচ বছরের মধ্যে কুষ্ঠ রোগ ধরা পড়েছে মোট ৮১% রোগীর। বাকি ১৯% রোগীর রোগ ধরা পড়তে ৫-৩০ বছর সময় লেগে যায়। এদের বেশিরভাগই অনেক দিন যাবৎ এ রোগে ভুগছে। কুষ্ঠরোগের কোনো কার্যকর ওষুধ ছিল না।

৫.৩.৩ কুষ্ঠরোগ চিহ্নিতকরণ ঃ সাধারণ সর্দি, কাশি, জ্বর, ডায়রিয়া এসব রোগ মানুষ দেখলেই বলে দিতে পারে। কিন্তু কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে খুব কম লোকই বলতে পারে। এ রোগ কাদের মাধ্যমে প্রথম চিহ্নিত হয়েছে সে তথ্যের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগের সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

সারণি ৫.৮ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীদের কুষ্ঠরোগ প্রথম যাদের মাধ্যমে চিহ্নিত হয়েছে তার বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা (%)
ডাক্তার	৭৭	৫১.৩ %
স্বাস্থ্যকর্মী	৩৩	২২.০ %
আত্মীয়	২৪	১৬.০ %
প্রতিবেশী	৯	৬.০ %
অন্যান্য	৭	৪.৭ %
মোট	১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪-৯৫।

৫.৮ সারণি অনুযায়ী ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মী যাদেরকে এ রোগের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাদের মাধ্যমে ৭৩% রোগী ধরা পড়েছে। আত্মীয় প্রতিবেশী মাত্র ২২% রোগীর কুষ্ঠ রোগ ধরতে পেরেছে। তার মানে বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে অজ্ঞ।

৫.৩.৪ কুষ্ঠরোগ ধরা পড়ার পূর্বের চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ বেশিরভাগ কুষ্ঠ রোগীরই এ রোগ হওয়ার পর ধরা পড়তে সময় লেগে যায় অনেক। এ সময়ের মধ্যে রোগী নানা রকম চিকিৎসা করে। খুব কমসংখ্যক রোগীই প্রথম থেকে কুষ্ঠ চিকিৎসা পেয়েছে। বেসরকারি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত মাঠ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করা রোগী ব্যতীত অন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগীই আগে নানারকম চিকিৎসার পর সুফল না পেয়ে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা নিচ্ছে।

সারণি ৫.৯ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীদের পূর্বেকার চিকিৎসা পদ্ধতির বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা (%)
এলোপ্যাথ	৪৮	৩৯.৩ %
হোমিওপ্যাথ	১	০.৮ %
পল্লী চিকিৎসা	৫	৪.১ %
কবিরাজ	১৪	১১.৫ %
একাধিক	৫৪	৪৪.৩ %
মোট	১২২	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪-৯৫।

BANSDOC Library Accession No. 17874

৫.৯ **সারণি** অনুযায়ী এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করেছে ৩৯.৩%। সবচেয়ে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করার পরও প্রথমে কুষ্ঠরোগ চিহ্নিত করা যায় নি। ৪৪.৩% রোগী একাধিক চিকিৎসা করেছে। উপরিউক্ত তথ্যের মাধ্যমে দেশের চিকিৎসা পদ্ধতির বর্তমান পরিস্থিতি এবং মানুষের মানসিক পরিস্থিতিও অনুমান করা যায়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেছে মাত্র একজন রোগী। তারচেয়ে অনেক বেশি করেছে কবিরাজি চিকিৎসা। উল্লেখ্য, নমুনা ১৫০ জন রোগীর, বাকি ২৮ জন রোগী প্রথমেই স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে ধরা পড়ায় তারা অন্য কোনো চিকিৎসা গ্রহণ করে নি।

৫.৩.৫ কুষ্ঠরোগীদের রোগের কারণ সম্পর্কে ধারণা ঃ দেশের বেশিরভাগ মানুষ স্বাস্থ্য সম্পর্কে অত্যন্ত অসচেতন। রোগীদের হাসপাতালে আসার পর বহুবার রোগ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হলেও তারা সঠিকভাবে বলতে পারে না এ রোগ কেন হয়।

সারণি ৫.১০ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীদের রোগ সম্পর্কে ধারণা।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা (%)
জীবাণু দ্বারা হয়	৪৪	২৯.৩ %
জানে না	৯৫	৬৩.৩ %
অন্যান্য	১১	৭.৩ %
মোট	১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.১০ **সারণিতে** দেখা যায় ২৯.৩% লোক স্পষ্টভাবে জানে যে জীবাণু দ্বারা কুষ্ঠরোগ হয়। ৬৩.৩% রোগীই জানে না কেন হয় এ রোগ। কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ ক্লিনিকগুলোর বারবার হুঁশিয়ারীর ফলে এ রোগ যে কোনো অভিশাপের ফলে হয় না তা রোগীরা বোঝে কিন্তু জীবাণুর আক্রমণে হয় এ বিশ্বাসও অশিক্ষিত রোগীরা স্থাপন করতে পারছে না। তাই তারা জানে না বলে উত্তর দেয়। পূর্বেকার গবেষণায় দেখা যায় ৪২.২% রোগী বলেছে — কোনো পাপের ফলে এ রোগ হয় এবং ৪০% রোগীর ধারণা কুষ্ঠরোগ সৃষ্টিকর্তার কোনো অভিশাপ (Akhter 1991)।

৫.৩.৬ কুষ্ঠরোগের লক্ষণ ঃ কুষ্ঠরোগের লক্ষণ বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন– গায়ে দাগ, হাত, পা বা শরীরের কোনো অংশ অনুভূতিহীন হয়ে যাওয়া, হাতে পায়ে ঘা, ফোসকার মত শরীরে গোটা উঠা ইত্যাদি।

সারণি ৫.১১ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীদের রোগের লক্ষণ।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা (%)
দাগ	৮৩	৫৫.৩ %
ঘা	৩২	২১.৩ %
অনুভূতিহীনতা	২৪	১৬.০ %
ফোসকা	১১	৭.৩ %
মোট	১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

BANSDOC Library Dhaka

৫.১১ সারণি অনুযায়ী ৫৫.৩% রোগীরই রোগের লক্ষণ ছিল শরীরে অনুভূতিহীন দাগ। হাত-পায়ের অংশবিশেষ অবশ বা স্তব্ধ হয়ে গেছে ১৬% রোগীর। ফোসকা বা গোটা উঠেছে মাত্র ৭.৩% রোগীর। ১৯৯০ সালের গবেষণায় দেখা যায় ৬০% রোগীর দেহে রোগের লক্ষণ ছিল অনুভূতিহীন দাগ। সুতরাং আমাদের দেশের রোগীদের মধ্যে এ ধরনের লক্ষণই বেশি দেখা যায়।

৫.৩.৭ কুষ্ঠরোগ ভাল হয়ে যাওয়া এবং নিয়মিত সেবা গ্রহণ সম্পর্কে রোগীদের ধারণা ঃ কুষ্ঠরোগের বহুদিনের ইতিহাস মানুষের মনে একটি স্থায়ী ভীতির সৃষ্টি করেছে। তাই নতুন চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ ভাল হয়ে যাওয়া সম্পর্কে এখনো মানুষ সন্দিহান। স্নায়ুতন্ত্র নষ্ট হয়ে গেলে সাধারণত তা আর সেরে উঠে না সহজে। তাই অনুভূতিহীন স্থানে কুষ্ঠরোগ সেরে যাওয়ার পরও অন্য কোনো কারণে ঘা হতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা বুঝে না। তবে এ রোগকে অত্যন্ত ভয় পায় বলে নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণের চেষ্টা করে। দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা বিধায় কিছু রোগী অর্থনৈতিক (যাতায়াত) কারণ বা সামাজিক কারণে অনিয়মিত সেবা গ্রহণ করে থাকে।

সারণি ৫.১২ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীর রোগ ভাল হয়ে যাওয়া এবং নিয়মিত সেবা গ্রহণের বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
কুষ্ঠরোগ সারে	১০৩	৬৮.৭%	—	—
কুষ্ঠরোগ সারে না	৪০	২৬.৭%	—	—
নিয়মিত সেবা নেয়	—	—	১৪৪	৯৬%
অনিয়মিত সেবা নেয়	—	—	৬	৪%
অন্যান্য	৭	৪.৭%	—	—
মোট	১৫০	১০০%	১৫০	১০০%

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪-৯৫।

৪.১২ সারণি অনুযায়ী নমুনা কুষ্ঠরোগীদের মতামত জরিপে দেখা যায় ৬৮.৭% রোগীর ধারণা কুষ্ঠরোগ ভাল হয়ে যায়। ২৬.৭% এর ধারণা এ রোগ সারে না। বাকি ৪.৭% রোগী স্পষ্ট কোনো মতামত জানায় নি। ৯৬% রোগী নিয়মিত সেবা গ্রহণ করে। যদিও ২৬.৭% রোগী ধারণা কুষ্ঠরোগ সারে না। মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত হলেও তারা নিয়মিত সেবা গ্রহণ করার চেষ্টা করে।

৫.৩.৮ কুষ্ঠরোগীর এলাকায় অবস্থিত কুষ্ঠ হাসপাতালের দূরত্ব ঃ কুষ্ঠরোগীদের এলাকায় কোনো হাসপাতাল আছে কিনা এবং তা কত দূরত্বে অবস্থিত, এ তথ্য থেকে একদিকে যেমন দেশের কুষ্ঠ নিরাময় ব্যবস্থা জানা যাবে অন্যদিকে কতদূর থেকে এসে রোগীরা হাসপাতালের সেবা গ্রহণ করে তার মাধ্যমে রোগীদের আচরণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। কেননা সামাজিক ভয়ে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ভিক্ষুক শ্রেণির কিছু রোগী রোগ সারাতে চায় না।

সারণি ৫.১৩ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীদের বাসস্থান থেকে কুষ্ঠ ক্লিনিকের দূরত্বের বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা
< ১ মাইল	৬	৪.০ %
১ – ৪ মাইল	৪১	২৭.৩ %
৫ – ৯ মাইল	৩৪	২২.৭ %
১০ – ১৪ মাইল	২০	১৩.৩ %
> ১৫ মাইল	৪৯	৩২.৭ %
মোট	১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.১৩ সারণি অনুযায়ী হাসপাতালের দূরত্ব ১৫ মাইলের বেশি হলে তার এলাকায় কুষ্ঠ চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই ধরা হলে দেখা যায় ৩২.৭% রোগীই এ স্তরে পড়ে। বাসস্থান থেকে এক মাইলের মধ্যে কুষ্ঠ নিরাময়ের ব্যবস্থা আছে এমন রোগী পাওয়া গেছে মাত্র ৪%। ৫% রোগীর বাড়ি থেকে হাসপাতালের দূরত্ব এক থেকে দশ মাইলের মধ্যে। ১০–১৪ মাইলের মধ্যে আছে ১৩.৩% রোগী। কুষ্ঠরোগীরা অনেক দূর–দূরান্ত থেকে এসে রোগের চিকিৎসা করে ঠিকই তবে অনেক দিন রোগে ভোগার পর। ততদিনে শরীরের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে ২/১ বছরের মধ্যে দেশের প্রতিটি থানায় কুষ্ঠ নিরাময়ের ব্যবস্থা হলে এ সমস্যা দূর হবে।

৫.৩.৯ কুষ্ঠরোগের বংশানুক্রমিকতা ঃ কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে একটি কুসংস্কার আছে যে কুষ্ঠরোগ বংশগত রোগ। এ ধারণার জন্য সমাজে কুষ্ঠরোগীদের ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা একবার কোনো একটি পরিবারের কারো কুষ্ঠরোগ হলে সম্পূর্ণ পরিবারকে সমাজচ্যুত করার নজিরও আছে। আর সহজে এ ধরনের পরিবারের সাথে কেউ আত্মীয়তা করতে চায় না।

সারণি ৫.১৪ ঃ পরিবারে অন্যদের কুষ্ঠরোগের বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সম্পর্ক	সংখ্যা	শতকরা
পরিবারের অন্যান্যদের কুষ্ঠরোগ আছে	স্বামী/স্ত্রী	৫	৩৩. %
	চাচা/চাচী/ভাই/বোন	১২	৮.০ %
	দূর সম্পর্কের আত্মীয়	৫	৩.৩ %
পরিবারের অন্য কারো কুষ্ঠরোগ নেই		১২৮	৮৫.৩ %
মোট		১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

উপরিউক্ত সারণি অনুযায়ী দেখা যায় ৮৫.৩% রোগীরই পরিবারে অন্য কারো কুষ্ঠরোগ ছিল না। বাকি প্রায় ১৫% রোগীর মধ্যে স্বামী অথবা স্ত্রীর কুষ্ঠরোগ ছিল এমন রোগী আছে মাত্র ৩.৩%। ভাই, বোন, চাচা–চাচী এ ধরনের নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে কুষ্ঠরোগ আছে ৮% রোগীর। দূরসম্পর্কের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কুষ্ঠরোগ আছে 'এ ধরনের রোগী আছে ৩.৩%। সুতরাং কুষ্ঠরোগ বংশগত এ ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। তবে কাছাকাছি থাকলে কুষ্ঠরোগ হওয়ার কিছুটা সম্ভাবনা থাকতে পারে।

৫.৩.১০ কুষ্ঠরোগীর শারীরিক পরিস্থিতি ঃ কুষ্ঠরোগ হলে চেহারা বিকৃত হয়ে যায়, বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, অনুভূতি শূন্য হয়ে হাত, পা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাওয়ার অনেক উদাহরণ আছে। তবে বর্তমান সময়ের জনগণ অতি সৌভাগ্যবান যে কুষ্ঠরোগের মত একটি জটিল রোগের নিরাময়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু শিক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় এতটাই আন্তঃসম্পর্কিত যে, একই পদ্ধতি সবস্থানে একই রকমভাবে প্রয়োগ হলেও ফলাফল ভিন্ন হতে পারে। দেখা যাক, বিজ্ঞানের অনেক অগ্রগতির সুযোগ বাংলাদেশের জনগণ কতটা গ্রহণ করতে পেরেছে।

সারণি ৫.১৫ ঃ কুষ্ঠরোগীদের শারীরিক পরিস্থিতির বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা
বিকলাঙ্গ নয়	৭৯	৫২.৭ %
হাত অকেজো	৮	৫.৩ %
পা অকেজো	৪৪	২৯.৩ %
হাত, পা দুটোই অকেজো	১৪	৯.৩ %
হাত, পা ও চোখ অকেজো	৫	৩.৩ %
মোট	১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.১৫ সারণি অনুযায়ী ৫২.৭% রোগী শারীরিক ক্ষতি থেকে মুক্ত আছে। বাকিদের মধ্যে ২৯.৩% রোগীরই পায়ে সমস্যা। এর প্রধান কারণ হলো পায়ের উপর আমাদের সমস্ত শরীরের চাপ পড়ে। অন্যদিকে কৃষি, দিনমজুর প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত রোগীদের পায়ে কখন যে কিভাবে ক্ষত হয়ে যায় তা তারা লক্ষ্য করার আগেই ক্ষতি হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে তাই পা অকেজো হয়ে যায়। কাজ করার সময় হাতেও চাপ পড়ে। তাছাড়া কুষ্ঠজীবাণু প্রথমেই প্রান্তিক স্নায়ুসমূহ আক্রমণ করে অনুভূতিহীন করে ফেলে, তাই হাত–পায়ের আঙ্গুল প্রথমেই বেঁকে যায়। কুষ্ঠরোগীদের এমন কাজ করা উচিত যাতে তাদের অনুভূতিহীন জায়গায় কোনো ক্ষতি না হয়। কুষ্ঠরোগের সবচেয়ে কষ্টকর পরিণতি হচ্ছে চোখ অকেজো হওয়া। নমুনা জরিপে এ ধরনের রোগীর সংখ্যা ৩.৩%। এরা বেশিরভাগই বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে সারাদেশে এমডিটি কার্যক্রম চালু হলে কুষ্ঠরোগীকে বিকলাঙ্গতা সৃষ্টি করার পূর্বে দূর করা সম্ভব হবে।

৫.৩.১১ সময়ের সাথে কুষ্ঠরোগীর শারীরিক পরিস্থিতির সম্পর্ক ঃ সময়ের সাথে কুষ্ঠরোগীর শারীরিক পরিস্থিতির একটি সম্পর্ক রয়েছে। রোগ ধরা পড়তে এবং সঠিক চিকিৎসার জন্য সময় যত বেশি লাগবে রোগী শারীরিকভাবে তত বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ বিষয়টি যে কোনো রোগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হলেও কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন, যেমন বেশিরভাগ রোগীর পা নষ্ট হয়ে যায়, হাত নষ্ট হয়ে যায়। অবশেষে যখন চোখও নষ্ট হয়ে যায় তখন তার বেঁচে থাকা শুধুই যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য। সামাজিকভাবে বোঝা, অক্ষম অথর্ব হয়ে সমাজে ভীতি সৃষ্টি করে এ ধরনের রোগীরা হাসপাতালেই বেশি থাকে।

সারণি ৫.১৬ ঃ সময়ের সাথে কুষ্ঠরোগীর শারীরিক পরিস্থিতির সম্পর্ক।

অসুস্থতার সময় (বছর)	হাত অকেজো	পা অকেজো	হাত ও পা অকেজো	হাত, পা ও চোখ অকেজো	বিকলাঙ্গ নয়	মোট সংখ্যা
< ১ বছর	১	—	—	—	২৫	২৬
১ – ৫ বছর	৬	১৭	৪	—	৩৭	৬৪
৫ – ১০ বছর	—	১২	১	—	৮	২১
১০ – ১৫ বছর	২	২	১	—	৫	১০
১৫ – ২০ বছর	—	৩	৩	২	২	১০
২০ – ২৫ বছর	—	২	২	—	—	৪
২৫ – ৩০ বছর	—	৪	২	১	১	৮
> ৩০ বছর	—	৪	—	২	১	৭
মোট	৯	৪৪	১৩	৫	৭৯	১৫০

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.১৬ সারণিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। ১ বছরের কম সময়ের রোগী বেশিরভাগই বিকলাঙ্গ নয়। ১–৫ বছর সময় অসুস্থ রোগীদের মধ্যে শারীরিক ক্ষতি হয়ে গেছে। হাত, পা ও চোখ নষ্ট হয়ে গেছে এমন পাঁচজন রোগী পনের বছরের বেশি সময় ধরে রোগে ভুগছে। এদের মধ্যে মাত্র দুজন রোগী পাওয়া গেছে যারা দীর্ঘদিন রোগে ভুগেও শারীরিকভাবে সুস্থ। এরা দুজনেই শিক্ষিত এবং এখনো প্রয়োজনে ডাঃ দেখান, সাথে সাথে নিয়মিত শরীরের যত্ন নেন।

৫.৪ কুষ্ঠরোগীর পারিবারিক এবং সামাজিক তথ্য

কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে সার্বিক তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য রোগীর পারিবারিক এবং সামাজিক তথ্য ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করা হয়। কুষ্ঠ একটি সামাজিক ব্যাধি হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কি ধরনের পরিবারে কুষ্ঠরোগ বেশি হয় এবং সমাজে তার প্রতিক্রিয়া কি তা এ গবেষণার মাধ্যমে কিছুটা বুঝা যাবে। সামাজিক গবেষণা হলো সমাজে মানুষের আচরণ, তার সামাজিক জীবন, সামাজিক জীবনে তার বিভিন্ন সমস্যা ও এদের সমাধান ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া, পদ্ধতিগতভাবে তথ্য অনুসন্ধান এবং এসব বিষয়ের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ লাভ। অন্যকথায়, সামাজিক গবেষণা হলো পদ্ধতিগত উপায়ে অব্যাখ্যাত সামাজিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা অনুসন্ধান, সন্দেহজনক ও দ্বিধাগ্রস্ত ঘটনাসমূহের সুস্পষ্টকরণ এবং সমাজ সম্পর্কিত ভুল ধারণা পরিবর্তন ও সংশোধন (তপন ১৯৯৩)। এ উদ্দেশ্যে নিম্নে সংগৃহীত তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ করা হলো।

৫.৪.১ কুষ্ঠরোগী পরিবারের সাথে একঘরে বাস করে কিনা এবং বাস করলেও পৃথক থাকার ব্যবস্থা আছে কিনা ঃ কুষ্ঠরোগকে মানুষ এত বেশি ভয় পায় যে এ রোগ হওয়ার পর পাড়া–প্রতিবেশী সবাই দূরে সরে যায়। এমনকি মা তার মেয়েকে ঘরে জায়গা দিতে চায় না। সমাজে এমন নজিরও আছে গ্রামের একপাশে তার জন্য সম্পূর্ণ পৃথক থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। আবার গ্রামবাসীর পুরো পরিবারকে একঘরে করে দিতে পারে। তবে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে কার্যকরি পদক্ষেপের ফলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছে। দেখা যাক নমুনা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত কুষ্ঠরোগীদের কি পরিস্থিতি।

সারণি ৫.১৭ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীদের বসবাসের বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা
সম্পূর্ণ আলাদা থাকে	২৯	১৯.৩ %
একই ঘরে পৃথক থাকে	১৫	১০.০ %
পৃথক থাকে না	১০৬	৭০.৭ %
মোট	১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.১৭ সারণি অনুযায়ী ৭০.৭% রোগীই পরিবারে সবার সাথে থাকে। কোনো রকম পৃথক ব্যবস্থা নেই। এর প্রধান কারণ হলো রোগ সম্পর্কে রোগীদের ধারণা নেই। রোগ কিভাবে ছড়ায় তা তারা স্পষ্ট জানে না। এছাড়া ওষুধ গ্রহণ করার পর রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা না থাকলে ডাক্তারও সে রকম কোনো বিধি আরোপ করে না। আবার কাউকে জানানোর ভয়েও এতসব নিয়ম মেনে চলে না। ১০% রোগী একঘরে বসবাস করলেও সাবধানতাবশত নিজেকে আলাদা রাখে। ১৯.৩% রোগীর জীবনে নেমে এসেছে সমাজের দুর্বিসহ যন্ত্রণা। এদেরকে জোরপূর্বক সম্পূর্ণ আলাদা বা হাসপাতালে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫.৪.২ কুষ্ঠরোগীদের বংশানুক্রমিক নাগরিকত্ব ঃ অনেকের ধারণা কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি স্থল ভারত। বাংলাদেশের তিনপাশেই ভারত এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি (ইয়ালকার এবং ম্যাকডুগাল – ১৯৮৯)। তাই ধারণা করা হয় ভারত থেকে এ রোগ বাংলাদেশে এসেছে। আবার বিহারী মুসলমানদের মধ্যেও কুষ্ঠরোগের প্রার্দুভাব বেশি। নমুনা কুষ্ঠরোগীরা বংশানুক্রমিকভাবে বাংলাদেশে বাস করছে কি না এ প্রশ্ন করা হয়। তবে কুষ্ঠরোগীরা বংশানুক্রমিকভাবে বাংলাদেশে বসবাস না করলেও সীমান্ত এলাকার মাধ্যমে যে অবাধ যাতায়াত হয় তার মাধ্যমেও কুষ্ঠরোগ ছড়াতে পারে। তবে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পূর্বে ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। এখন জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা যাক।

সারণি ৫.১৮ ঃ কুষ্ঠরোগীদের বংশানুক্রমিক নাগরিকত্বের বণ্টন চিত্র

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা
বাংলাদেশের নাগরিক	১৪৩	৯৫.৩ %
ভারতীয় নাগরিক	৬	৪.০ %
পাকিস্তানের নাগরিক	১	০.৭ %
মোট	১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.১৮ সারণি অনুযায়ী দেখা যায় ৯৫.৩% রোগীই বংশানুক্রমিকভাবে বাংলাদেশে বসবাস করছে। ৪% রোগী ইন্ডিয়া থেকে এসেছে। মাত্র একজন রোগী পাওয়া গেছে পাকিস্তানের। মিরপুর বিহারী ক্যাম্পে তার বাস। সেখানে জরিপ কাজ চালানো হলে আরো রোগী পাওয়া যেত। কিন্তু এ গবেষণার স্থান ছিল বিভিন্ন কুষ্ঠ হাসপাতাল। যদিও বাংলাদেশের নাগরিকদের শতকরা হার বেশি

এসেছে তবুও ভারতীয় এবং পাকিস্তানীদের মাধ্যমে এ রোগ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং পরে তা এখন ছড়িয়ে পড়েছে এ ধারণা একেবারে অমূলক নয়।

৫.৪.৩ কুষ্ঠরোগীর পেশা পরিবর্তন ঃ কুষ্ঠরোগের কারণে রোগীকে পেশা পরিবর্তন করতে হয়। এ রোগে ধীর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষকে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অক্ষমতার কারণে মানুষ তার পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। আবার সামাজিক কারণেও কুষ্ঠরোগীকে পেশা পরিবর্তন করতে হয়।

সারণি ৫.১৯ ঃ কুষ্ঠরোগীদের পেশা পরিবর্তনের বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি		সংখ্যা	শতকরা
পূর্বের পেশা	বর্তমান পেশা		
চাকরি	বেকার	১০	৬.৭ ٪
কৃষি	বেকার	১৯	১২.৭ ٪
ছাত্র	বেকার	৪	২.৭ ٪
কৃষি	ভিক্ষা	৭	৪.৭ ٪
অন্যান্য	উপযুক্ত কোনো পেশা	১৩	৮.৭ ٪
পেশা	অপরিবর্তনীয়	৯৭	৬৪.৭ ٪
	মোট	১৫০	১০০ ٪

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.১৯ সারণিতে দেখা যায় ৬৪.৭٪ রোগীই তার পেশা পরিবর্তন করে নি। তার মানে এটি নয় যে তারা শারীরিকভাবে সুস্থ এবং উপযুক্ত কোনো পেশায় আছে। বরং এর মধ্যে একটি বিরাট অংশ আছে গৃহবধূ, আর আছে যাদের পরিবর্তন করে অন্য কিছু করার সাধ্য নেই। এরা বেশির ভাগ দিনমজুর, কৃষিকাজ করে মাঠে। ওষুধ খেয়ে ভাল হয়। আবার কাজকর্ম করতে গিয়ে হাতে পায়ে ক্ষত বানিয়ে হাসপাতালে আসে। সামান্য কিছু ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী আছে যাদের এ অসুখের কথা কেউ জানে না। যারা পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন তাদের ৩৫٪ এর মধ্যে ২২٪ ই বেকার হয়ে পড়েছেন। ৪.৭٪ জীবিকা নির্বাহের জন্য ভিক্ষাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। মাত্র ৮.৭٪ রোগী বিভিন্ন পেশা থেকে তার শরীরের জন্য উপযুক্ত পেশা বেছে নিয়েছে। এদের বেশিরভাগই সম্ভব হয়েছে নীলফামারী ড্যানিশ–বাংলাদেশ লেপ্রসি মিশনের কল্যাণে। কেননা সেখানে রোগীদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে। রোগীদের সেলাই, কাঠ মিস্ত্রী ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মাত্র দু–একজন রোগী আছে যারা নিজেরাই পেশা পরিবর্তন করে এমন পেশা বেছে নিয়েছেন যাতে তাদের শরীরের ক্ষতি না হয়।

৫.৪.৪ রোগীর আত্মীয়-প্রতিবেশীর প্রতিক্রিয়া ঃ আত্মীয়-প্রতিবেশী কেউ সহজভাবে কুষ্ঠরোগীকে গ্রহণ করে না। এ রোগের কথা শুনলে রোগীর বাড়িতে আসতে পর্যন্ত ভয় পায়। সামাজিক পরিস্থিতি এ রকম বলে কুষ্ঠরোগীও নিজেকে যথাসম্ভব গুটিয়ে রাখে। নমুনা কুষ্ঠরোগীর তথ্যের মাধ্যমে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি ৫.২০ ঃ কুষ্ঠরোগীর প্রতি আত্মীয়-প্রতিবেশীর প্রতিক্রিয়া।

শ্রেণি	প্রতিবেশী জানে –সংখ্যা	শতকরা	প্রতিবেশী রোগীর বাড়িতে আসে সংখ্যা	শতকরা	রোগী যায় অন্য বাড়িতে –সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৮০	৫৩.৩ %	১১১	৭৪.০ %	৬৮	৪৫.৩ %
না	৭০	৪৬.৭ %	৩৯	২৬.০ %	৮২	৫৪.৭ %
মোট	১৫০	১০০%	১৫০	১০০ %	১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.২০ সারণিতে দেখা যায় ৫৩.৩% রোগীর রোগ সম্পর্কে প্রতিবেশী জানলেও ৪৬.৭% রোগীর রোগ যে কুষ্ঠ তার প্রতিবেশী–আত্মীয়স্বজন তা জানেই না। আত্মীয়-প্রতিবেশীরা কুষ্ঠরোগীর বাড়িতে আসে না সহজে। সারণি অনুযায়ী ৭৪% রোগীর বাড়িতে প্রতিবেশীরা আসলেও বেশিরভাগই রোগ সম্পর্কে জানে না বলে আসে। বাকি ২৬% রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি এমন যে রোগ লুকানোর কোনো উপায় নেই। তাই তাদের কাছে কেউ আসে না। কুষ্ঠরোগী গোপন রাখলেও মানসিক দুর্বলতার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই অন্য কোথাও যেতে চায় না। তাই দেখা যায় ৫৪.৭% রোগী অন্য বাড়িতে যায় না। আর বাকি যারা তাদের বেশিরভাগই জীবনের তাড়নায় জীবিকার সন্ধানে যেতে বাধ্য হয়।

৫.৪.৫ কুষ্ঠরোগীদের বিবাহ সম্পর্কিত তথ্য ঃ সামাজিক রোগ হিসেবে কুষ্ঠরোগ বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে নানা রকম ঝামেলা সৃষ্টি করে। বিবাহিত হলে অনেক ক্ষেত্রে পরিবারে বিভিন্ন রকম অশান্তি সৃষ্টি হয়। অবিবাহিতদের কেউ বিবাহ করতে চায় না। তাই তারা রোগ সম্পর্কে না জানিয়ে করা চেষ্টা করে। বিশেষ করে বাংলাদেশের ন্যায় সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরো তীব্র হয়।

সারণি ৫.২১ ঃ কুষ্ঠরোগীদের বিবাহ সম্পর্কিত তথ্য।

শ্রেণি			সংখ্যা	শতকরা (%)
বিবাহিত	রোগ হওয়ার পূর্বে		৮৯	৫৯.৩ %
	রোগ হওয়ার পর	রোগের কথা বলেছে	৩	২.০ %
		রোগের কথা বলেনি	১০	৬.৭ %
		জানত না কুষ্ঠরোগ	৬	৪.০ %
অবিবাহিত			৪২	২৮.০ %
মোট			১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫

জরিপকৃত কুষ্ঠরোগীদের ২৭% অবিবাহিত এবং ৭২% বিবাহিত। বিবাহিত ৭২% এর ৫৯·৩% রোগ হওয়ার পূর্বে বিবাহ করেছে। বাকি ১২·৭% এর মধ্যে ৬·৭% রোগ লুকিয়ে অর্থাৎ রোগের কথা

না বলে বিয়ে করেছে। মাত্র ২% রোগী বিয়ের সময় রোগের কথা বলেছে, কারণ তারা এ ধরনেরই অরেকজন রোগীকে বিয়ে করেছে। এ থেকে দেখা যায় কুষ্ঠ রোগীদের সামাজিক সমস্যা কতটা প্রকট।

৫.৪.৬ কুষ্ঠরোগীদের পরস্পরের প্রতি মনোভাব ঃ শারীরিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি কুষ্ঠরোগীদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তারা নিজেরা নিজেদের প্রতি এতটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে যে, মানবিক গুণাবলী লোপ পায় আর কুষ্ঠরোগ এমনই ভীতি সৃষ্টি করে যে একজন কুষ্ঠরোগী আরেকজন কুষ্ঠরোগীকে সহজে আশ্রয় দিতে চায় না। তাছাড়া সংক্রমণের ভয় তো আছেই। পরস্পর আত্মীয়তা করতে বেশিরভাগই রাজি হতে চায় না।

সারণি ৫.২২ ঃ কুষ্ঠরোগীদের পরস্পরের প্রতি মনোভাবের বন্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা (%)	শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা (%)
পরস্পর আত্মীয়তা করবে	২৭	১৮.০ %	পরস্পরকে আশ্রয় দিবে	৬২	৪১.৩%
পরস্পর আত্মীয়তা করবে না	১২৩	৮২.০%	পরস্পরকে আশ্রয় দিবে না	৮৮	৫৭.৭%
মোট	১৫০	১০০%	মোট	১৫০	১০০%

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.২২ সারণি অনুযায়ী দেখা যায় ৮২% রোগী আরেকটি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করতে সম্মত নয়। মানসিকভাবে একটু উদার এবং যারা এ বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে যে কুষ্ঠরোগ এখন নিরাময়যোগ্য রোগ, তারা কয়েকজন মাত্র এ ধরনের পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করতে রাজি হয়েছে। ৫৭.৭% রোগী আরেকজন রোগীকে প্রয়োজনে আশ্রয় দিতে রাজি নয়। এ তথ্য থেকে বুঝা যায় কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে দীর্ঘদিনের স্থায়ী ভীতি এখনো ভাঙ্গা সম্ভব হয় নি। কুষ্ঠরোগীদের বেলায়ই এ ধরনের তথ্য এসেছে। একই জরিপ সাধারণ মানুষের মধ্যে করলে ১% আশ্রয়দাতা খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। এ থেকে সমাজের দুটি দিক ফুটে উঠে। প্রথমত মানুষ এতটাই অসচেতন এবং অল্প জ্ঞানসম্পন্ন যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এত বড় একটি সুযোগ মানুষের অজ্ঞানতার কারণে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কাগজে কলমে যতটা পরিপাটি বাস্তবে ততটা সুন্দর এবং কার্যকর কিনা ভেবে দেখার বিষয়। উপরন্তু কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপসমূহ কতটা বাস্তবসম্মত তাও খুঁজে দেখা প্রয়োজন।

৫.৪.৭ কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক পরিস্থিতি ঃ সামাজিকভাবে কুষ্ঠরোগীরা আদিকাল থেকেই ঘৃণিত হচ্ছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কুষ্ঠরোগীরা দুর্বিসহ জীবন অতিবাহিত করে চলে গেছে পরপারে। এখনো অনেক রোগী কুষ্ঠ হাসপাতালে থাকতে ভাল মনে করে। কেননা সেখানে সামাজিক তিরস্কারের ভয় থাকে না। দেখা যাক কুষ্ঠ রোগীদের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি কি?

সারণি ৫.২৩ ঃ কুষ্ঠরোগীর সামাজিক পরিস্থিতির বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা
ঘৃণা করে	৬২	৪১.৩ ৷
জানে না বলে কিছু বলে না	৭০	৪৬.৭ ৷
মিশ্র মনোভাব	১৮	১২.০ ৷
মোট	১৫০	১০০ ৷

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

কুষ্ঠরোগীদের উপর প্রশ্নপত্র জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৪১.৩৷ রোগীকে সমাজে সবাই ঘৃণা করে। ৪.৬৭৷ রোগীর কুষ্ঠরোগের কথা কেউ জানে না বলে কিছু বলে না। অর্থাৎ রোগীরা সামাজিক বঞ্চনার ভয়ে রোগের কথা কাউকে বলে না। এ হিসেবে ৮৮৷ রোগীকেই সামাজিক বঞ্চনার স্বীকার হতে হচ্ছে বর্তমান যুগেও।

৫.৪.৮ কুষ্ঠরোগীদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ঃ সমস্যা যেখানে একটি থাকে সেখানে অন্য আরো রকমারি সমস্যা এসে উপস্থিত হয়। যেমন শিক্ষার অভাবে মানুষ অসচেতন, অদূরদর্শী হয় এবং সব বিষয়ে তার জ্ঞান থাকে সীমিত। তাই সমস্যাগুলো তাদের মধ্যেই প্রকট। জনসংখ্যা যখন সম্পদে পরিণত করা না যায় তখন তা সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। বাংলাদেশ তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানো যায় না তেমনি অপরদিকে একস্থানে বেশি লোক বসবাসের ফলে রোগ হওয়া এবং ছড়ানোর সম্ভাবনা বেশি থাকে।

সারণি ৫.২৪ ঃ কুষ্ঠরোগীদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ভিত্তিক বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা
২ – ৪ জন	৬২	৪১.৩ ৷
৫ – ৭ জন	৫৪	৩৬.০ ৷
> ৮	২৪	১৬.০ ৷
সংসার নেই	১০	৬.৭ ৷
মোট	১৫০	১০০ ৷

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.২৪ সারণিতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা দেখানো হয়েছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ এর উপরে রয়েছে ৫৮.৬৭৷ রোগীর। ছোট পরিবার আছে ৪১.৩৷। রোগের জন্য এদের অনেককে যৌথ পরিবার থেকে ভিন্ন করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া ছোট পরিবার বলেই যে স্বচ্ছল হবে তারও নিশ্চয়তা নেই। কারণ এদের বেশিরভাগই দিনমজুর বা রিক্সাচালক। আবার রোগের কারণে অনেক সময় উপার্জনও করতে পারে না। সংসার নেই, এমন রোগী পাওয়া গেছে ৬.৭৷। এদের কারো

সংসার ভেঙ্গে গেছে, কারো সংসার করার আগেই রোগের কারণে সমাজচ্যুত হয়েছে। এসব তথ্যের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগীদের একটি সামাজিক চিত্রও প্রকাশ পায়।

৫.৫ কুষ্ঠরোগীর পারিবেশিক তথ্য

সাধারণভাবে পরিবেশের সংজ্ঞার্থ প্রদান করতে হলে বলা যায়— "যে সমগ্র অবস্থাসমূহ, শক্তিসমূহ এবং বস্তুসমূহ জীবনকে পরিবর্তিত অথবা প্রভাবিত করে তাই পরিবেশ" (চৌধুরী–১৯৮৭)। কোনো বিষয়ের উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং তাদের প্রতিফলন বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং নির্দিষ্ট পরিবেশের উপর বিষয়টির একটি সুনির্দিষ্ট কার্যকর গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। ভূগোল এমন একটি বিষয় যা পরিবেশের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে। পরিবেশ দু'প্রকার ; যথা, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ। আলোচ্য গবেষণায় সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা এ ক্ষুদ্র গবেষণায় প্রাকৃতিক পরিবেশের বিস্তৃত বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় নি। মূলত প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ অপরের পরিপূরক। উভয় উভয়কে অনবরত পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন কিছু সৃষ্টি করে।

৫.৫.১ কুষ্ঠরোগীদের বসবাসের স্থান ঃ কুষ্ঠরোগীদের বাসস্থানের অবস্থান এবং ধরন জানার মাধ্যমে তারা কি ধরনের পরিবেশে বাস করে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়। শিক্ষা, পেশা, মাসিক আয় প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকেই কুষ্ঠরোগীরা নিম্ন শ্রেণির। এ থেকে অনুধাবন করা যায় কুষ্ঠরোগীদের বাসস্থানের ধরনও স্বাস্থ্য উপযোগী হওয়ার সম্ভাবনা কম। দেখা যাক নমুনা কুষ্ঠরোগীদের বেলায় এ ধারণা প্রযোজ্য কি–না।

সারণি ৫.২৫ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীদের বাসস্থানের অবস্থান এবং ধরন।

গ্রামীণ			শহরে		
বাসস্থানের ধরন	সংখ্যা	শতকরা	বাসস্থানের ধরন	সংখ্যা	শতকরা
কাঁচা বাড়ি	৯৪	৯১.৩ ৴	বস্তি	১৯	৪৪.২ ৴
পাকা বাড়ি	৬	৫.৮ ৴	আধা–বস্তি	১৬	৩৭.২ ৴
মিশ্র ধরন	৩	২.৯ ৴	আবাসিক	৮	১৮.৬ ৴
মোট	১০৩	১০০ ৴	মোট	৪৩	১০০ ৴

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.২৫ সারণিতে নমুনা কুষ্ঠরোগীদের বাসস্থানের অবস্থান এবং ধরন দেখানো হয়েছে। ১৫০ জন নমুনা কুষ্ঠরোগীর মধ্যে ১০৩ জনই গ্রামের অধিবাসী। ৪৩জন শহরে বাকি ৪জন হাসপাতালের আজীবন সদস্য। গ্রামে অবস্থানরত কুষ্ঠরোগীদের ৯১.৩৴ রোগী কাঁচা বাড়িতে বসবাস করে। বাকি ৮.৭৴ রোগী মোটামুটি বাসের যোগ্য বাড়িতে বাস করে। শহুরেদের মধ্যে ৬২.৮৴ রোগী বস্তি ও আধা–বস্তি ধরনের পরিবেশে বাস করে। এ জরিপের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বলা যায় কুষ্ঠরোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে।

৫.৫.২ বসতবাড়ির নির্মাণ সামগ্রী ঃ বসতবাড়ির নির্মাণ সামগ্রীর মাধ্যমে আরো সূক্ষ্মভাবে প্রকৃত পরিস্থিতি ফুটে উঠবে। বর্ষার স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরতাপ, শীতে হাড়কাঁপানো হিমেল হাওয়া প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই। সব মিলিয়ে কি দুর্বিসহ পরিস্থিতিতেও মানুষ বেঁচে থাকে। বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের কেউ কি তা ভাবে? অথচ বেশিরভাগ সংক্রামক ব্যাধির উৎস শহর এবং গ্রামের এ ধরনের পরিবেশ, যার মাধ্যমে ভাল পরিবেশে বাস করেও পরোক্ষভাবে আক্রান্ত হতে পারে। কারণ রোগের উৎপত্তিতে উপরিউক্ত পরিবেশ সহায়তা করে কিন্তু তারপর মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তখন শিক্ষিত উচ্চবিত্তরাও বাদ পড়ে না। আসলে সবাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তা সরাসরি দেখা যায় না, ফলে কেউ ভেবে দেখে না।

সারণি ৫.২৬ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীদের বসতবাড়ির নির্মাণ সামগ্রির বণ্টন চিত্র।

শহর					গ্রাম				
নির্মাণ সামগ্রী			সংখ্যা	শতকরা	নির্মাণ সামগ্রী			সংখ্যা	শতকরা
ঘেরা	ছাদ	ভিটি			ঘেরা	ছাদ	ভিটি		
প্লাস্টিক	প্লাস্টিক	মাটি	৩	৭.০%	শন/বাঁশ	শন/বাঁশ	মাটি	৫৬	৫৪.৪%
পাকা	টিন	পাকা	১৮	৪১.৯ %	পাট/শন/বাঁশ	টিন	মাটি	৩৭	৩৬.০%
পাকা	পাকা	পাকা	২২	৫১.২ %	টিন	টিন	পাকা	১০	৯.৮%
মোট			৪৩	১০০ %				১০৩	১০০%

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪-৯৫।

৫.৬ কুষ্ঠরোগীদের অর্থনৈতিক তথ্য

মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর তার জীবনধারা নির্ভর করে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশ যেখানে অর্ধেকের বেশি মানুষ বাস করে দারিদ্র্য সীমার নিচে। যারা দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে তাদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে কম, তার সাথে রোগের জীবাণু বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ শুধু কুষ্ঠরোগ নয়, যে কোনো রোগের জন্যই অনুকূল। যে সব রোগ বেশি সংক্রামক তা একবার শহরের বস্তি এলাকায় শুরু হলে কয়েকদিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ডায়রিয়া, জলবসন্ত, ইত্যাদি রোগের নাম উল্লেখযোগ্য। রোগের সংক্রমণ ক্ষমতা খুবই কম। বেশিরভাগ লোকের এ রোগের জীবাণু প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে। তারপরও দুর্ভাগ্য যে বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের মত একটি নিরাময়যোগ্য রোগের স্থানীয় রোগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে । কুষ্ঠরোগের হিসাব অনুযায়ী ভারত এবং ব্রাজিলের মত বিশাল দেশের পরেই বাংলাদেশের স্থান।

৫.৬.১ কুষ্ঠরোগীদের পেশা ঃ ধারণা করা যায় যে, বেশিরভাগ কুষ্ঠরোগীই বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে কৃষক, দিনমজুর, রিক্সাচালক অথবা এমন কোনো কাজে নিয়োজিত যা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এ দেশের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকলেও কৃষি ব্যবস্থা এখনো

উন্নত হয় নি। যান্ত্রিক শক্তির চেয়ে দৈহিক শক্তির উপর নির্ভরশীল বেশি, যা রোগের জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশে সহায়তা করে। কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা আরো বেশি।

সারণি ৫.২৭ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীদের পেশাভিত্তিক বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা
ভিক্ষুক	৫	৩.৩ %
কৃষক	২৭	১৮.০ %
ব্যবসা	১২	৮.০ %
দিনমজুর	১৮	১২.০ %
গৃহবধূ	২৪	১৬.০ %
ছাত্র	১৯	১২.৭ %
চাকরি	১৪	৯.৩ %
বেকার	২১	১৪.০ %
অন্যান্য	১০	৬.৭ %
মোট	১৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.২৭ সারণিতে কুষ্ঠরোগীদের পেশাভিত্তিক বণ্টন চিত্র দেখানো হয়েছে। উপরিউক্ত সারণি অনুযায়ী দেখা যায় যে রোগের পর ভিক্ষুক এবং বেকারে পরিণত হয়েছে তাদের বেশিরভাগই পূর্বে কৃষিকাজের সাথে জড়িত ছিল। যারা দিনমজুর তারাও কম-বেশি কৃষি কাজ করে থাকে। সুতরাং বেকার, ভিক্ষুক, দিনমজুর সব মিলিয়ে কৃষিকাজের সাথে জড়িত কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩.৩%। মহিলাদের একটি বিরাট অংশ গৃহবধূ। এরা কুষ্ঠরোগীর ১৬%। ছাত্র আছে ১২.৭% রোগী। ব্যবসা এবং চাকরিতে নিয়োজিত আছে যথাক্রমে ৮% এবং ৯.৩৩% রোগী। উল্লেখ্য, এদের মধ্যে খুব কমই উচ্চ পর্যায়ের চাকরিতে নিয়োজিত। ব্যবসায়ীরাও উন্নতমানের ব্যবসায়ী নয়। ছোটখাট ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। অন্যান্যদের মধ্যে আছে বয়সে ছোট যারা কাজের উপযুক্ত নয়, এবং যাদের কাজের কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্র নেই।

৫.৬.২ কুষ্ঠরোগীর পরিবারের মাসিক আয় ঃ মাসিক আয় থেকে সম্পূর্ণ পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি অনুমান করা যায়। কুষ্ঠরোগীরা যেহেতু বেশিরভাগ নিম্নমানের পেশার সাথে জড়িত তাদের মাসিক আয় কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পরিবারের অন্য কারো মাধ্যমে মাসিক আয়ের পরিমাণ বেশি হতে পারে। দেখা যাক নমুনা কুষ্ঠরোগীদের ক্ষেত্রে কি হয়।

সারণি ৫.২৮ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীর পরিবারের মাসিক আয়ের বণ্টন চিত্র।

শ্রেণি	সংখ্যা	শতকরা (%)
< ১০০০	১৬	১০.৭%
১০০০–১৯৯৯	৪৬	৩০.৭%
২০০০–২৯৯৯	৩৭	২৪.৭%
৩০০০–৩৯৯৯	১১	৭.৩%
৪০০০–৪৯৯৯	৭	৪.৭%
> ৫০০০	৩৩	২২.০%
মোট	১৫০	১০০.০%

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.২৮ সারণি অনুযায়ী ৬৫% রোগীর পরিবারের মাসিক আয় ৩০০০ টাকার মধ্যে। এদের অনেকেরই বসবাসের অনুপযোগী, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে। ৩০০০–৫০০০ টাকা মাসিক আয়ের মধ্যে আছে ১২% কুষ্ঠরোগী। মাত্র ২২% কুষ্ঠরোগীর মাসিক আয় ৫০০০ টাকার উপরে রয়েছে। এদের পরিবারের লোকসংখ্যা যদি বেশি থাকে তাহলে ৫০০০ টাকা মাসিক আয় হলেও স্বচ্ছলভাবে চলা সম্ভব হয় না। খুব কমসংখ্যক রোগীই পাওয়া গেছে যাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ মাসিক আয় রয়েছে যার মাধ্যমে জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো মিটানো সম্ভব হয়েছে।

৫.৬.৩ কুষ্ঠরোগীর পরিবারের ভূমি সংক্রান্ত তথ্য ঃ ভূমি মানুষকে একটি মৌলিক চাহিদা "বাসস্থানের" নিশ্চয়তা দেয়। ভূমির সাথে আর্থিক অবস্থারও একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তবে ভূমির পরিমাণ বাড়লেই যে আর্থিক অবস্থা ভাল এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ ভূমির মূল্য অনেক ক্ষেত্রেই তার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। সব স্থানের ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং উপযোগিতা এক নয়। তারপরও একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে ভূমির পরিমাণ জানা হয়।

সারণি ৫.২৯ ঃ নমুনা কুষ্ঠরোগীদের ভূমি মালিকানার বণ্টন চিত্র।

পরিবারের ভূমির পরিমাণ	সংখ্যা	শতকরা %
< ১ বিঘা	৪৬	৩০.৭%
১– ২ বিঘা	২১	১৪.০%
২– ৩ বিঘা	৯	৬.০%
৩–৪ বিঘা	৫	৩.৩%
> ৫ বিঘা	২১	১৪.০%
ভূমিহীন	৩৮	২৫.৩%
মোট	১৫০	১০০%

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

নমুনা কুষ্ঠরোগীদের তথ্য অনুযায়ী ২৫.৩% রোগী ভূমিহীন। অর্থাৎ রোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের বাসস্থানের নিশ্চয়তা নেই। ৩০.৭% রোগীর ভূমির পরিমাণ এক বিঘার নিচে। দুই বিঘার মত ভূমি আছে ১৪% রোগীর। মাত্র ১৪% রোগীর পাঁচ বিঘার উপরে ভূমি আছে।

৫.৬.৪ কুষ্ঠরোগীদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা ঃ মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম রয়েছে অন্ন। কিন্তু এই অন্ন জুটানোই বেশিরভাগ কুষ্ঠরোগীর জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। শরীরের জন্য সুষম খাদ্যের কথা কুষ্ঠরোগীদের কল্পনার বাইরে। মানুষের সুস্থ থাকা নির্ভর করে তার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর। আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ভর করে প্রয়োজনীয় পুষ্টিসম্মত খাবারের উপর। সুতরাং রোগীদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা থেকে তাঁদের শারীরিক পুষ্টি পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি ৫.৩০ ঃ কুষ্ঠরোগীদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার বণ্টন চিত্র।

খাদ্য তালিকা	সংখ্যা	শতকরা
তিন বেলা ভাল খাবার	৩১	২০.৭ %
তিন বেলা মধ্য খাবার	৬৫	৪৩.৩ %
দুই বেলা	৫৪	৩৬.০ %
মোট	১৫০	১০০.০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.৩০ সারণি অনুযায়ী দেখা যায় ৩৬% কুষ্ঠরোগী দুবেলা খেয়ে কোনো রকম বেঁচে থাকে। ৪৩.৩% কুষ্ঠরোগী তিন বেলা মধ্যম খাবার খেতে পায়। তিন বেলা ভাল খাবারের জোগাড় হয় মাত্র ২০.৭% রোগীর। এ তথ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে দরিদ্র্যতাই কুষ্ঠরোগের প্রধান কারণ। অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে মানুষের জীবন ধারা পরিবর্তিত হয়। তার আশেপাশের পরিবেশে পরিবর্তন আসে। আর এ কারণেই সম্ভবত উন্নত দেশসমূহে কুষ্ঠরোগ ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেছে।

৫.৭ তিনটি অঞ্চলের তুলনামূলক আলোচনা

তিনটি অঞ্চলের রোগীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তুলনামূলক আলোচনা করা হলে বাংলাদেশের স্থানভিত্তিক কুষ্ঠরোগের কারণ সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যাবে। এ উদ্দেশ্যে রোগীদের শিক্ষা, সামাজিক পরিস্থিতি, বসবাসের স্থান ও বসতবাড়ির ধরন, পেশা এবং পরিবারের মাসিক আয় এ পাঁচটি বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি হিসেবে ধরে সারণিতে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

৫.৭.১ শিক্ষা ঃ শিক্ষার সাথে আর্থসামাজিক উন্নতি, সচেতনতা তথা শারীরিক সুস্থতা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। তাই স্থানসমূহের তুলনামূলক আলোচনায় প্রথমেই শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

সারণি ৫.৩১ ঃ তিনটি অঞ্চলে কুষ্ঠরোগীদের শিক্ষার তুলনামূলক চিত্র।

শ্রেণি	ময়মনসিংহ		ঢাকা		নীলফামারী	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
নিরক্ষর	৩৩	৬৬ %	১৫	৩০ %	২৮	৫৬ %
নামসই	৩	৬ %	৮	১৬ %	২	৪ %
প্রাথমিক	৭	১৪ %	৯	১৮ %	১৭	৩৪ %
মাধ্যমিক	৩	৬ %	১২	২৪ %	১	২ %
উচ্চমাধ্যমিক	২	৪ %	৬	১২ %	০	০
স্নাতক	২	৪ %	০	০	২	৪ %
মোট	৫০	১০০ %	৫০	১০ %	৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.১৩ সারণি অনুযায়ী ঢাকায় কুষ্ঠরোগীদের শিক্ষা পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে ভাল। নীলফামারী এবং ময়মনসিংহের বেশিরভাগ রোগীই সামান্য নামসই করতেও পারে না। নমুনা জরিপে প্রাপ্ত ঢাকার কুষ্ঠরোগীদের শারীরিক পরিস্থিতিও অন্য অঞ্চলের চেয়ে উন্নত। সামগ্রিকভাবে ঢাকার জীবনযাত্রার মান অন্য অঞ্চলের চেয়ে অগ্রগামী বলে তার প্রভাব রোগীদের উপরও পড়েছে। একই কারণে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ ঢাকায় বা অন্যান্য শহর এলাকায় যেভাবে কার্যকর করা সম্ভব এবং যতটা সুফল পাওয়া যাবে গ্রামাঞ্চল বা অন্যান্য দিক থেকে অনগ্রসর স্থানে ততটা পাওয়া যাবে না। সুতরাং এসব বিষয় বিবেচনা করেই যে কোনো পরিস্থিতির উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বেশি কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়।

৫.৭.২ সামাজিক পরিস্থিতি ঃ স্থানানুযায়ী রোগীদের সামাজিক পরিস্থিতিও ভিন্ন হতে পারে। এ বিষয়টি রোগীর আর্থ–সামাজিক, পারিবেশিক অবস্থা এবং তার আশেপাশের পরিবেশের উপর নির্ভর করে। নমুনা কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক পরিস্থিতির স্থানভিত্তিক পার্থক্য দেখে ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি ৫.৩২ ঃ স্থানভিত্তিক কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক পরিস্থিতি।

সামাজিক পরিস্থিতি	ময়মনসিংহ		ঢাকা		নীলফামারী	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
ঘৃণা করে	২৪	৪৮ %	১৪	২৮	২৪	৪৮ %
জানে না বলে কিছু বলে না	১৪	২৮ %	৩৩	৬৬ %	২৩	৪৬ %
মিশ্র মনোভাব	১২	২৪ %	৩	৬ %	৩	৬ %
মোট	৫০	১০০ %	৫০	১০০ %	৪০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.৩২ সারণিতে দেখা যায় ময়মনসিংহ এবং নীলফামারী পরিস্থিতির কিছুটা মিল আছে। ব্যাপকতার হার নীলফামারীতে বেশি হলেও সেখানকার সামাজিক পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ। বেশিরভাগ রোগীই যতদিন সম্ভব রোগ লুকিয়ে রাখে। আর যাদের কথা সবাই জেনে গেছে তাদের বেশিরভাগ রোগীকেই সমাজ ঘৃণা করে। মিশ্র মনোভাব অর্থাৎ মানুষের সহানুভূতিশীল মনোভাব খুব কম। ঢাকার পরিস্থিতি একটু ভিন্ন হওয়ার কারণ হলো শহরের মানুষের জীবনযাত্রার ধরন ভিন্ন। শহরে একে অপরকে খুব কম চিনে তাই বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রেই দেখা যায় কেউ জানে না বলে কিছু বলে না। সামাজিকভাবে কুষ্ঠরোগীরা যে সমাজে ঘৃণিত, অবহেলিত, অবাঞ্ছিত এতে সন্দেহ নেই। কারণ সমাজে অবহেলার ভয়েই রোগীরা কাউকে তার রোগের কথা বলে না।

৫.৭.৩ বসতবাড়ির ধরন ঃ রোগীদের বসতবাড়ির ধরন থেকে পারিবেশিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। স্থানভিত্তিতে বসতবাড়ির ধরনের পার্থক্য হতে পারে। আবার বসতবাড়ির ধরন থেকে রোগীদের আর্থ–সামাজিক অবস্থাও অনুমান করা যাবে। কোন পরিবেশে বসবাসের ফলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তাও এ তথ্য থেকে জানা যাবে।

সারণি ৫.৩৩ ঃ স্থানভিত্তিক কুষ্ঠরোগীর বসতবাড়ির ধরন।

বসতবাড়ির ধরন	ময়মনসিংহ		ঢাকা		নীলফামারী	
গ্রামীণ	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
কাঁচা	৪২	৮৪ %	১১	২২ %	৪৫	৯০ %
পাকা	৩	৬ %	১	২ %	২	৪ %
আধাপাকা	১	২ %	২	৪ %	০	০
বস্তি	১	২ %	১৬	৩২ %	২	৪ %
আধাবস্তি	১	২ %	১৫	৩০ %	০	০
আবাসিক	২	৪ %	৫	১০ %	১	২ %
মোট	৫০	১০০ %	৫০	১০০ %	৫০	১০০ %

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.৩৩ সারণিতে কুষ্ঠরোগীদের স্থানভিত্তিক বসতবাড়ির ধরনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে। ঢাকায় গ্রামীণ এবং শহরে বসবাসের ক্ষেত্রে অন্য দুটি স্থানের চেয়ে বিপরীত পরিস্থিতি বিরাজ করলেও বসতবাড়ির অবস্থা কোনো স্থানের রোগীদেরই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। বেশিরভাগ রোগী গ্রামীণ কাঁচাবাড়ি এবং শহরের বস্তি বা আধাবস্তিতে বসবাস করে।

৫.৭.৪ কুষ্ঠরোগীদের পেশা ঃ স্থানভিত্তিতে রোগীদের পেশার ধরনের পার্থক্য আছে কিনা তা দেখে কুষ্ঠরোগের উপর পেশার প্রভাব সম্পর্কে জানা যাবে। রোগীর পেশা থেকে জীবাণু বসবাসের উপযোগী পরিবেশেরও একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

BANBEIS Library Dhaka

সারণি ৫.৩৪ ঃ কুষ্ঠরোগীর স্থানভিত্তিক পেশার ধরন।

পেশা	ময়মনসিংহ		ঢাকা		নীলফামারী	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
ভিক্ষুক	০		২	৪ ٪	৩	৬ ٪
কৃষক	১৫	৩০ ٪	২	৪ ٪	১০	২০ ٪
ব্যবসা	৪	৮ ٪	৫	১০ ٪	৩	৬ ٪
দিনমজুর	৯	১৮ ٪	৩	৬ ٪	৬	১২ ٪
গৃহবধূ	৬	১২ ٪	৬	১২ ٪	১২	২৪ ٪
ছাত্র	৪	৮ ٪	৭	১৪ ٪	৮	১৬ ٪
চাকরি	০	—	১৩	২৬ ٪	১	২ ٪
বেকার	৮	১৬ ٪	৭	১৪ ٪	৬	১২ ٪
অন্যান্য	৪	৮ ٪	৫	১০ ٪	১	২ ٪
মোট	৫০	১০০ ٪	৫০	১০০ ٪	৫০	১০০ ٪

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

৫.৩৪ সারণি অনুযায়ী দেখা যায় ময়মনসিংহ এবং নীলফামারীতে কৃষক এবং দিনমজুর শ্রেণির পেশার অন্তর্গত লোকজন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয় বেশি। কিন্তু ঢাকার ক্ষেত্রে চাকরিজীবী রোগী বেশি রয়েছে। এ তথ্য অনুসারে বলা যায় কুষ্ঠরোগের জন্য পেশা কোনো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক নয়।

৫.৭.৫ মাসিক আয় ঃ স্থানানুসারে জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য না হলেও মাসিক আয়ের পার্থক্য হতে পারে। বিভিন্ন কারণে ঢাকায় বসবাসরত মানুষের আয় এবং ব্যয় দুটোই বেশি। দেখা যাক কুষ্ঠরোগীর ক্ষেত্রে কি পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

সারণি ৫.৩৫ ঃ স্থানানুসারে কুষ্ঠরোগীর মাসিক আয়ের বন্টন চিত্র।

মাসিক আয়	ময়মনসিংহ		ঢাকা		নীলফামারী	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
< ১০০০	৭	১৪ ٪	২	৪ ٪	৭	১৪ ٪
১০০০–১৯৯৯	১৮	৩৬ ٪	৯	১৮ ٪	১৯	৩৮ ٪
২০০০–২৯৯৯	১০	২০ ٪	১০	২০ ٪	১৭	৩৪ ٪
৩০০০–৩৯৯৯	২	৪ ٪	৮	১৬ ٪	১	২ ٪
৪০০০–৪৯৯৯	৪	৮ ٪	১	২ ٪	২	৪ ٪
৫০০০ >	৯	১৮ ٪	২০	৪০ ٪	৪	৮ ٪
মোট	৫০	৫০ ٪	৫০	১০০ ٪	৫০	১০০ ٪

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

উপরিউক্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি স্থানেই রোগীদের পরিবারের মাসিক আয় এক হাজার থেকে তিন হাজারের মধ্যে বেশি দেখা যায়। ঢাকায় একটু ব্যতিক্রম হলো মাসিক আয় পাঁচ হাজারের উপরে এমন রোগীর সংখ্যা রয়েছে ৪০%।

৫.৮ সারাংশ

এ অধ্যায়ে কুষ্ঠরোগীর উপর পারিবেশিক প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে রোগীদের ব্যক্তিগত তথ্য, রোগ ও আনুষঙ্গিক তথ্য, পারিবারিক ও সামাজিক তথ্য, পারিবেশিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর প্রশ্নপত্র জরিপের ভিত্তিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্যানুযায়ী কর্মক্ষম পুরুষ মানুষ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয় বেশি। রোগীদের মধ্যে শিক্ষার হার খুব কম। রোগ এবং রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে বেশিরভাগ রোগীর কোনো সঠিক ধারণা নেই। সামাজিকভাবে কুষ্ঠরোগীরা অনেক বঞ্চনার স্বীকার। এদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্বাস্থ্যসম্মত নয় এমন পরিবেশে বসবাস করে এবং আর্থিক অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল নয়। স্থানানুযায়ী রোগীদের পেশা, মাসিক আয়, বসবাসের ধরনের পার্থক্য হলেও সামগ্রিক পরিস্থিতি বেশিরভাগ রোগীরই এক। অর্থাৎ দারিদ্র, অপুষ্টি, অসচেতনতা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশই কুষ্ঠরোগের প্রধান কারণ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ সবদিক থেকে কুষ্ঠরোগ প্রসারের সম্ভাবনা রয়েছে। এ রোগ অন্যান্য অনেক রোগের চেয়ে পরিমাণে কম হলেও এর সুদূরপ্রসারী এবং বহুমুখী প্রভাবের জন্যই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পারিবেশিক অবস্থা বিবেচনা করে চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি করা যেতে পারে। উন্নয়নশীল দেশে সব বিষয়ের উপর সার্বিকভাবে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুষ্ঠরোগ প্রসারের নিয়ামক, পরিণতি ও কুষ্ঠ সমস্যা সমাধানের উপায়

৬.১ ভূমিকা

ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যে কোনো রোগের গবেষণায় চারটি স্বাস্থ্য পরিধি মতবাদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। কোনো স্থানের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির সাথে মানব জীববিদ্যা, পরিবেশ, জীবনাচরণ এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিধি–ব্যবস্থা নিবিড়ভাবে জড়িত। আলোচ্য কুষ্ঠরোগের গবেষণায় উপরিউক্ত বিষয়সমূহের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে রয়েছে রকমারি সমস্যা। কুষ্ঠরোগের চেয়ে গ্যাসট্রিক, আলসার, ডায়রিয়া, অ্যানিমিয়া, বিভিন্ন রকমের জ্বরে আমাদের দেশের মানুষ অনেক বেশি আক্রান্ত হয়। দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার এসব রোগের প্রতিও গুরুত্ব দিচ্ছেন। স্বাভাবিক কারণেই ভুক্তভোগী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ব্যতীত কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে খুব কম লোকেই জানে। অথচ সবাই যদি বিশ্বসাস্থ্য সংস্থার কুষ্ঠরোগের জন্য বিপুল সহায়তার কথা জানতো ও ব্যাপক কার্যক্রমে কিছুটা অবদান রাখতো তাহলে অন্যান্য সমস্যা থেকে তুলনামূলকভাবে কম হলেও কুষ্ঠরোগ সমস্যা সমাধান করে উদাহরণ সৃষ্টি করা যেত, যা উন্নয়নশীল দেশের পরবর্তী ব্যাপক সমস্যাসমূহ সমাধানে সহায়ক হতো। আর এক্ষেত্রে শিক্ষিত এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রথমে এগিয়ে আসা প্রয়োজন কেননা বিশ্বসাস্থ্য সংস্থার পক্ষে নিশ্চয়ই সকল সমস্যা সমাধানে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব নয়। স্থানবিশেষে যে কোনো সমস্যার পারিবেশিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি ভিন্ন হবে। যেমন একই সমস্যা ব্রাজিলের মত উন্নত দেশে যেভাবে সমাধান সম্ভব, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, ইথিওপিয়ার ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে তা সম্ভব নয়। একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে শিক্ষায় এবং অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশে যতটা সুফল পাওয়া যাবে অনুন্নত দেশে ততটা আশা করা অমূলক। আলোচ্য গবেষণায় স্বাস্থ্য পরিধি মতবাদ অনুযায়ী দেখা যাক বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের পরিস্থিতি ও পরিণতি কি। কিভাবে এ সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে তারও সংক্ষিপ্ত মতামত প্রকাশ করা হলো।

৬.২ বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগ বিস্তারের নিয়ামকসমূহ

আলোচ্য গবেষণায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কুষ্ঠরোগ বিস্তারের নিয়ামকসমূহ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় মানুষের জীবনাচরণ, প্রাকৃতিক–সামাজিক পরিবেশ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যে কোনো বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। স্থানবিশেষে যেমন রোগের পার্থক্য হয় আবার সময় বা ঋতুবিশেষেও পার্থক্য হতে পারে। যেমন বাংলাদেশের দক্ষিণে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায়শই ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলে ঘ্যাঘ, কুষ্ঠরোগ ও ল্যাথারিজমের প্রকোপ বেশি। আবার চট্টগ্রাম ও সিলেটে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ তুলনামূলকভাবে

বেশি দেখা যায়। এগুলোর পিছনে কারণ হিসেবে বিভিন্ন পারিবেশিক ও জলবায়ুগত বিষয়কে উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সিলেটের জঙ্গলাকীর্ণ জলা–পরিবেশ এবং উপকূলের প্রাকৃতিক দুর্যোগে পানি দূষণের ফলে ঐ সকল অঞ্চলে ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, ঘ্যাঘ, ডায়রিয়া, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ বেশি হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম সিলেটের ঝোপ–জঙ্গলে মশা বসবাসের সুবিধা বেশি। যেহেতু ম্যালেরিয়া মশাবাহিত রোগ তাই উল্লেখিত অঞ্চলে ম্যালেরিয়া বেশি দেখা যায়। উত্তরাঞ্চলের জলবায়ু দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জলবায়ু থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। বৈশাখ মাসে যেখানে দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম, রাতে আবার কুয়াশা পড়ে, এ ধরনের বিপরীতধর্মী পরিবেশ মানব শরীরে নানা রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে যা মানব জীবনাচরণে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। শিক্ষা, পেশা, দারিদ্র্য, পরিবেশ–পরিস্থিতি, এমনকি মানসিক অবস্থাসহ প্রতিটি বিষয় একে অপরের উপর নির্ভরশীল ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। তবে প্রতিটি বিষয় সমানভাবে প্রভাব ফেলে না। বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের উপর যে সকল বিষয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নে দেখানো হলো ।

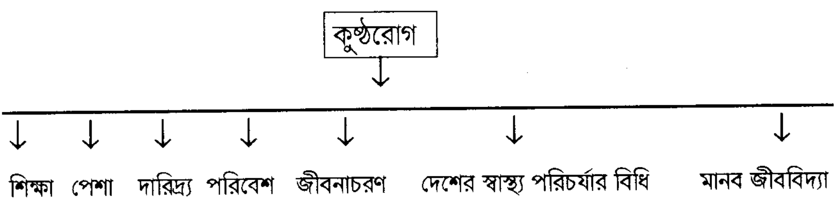

৬.২.১ শিক্ষা ঃ মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। অশিক্ষিত মানুষের সাথে সৃষ্টি জগতের অন্য প্রাণীর পার্থক্য কমই থাকে। সুশিক্ষা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে লাগে। মানুষের উপর শিক্ষার প্রভাবকে নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যায়।

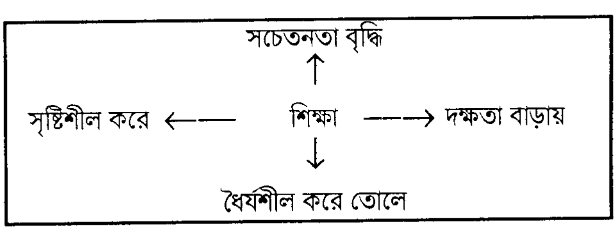

সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি কুষ্ঠরোগসহ অন্য যে কোনো রোগের প্রকোপ ও সংক্রমণ কমাতে সহায়ক হয়।

অব্যাহত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি সাধন করে একটি গতিশীল সমাজ গড়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশে শিক্ষার হার মাত্র ৩১.৪%। কুষ্ঠরোগ এমন একটি রোগ যার জন্য প্রতিটি রোগীকে শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে কুষ্ঠরোগের জন্য নিয়মিত ছয়মাস থেকে নিয়ে দুবছর পর্যন্ত ওষুধ খেতে হয়। প্রতিদিন সম্পূর্ণ শরীর পরীক্ষা করা লাগে কোথাও ক্ষতিগ্রস্ত হলো কিনা। কেননা কুষ্ঠরোগের ফলে অনুভূতিহীন স্থানে কোনো প্রকার আঘাত লাগলে টের পাওয়া যায় না। সর্বোপরি কুঠরোগী অনুভূতিহীন

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়মিত ব্যায়ামের প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যায় প্রত্যেক কুষ্ঠরোগীকে ধৈর্য সহকারে নিজের পরিচর্যা করা প্রয়োজন। অশিক্ষিতদের বেলায় এটি সম্ভব নয় বলেই বেশিরভাগ কুষ্ঠরোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে আবার ফিরে হাসপাতালে আসে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রে শিক্ষা উল্লেখযোগ্য নিয়ামক।

৬.২.২ পেশা ঃ কুষ্ঠরোগ বিস্তারে পেশা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট ও বর্তমান জরিপ থেকে জানা যায় যে, যারা কৃষিকাজের সাথে জড়িত তারাই এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। এর পিছনে দুটি কারণ থাকতে পারে :

(১) আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজে নিয়োজিত।

(২) কুষ্ঠজীবাণু রোগীর শরীরের বাইরে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বা ঘাসের উপর জীবিত থাকতে পারে যা সহজে কৃষিকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। উল্লেখ্য, আমাদের দেশের কৃষি উন্নত দেশের ন্যায় যন্ত্রনির্ভর নয় এবং কৃষি ও কায়িক শ্রমে নিয়োজিত গরিব শ্রমিক শ্রেণির লোক এ রোগের বাহক ও শারীরিকভাবে আহত হয় বলে তাদের ক্ষত দিয়ে সহজেই রোগজীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে।

যে সব মানুষ চা এবং তামাক বাগানে কাজ করে তাদের আঙ্গুল দিয়ে খুঁটে চা পাতা তুলতে হয়। চা এবং তামাক পাতার মধ্যে এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ আছে যা মানুষের শরীরকে দুর্বল করে ফেলে। এসব কাজে হাতের প্রান্তিক স্নায়ুসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে। উপরন্তু সেখানে যদি কুষ্ঠরোগ জীবাণু থাকে তাহলে এ রোগ বিস্তারের একটি অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যায়। এছাড়া যারা এমন কোনো পরিবেশে কাজ করে যা স্বাস্থ্যসম্মত নয় তাদেরও এ রোগ হতে পারে। কেননা যে কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব মূলত নির্ভর করে প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর। মানুষের জীবন্ত কোষসমূহের সাথে পরিবেশের একটি সহাবস্থা বিরাজ করে। ভগ্নস্বাস্থ্য মানব প্রকৃতির এই সমন্বয় প্রক্রিয়ার অসঙ্গতি অথবা বাস্তবগত ভারসাম্যহীনতারই পরিচায়ক। জীবন ধারণের প্রয়োজনে ঐতিহ্যগতভাবে অথবা যোগ্যতা অনুসারে একেকজন একেক ধরনের পেশা বেছে নেয় যা দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং পেশার লোকই আক্রান্ত হবে। কারণ কুষ্ঠরোগ জীবাণু গঠিত রোগ। তবে কিছু পেশার লোক বেশি আক্রান্ত হয়, যা চিহ্নিত করার জন্য আরো ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন।

৬.২.৩ অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ সমাজের সবচেয়ে বড় ব্যাধি দারিদ্র্য। কেননা এমন একটি ব্যাধি অনেকগুলো ব্যাধির জন্ম দিতে পারে। কুষ্ঠরোগের বেলায়ও দারিদ্র্যা ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে ৩৪ শতাংশ মানুষ বাস করে চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে। দেশে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে যে ঘাটতি রয়েছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে দারিদ্র্যের সংখ্যা আরও ব্যাপক হওয়ার আশংকা রয়েছে। ইনডিপেনডেন্ট রিভিউ অব বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট এর ১৯৯৪-৯৫ শীর্ষক এক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৮৫ সালে দেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিল ৪৩.৯ শতাংশ। ৯৪ সালের শেষের দিকে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯.১৫ শতাংশে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি যদি এভাবে ক্রম অবনতিশীলতার দিকে চলতে থাকে তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের উন্নতি আশা করা যায় না। কুষ্ঠরোগ চক্রাকারে দারিদ্র্যের সাথে জড়িত। যেমন —

চরম দারিদ্র্য ⟶ পুষ্টিহীনতা ⟶ কুষ্ঠরোগ জীবাণু আক্রমণ ⟶ কুষ্ঠরোগ ⟶ শারীরিক বিকলাঙ্গতা ⟶ বেকার/কর্মচ্যুত/সমাজচ্যুত।

এভাবে কুষ্ঠরোগীকে দারিদ্র্য আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। একদিকে যেমন কুষ্ঠরোগে দুর্বল লোকেরাই বেশি আক্রান্ত হয় অপরদিকে আক্রান্ত হওয়ার পর দীর্ঘ স্থায়িত্ব এবং শারীরিক অক্ষমতার কারণে চরম দরিদ্র্যতার কবলে পড়ে।

৬.২.৪ পরিবেশগত প্রভাব ঃ প্রকৃতি এবং মানুষ প্রতিনিয়ত একে অপরকে প্রভাবিত করে। প্রাকৃতিক এবং মানবিক পরিবেশের মধ্যে অবিরত পরস্পরকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিজস্ব ছাঁচে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলছে। কুষ্ঠরোগ সম্পর্কিত বিষয়গুলো এই প্রক্রিয়াবহির্ভূত নয়। প্রাকৃতিক ও মানবিক উভয় পরিবেশই অনুকূল এবং প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে। একদিকে মানুষ যেমন ওষুধ আবিষ্কার করে অনুকূল প্রভাব রাখতে পারে তেমনি আবার নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করেও কুষ্ঠরোগ জীবাণু বিস্তারে সহায়তা করতে পারে। নিম্নে কুষ্ঠরোগ বিস্তারে বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাব আলোচনা করা হলো।

৬.২.৪.১ প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী নিয়ামক। আবহাওয়া, জলবায়ু, উদ্ভিদ, মৃত্তিকা এবং পানির মৌলকণাসমূহ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান। বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহের দৈনন্দিন অবস্থা হলো আবহাওয়া এবং কয়েক বছরের গড় ফল হলো জলবায়ু। আবহাওয়া মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসে যেমন মুহূর্তে ধ্বংস করে দিতে পারে মানুষের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত সম্পদ তেমনি আবার দীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষিতে পরোক্ষ প্রভাবও রাখতে পারে। প্রকৃতি মানুষের শত্রু একথা বলা যাবে না বরং প্রকৃতি এবং মানুষের চলার মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে হয় যার ফলে মানুষের জীবনে আসতে পারে অপার সম্ভাবনা। ভারসাম্যহীনতার ফলে নেমে আসতে পারে অপরিমেয় দুর্যোগ। কিভাবে সমঝোতা বজায় রাখা যায় তার জন্য মানুষ তার নিজস্ব মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে সঠিক পথ খুঁজে বের করতে পারে।

কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রে নিরক্ষীয় এলাকার আশেপাশের আবহাওয়া অনুকূল হিসেবে ধরে নেয়া যায়। কারণ ১৯৯৪ সালের বিশ্বের রেজিস্ট্রিকৃত কুষ্ঠরোগীদের ব্যাপকতার হার অনুযায়ী দেখা যায় নিরক্ষরেখা থেকে ৩০° উত্তরে এবং ৩০° দক্ষিণ অক্ষরেখা পর্যন্ত ব্যাপকতার হার পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি। এ অঞ্চলের জলবায়ু সম্পর্কে আলোচনা করলেই অনুমান করা যাবে যে, কি ধরনের আবহাওয়ায় কুষ্ঠরোগ সহজে বিস্তার লাভ করে। তিন ধরনের জলবায়ু উক্ত অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হলো।

নিরক্ষীয় উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু ঃ নিরক্ষরেখার উভয় পাশে ৫° অক্ষাংশ পর্যন্ত এ অঞ্চল বিস্তৃত। এখানে সারা বছর গ্রীষ্মকাল থাকে। প্রচুর জলবায়ু বাষ্পপূর্ণ ঊর্ধ্বগামী বায়ু দ্বারা বছরের সকল সময় এ অঞ্চলে পরিচলন বৃষ্টি হয়। এখানকার গড় উষ্ণতা ২৬.৭° সেলসিয়াস এবং গড় বৃষ্টিপাত ২০০ সেন্টিমিটারের অধিক। অত্যধিক উষ্ণ এবং আর্দ্র বলে এ অঞ্চলে জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর। গিনি উপকূল, কংগো ও আমাজান অববাহিকা, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং মালয়েশিয়ায় এ জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু ঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলের দুপাশে আয়ন বায়ু বলয়ের অন্তর্গত এ জলবায়ু অঞ্চলটি সুদান, মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কিয়দংশব্যাপী বিস্তৃত। এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র এবং শীতকাল শুষ্ক থাকে। নিরক্ষরেখার উত্তরে মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। তবে নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর-দক্ষিণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। এখানে গড় উষ্ণতা ২৯° সেলসিয়াস. থেকে ৩২° সেলসিয়াস এর মধ্যে উঠানামা করে।

মৌসুমী জলবায়ু ঃ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের উত্তর-পূর্বাংশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্পুচিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, দক্ষিণ চীন এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়া মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্গত। মৌসুমী বায়ুর দ্বারা এসব দেশে গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু শীতকালে জলীয়বাষ্পের অভাবে এ বায়ু কোনো বৃষ্টিপাত ঘটাতে সক্ষম হয় না। এ অঞ্চলে শীত-গ্রীষ্মের তাপের তারতম্য অত্যধিক। মধ্য আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পূর্বব্রাজিল, মালাগাসি, পূর্ব এবং পশ্চিম আফ্রিকায় মৌসুমী জলবায়ুর কিছুটা প্রভাব অনুভূত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী এবং আক্রান্ত দেশসমূহের অনুক্রম অনুযায়ী এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে,

(১) মৌসুমী জলবায়ু কুষ্ঠরোগ বিস্তারে অধিক ভূমিকা রাখে।

(২) বৃষ্টিপাতপূর্ণ স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া কুষ্ঠরোগের জন্য অনুকূল।

(৩) কম তামাত্রাবিশিষ্ট অঞ্চল থেকে অধিক তাপমাত্রাবিশিষ্ট অঞ্চলে কুষ্ঠরোগের স্থায়িত্ব বেশি।

জলবায়ুগত এ ধরনের পরিস্থিতির কোনোটি কুষ্ঠরোগ জীবাণু বসবাস এবং বিস্তারে সহায়তা করে আবার কোনোটি মানুষের শরীরে রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। যেমন নিরক্ষীয় এলাকার অত্যধিক উষ্ণ--আর্দ্রতার জন্য এ অঞ্চলের জলবায়ু মানুষের শরীরকে দুর্বল করে ফেলে। দুটি মিলে কুষ্ঠরোগের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হতে পারে।

উদ্ভিদ, মৃত্তিকা এবং পানির মৌলকণাসমূহ কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কিনা এ সম্বন্ধে কোনো গবেষণা হয় নি। তবে পরোক্ষ ভূমিকা বিভিন্নভাবে রাখতে পারে। যেমন উদ্ভিদের পরিমাণ অধিক হলে সেখানে বৃষ্টিপাত বেশি হবে এবং স্যাঁতসেঁতে ছায়াঘন পরিবেশ তৈরি করবে যা কুষ্ঠ জীবাণুর উপযুক্ত আবাসস্থল হতে পারে। মৃত্তিকার কণাসমূহের মধ্যে এমন কোনো পদার্থ থাকতে পারে যাতে কৃষিকাজ করতে গেলে হাত-পায়ের চামড়ার ক্ষতি করতে পারে। ফলে কুষ্ঠ জীবাণু অতি সহজে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। পানি মাটির সাথে মিশে কুষ্ঠরোগ জীবাণুর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পারে। এসব বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে। কুষ্ঠরোগ জীবাণুকে বিভিন্ন স্থানের মাটিতে ছেড়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে কি উপাদানসমৃদ্ধ মাটিতে বেশি সময় টিকে থাকতে পারে। এর সাথে পানির প্রভাবও লক্ষ্য করা যেতে পারে। তাহলে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়, শুধু চিকিৎসকের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। চিকিৎসকের সাথে একজন পরিবেশবিদ, মৃত্তিকাবিদ, পানি বিশেষজ্ঞ, আইনবিদ, সর্বোপরি একজন পরিকল্পনাবিদের প্রয়োজন। তবে কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রে পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। তাই এ বিষয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা সমস্যা সমাধানে সুফল বয়ে আনতে পারবে। এর জন্য সকলের সার্বিক সহযোগিতায় উপযুক্ত ক্ষেত্র আগে তৈরি করে নিতে হবে।

৬.২.৪.২ সামাজিক পরিবেশ ঃ নিতান্তই মানব সৃষ্ট পরিবেশকে সামাজিক পরিবেশ বলা হয়। জনসংখ্যার বিস্তরণ, ঘনত্ব এবং চলাচল, গৃহায়ণ, বসতি, ভোজন-প্রণালী, কৃষি কর্মকাণ্ড, শিল্পায়ন প্রক্রিয়াসমূহ, পেশাগত দুর্যোগ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড — এগুলো সামাজিক পরিবেশের উদাহরণ। প্রশ্নপত্র জরিপ অনুযায়ী দেখা যায় বেশিরভাগ উপাদানই কুষ্ঠরোগকে কমবেশি প্রভাবিত করে। জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং চলাচলের উপর কুষ্ঠরোগের বিস্তার নির্ভর করে। মানুষের চলাচলের মাধ্যমেই পৃথিবীব্যাপী কুষ্ঠরোগ ছড়িয়ে পড়েছে। পরে অবশ্য পরিবেশ এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতির ফলে সম্ভবত দেশসমূহে কুষ্ঠরোগ কমে গেছে। তবে কোথাও এখনো

একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হয় নি, এ ধারণা থেকে বলা যায় কুষ্ঠরোগ জীবাণু তেলাপোকার ন্যায় যে কোনো পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে। যে সব স্থানে প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে অনুকূল সাড়া পাওয়া গেছে সে সব স্থানে ব্যাপকতার হার বেশি রয়ে গেছে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব যেখানে বেশি সেখানে কুষ্ঠরোগী বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা বেশি ঘন এলাকায় একদিকে যেমন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হয় না অপরদিকে রোগ ছড়াতে সহায়তা করে। শহর এলাকা এক্ষেত্রে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শহরের বস্তি এলাকায় এ রোগের প্রকোপ বেশি হতে পারে। সামাজিক সমস্যার কারণে কুষ্ঠরোগী গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। এসব কারণে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণে শহর এলাকার গুরুত্ব বেশি হওয়া উচিত।

গৃহায়ণ, বসতি, ভোজন প্রণালী পরোক্ষভাবে কুষ্ঠরোগের বিস্তার এবং রোগের স্থায়িত্বের সাথে জড়িত। গৃহ অর্থাৎ যেখানে মানুষ বেশিরভাগ সময় ব্যয় করে তা যদি স্বাস্থ্যসম্মত না হয় তাহলে কুষ্ঠ কেন যে কোনো রোগেই স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করতে পারবে। ভোজন প্রণালী সরাসরি সুস্বাস্থ্যের সাথে জড়িত। সুষম খাদ্যের উপর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ভর করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত শারীরিক সুস্থতা এবং অসুস্থতা। এটি একটি পরস্পর নির্ভরশীল প্রক্রিয়া। একে নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যায়।

সুষম খাদ্য ⟶ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ⟶ সুস্থ শরীর।

শিল্পায়ণ প্রক্রিয়া সরাসরি কুষ্ঠরোগের সাথে জড়িত না থাকলেও এর ফলে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণের ফলে উন্নয়নশীল দেশে এ রোগ বিস্তারে কিছুটা প্রভাব রাখতে পারে। আবার এমন অনেক শিল্প আছে যেখানে কাজ করলে মানুষ শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। কৃষিক্ষেত্রে কাজের ফলে কুষ্ঠরোগের উদ্ভব এবং বিকাশ দুটোই হতে পারে।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ কুষ্ঠরোগকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সমাজ কুষ্ঠরোগকে সহজে মেনে নিতে চায় না। এ পরিস্থিতিতে কুষ্ঠরোগীকে কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। সংস্কৃতি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে কুষ্ঠরোগীকে মানসিকভাবে দুর্বল করে ফেলে। সংস্কৃতির মাধ্যমেই রোগীকে সমাজে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কুষ্ঠরোগের উপর বাস্তবধর্মী নাটক, সংগীত রচনা করে প্রচার মাধ্যমসমূহে তা প্রকাশের মাধ্যমে পুরানো কুসংস্কারসমূহ দূর করা যায়।

প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ উভয়ে কুষ্ঠরোগের উপর অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয় দিক থেকে প্রভাব রাখলেও সামাজিক পরিবেশের অনুকূল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এ সমস্যা থেকে আংশিক হলেও মুক্তি পাওয়া যাবে। অপেক্ষায় থাকতে হবে কবে টিকা আবিষ্কার হবে। সামান্য একটি টিকা নিলেই কুষ্ঠরোগের মত দীর্ঘস্থায়ী ভয় থেকে অসহায় মানুষ নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে।

৬.২.৪.৩ জৈবিক পরিবেশ ঃ সংক্রামক রোগ জীবাণুসমূহ, তাদের আবাসস্থল এবং এসব বিষয়ের প্রতি মানুষ কতটা প্রভাবাধীন তা নিয়ে জৈবিক পরিবেশ গঠিত। একজন সংক্রামক কুষ্ঠরোগী প্রতিদিন তার নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে ১০০ মিলিয়ন কুষ্ঠরোগজীবাণু বের করে (ম্যাকডুগাল ও ইয়ালকার-১৯৮৯)। কুষ্ঠরোগ জীবাণু মানুষের শরীর থেকে বের হয়ে ধুলাবালি বা ঘাসের উপর বেশ কয়েকদিন বেঁচে থাকে। এই জীবাণুসমূহ ধুলাবালি এবং বাতাসে প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। আবার কৃষি বা অন্য কোনো কাজ করতে গেলেও প্রবেশ করতে পারে

শরীরের কোনো ক্ষত স্থানের মাধ্যমে। তারপর শরীরের ভিতরে কিভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করে তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। দীর্ঘস্থায়ী এবং নিকটস্থ সংস্পর্শ থেকে কুষ্ঠরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু প্রবণতা বেশি থাকলে অল্পদিনের সংস্পর্শেও যে কোনো ব্যক্তি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হতে পারে। জৈবিক পরিবেশের উপর আরো ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে। তাতে চিকিৎসার নতুন পদ্ধতিও বের হয়ে আসতে পারে।

৬.২.৫ দেশের স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিধিব্যবস্থা ঃ দেশের স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিধিব্যবস্থার উপর সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নির্ভর করে। স্বাস্থ্য রক্ষা পরিচর্যার সরকারি, প্রাকৃতিক, মানসিক ও পরিবেশগত সকল প্রকার সম্পদসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থা, হাসপাতাল সুবিধা, শুশ্রূষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাজনিত ওষুধ, সরকারি এবং সম্প্রদায়গত স্বাস্থ্য পরিচর্যার সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থাদিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন চক্ষুরোগ চিকিৎসা, ডায়াবেটিক হাসপাতাল, ক্যান্সার চিকিৎসা ইত্যাদি যে কোনো স্বাস্থ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এর আওতায় পড়ে।

বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের বিধিব্যবস্থায় কিছুদিন পূর্বেও সরকারিভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ঢাকা, সিলেট এবং নীলফামারীতে মোট তিনটি হাসপাতাল ছিল সরকারিভাবে কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা কেন্দ্র। বর্তমানে বেসরকারিভাবে সারাদেশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকটি কুষ্ঠরোগ হাসপাতাল এবং কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা কেন্দ্র। বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলনে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের অঙ্গীকারের মাধ্যমে বর্তমানে সরকারিভাবে কিছু কাজকর্ম চলছে। এর সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকেও অঙ্গীভূত করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যাপক উদ্যোগ কুষ্ঠরোগ নিরাময়ে অনুকূল প্রভাব ফেলবে। দীর্ঘদিনের অবহেলা এবং গুরুত্বহীনতার কারণে কুষ্ঠরোগ একটি কম সংক্রামক ব্যাধি হলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। সম্পূর্ণভাবে বিনা পয়সায় কুষ্ঠচিকিৎসা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এ ধরনের সুযোগ কতদিন দেয়া সম্ভব হবে তা সময়ের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা লাগবে। কিন্তু সমস্যা হলো এত সুবিধা পেয়েও কুষ্ঠরোগীরা স্বতস্ফূর্তভাবে চিকিৎসা গ্রহণ করে না সামাজিকতার ভয়ে। এখানেই মানসিক পরিস্থিতি যে একটি বড় নিয়ামক তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

৬.২.৬ জীবনাচরণ ঃ জীবনধারণ স্বভাবতই ব্যক্তি বিশেষের সমষ্টিগত এমন একটি সিদ্ধান্ত যার উপর ঐ ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকে। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তসমূহ স্বাস্থ্যরক্ষায় ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী সিদ্ধান্তসমূহ আসলে স্ব-আরোপিত একটি ঝুঁকি যার পরিণতিতে অকালে পীড়া অথবা মৃত্যু ঘটতে পারে। যেমন — মাদকাসক্তি, ধূমপান, ওষুধ তৈরি, এবং তার অপব্যবহার, মানসিক বিকারগত ওষুধের প্রতি নেশা, শরীরচর্চার অনীহা ইত্যাদি। অন্যদিকে যে ধরনের সিদ্ধান্তে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যার ফলে ব্যক্তি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, সেগুলো হলো পুষ্টি নিয়ন্ত্রণ, সুষম খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান ত্যাগ, সুশৃংখল জীবন ব্যবস্থা অনুশীলন প্রভৃতি।

জীবনাচরণ কুষ্ঠরোগ আক্রমণের পূর্বে যেমন প্রযোজ্য তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে আক্রান্ত হয়ে পড়ার পর। আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে অনির্ধারিত জীবনাচরণ হয়তো রোগ আক্রমণে একটি প্রধান নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রাখে। কিন্তু আক্রমণের পর রোগীকে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলতে হয়। রোগীকে নিয়মিত স্বাস্থ্যশিক্ষা অনুযায়ী তার শরীর পরীক্ষা করার সাথে সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যায়াম করতে হয়। ইচ্ছা করলেই কুষ্ঠরোগী যে কোনো পরিবেশে যে কোনো ধরনের কাজ করতে পারে না। দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্মেও তাকে বিশেষ

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এজন্য অনেকে কুষ্ঠরোগকে শিক্ষিত এবং স্বচ্ছল লোকদের অসুখ হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারণ এ রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে রোগীকে রোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আবার সে খুব শক্ত ধরনের কাজ করতে পারবে না, যা তার শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। অনুভূতিহীনতা সৃষ্টি করে বলেই রোগীকে সদা সতর্ক থাকতে হয়। যে কোনো রোগের ক্ষেত্রেই জীবনাচরণ একটি উৎকৃষ্ট নিয়ামক। তবে কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রে এ নিয়ামকের ভূমিকা যেন আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। বেশিরভাগ কুষ্ঠরোগীই সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী মানতে পারে না বলে কিছুদিন পর আবার আক্রান্ত হয়। দরিদ্র রোগীরা ইচ্ছা করলেও সব বিধিনিষেধ মানতে পারে না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন সঠিক পুনর্বাসন ব্যবস্থা।

৬.২.৭ মানব জীববিদ্যা ঃ মানব জীববিদ্যা স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রাকৃতিক এবং মানসিক উভয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, যা মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে বিকাশ লাভ করে। বংশানুগতি, বয়সের ভার এবং মানব শরীরের বহু জটিল অভ্যন্তরীণ তন্ত্রের সাথে বিষয়টি জড়িত। কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রে বয়সের ভার নয়, শুধু বয়স কিছুটা ভূমিকা রাখে। ছোট শিশুদের কুষ্ঠরোগ কম দেখা যায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন পরিবেশে কাজকর্ম এবং বেশি মানুষের সাথে মেলামেশার ফলে এ রোগ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বংশানুক্রমিকভাবে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কেননা রোগীদের উপর গবেষণার তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় বেশিরভাগ রোগীর পূর্ব পুরুষদের কারো কুষ্ঠরোগ ছিল না। যেহেতু কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে তাই পরিবারে কারো থাকলে অন্যদেরও হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে যে নেই তা বলা যায় না। শরীরের অভ্যন্তরীণ জটিল তন্ত্রের সাথে যোগাযোগ ঘটিয়ে কুষ্ঠরোগজীবাণু স্নায়ুতন্ত্রের প্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে আক্রমণ করে। প্রকৃতি এবং মানুষ উভয়ের ভারসাম্যহীনতার বহিঃপ্রকাশ হলো শারীরিক সুস্থতা এবং অসুস্থতা। মানুষ প্রকৃতির সাথে বোঝাপড়া করেই যতদিন সম্ভব সুস্থভাবে টিকে থাকবে।

৬.৩ কুষ্ঠরোগের পরিণতি

কুষ্ঠরোগের ভয়ঙ্কর পরিণতির কারণেই পরিমাণে অন্যান্য অসুখের তুলনায় কম হলেও এ রোগ সারা বিশ্বে বর্তমানে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এমন প্রত্যক্ষ এবং বহুমুখী ফলাফল কম বিষয়েই দেখা যায়। নিম্নলিখিতভাবে কুষ্ঠরোগের পরিণতি দেখানো যেতে পারে :

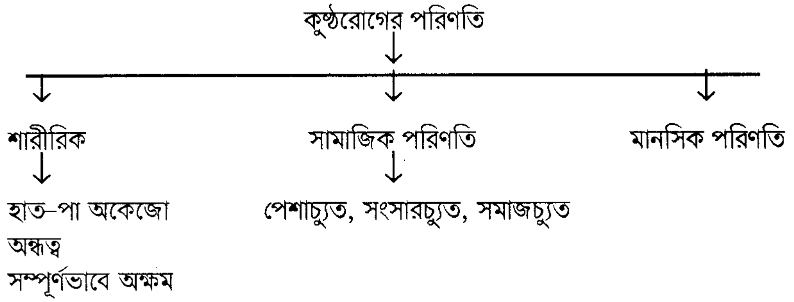

সব ধরনের পরিণতির পরিপূর্ণ উদাহরণ—জলছত্র হাসপাতালের আজীবন সদস্য হৃদয় চন্দ্র। যার হাত-পা সবই অকেজো, চোখে দেখে না, সারাদিন আপন মনে বকবক করে। এ পৃথিবীতে আপনজন কেউ আছে কিনা সে জানে না। হাসপাতালের ছোট একটি নির্দিষ্ট রুম তার জন্য বরাদ্দ।

৬.৩.১ শারীরিক পরিণতি ঃ কুষ্ঠরোগ হাত, পায়ের প্রান্তিক স্নায়ুসমূহ প্রথম আক্রমণ করে। পূর্বে এ রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না বিধায় ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেত হাত–পা। চোখ আক্রমণ করলে নষ্ট হয়ে যেত চোখ। মোটকথা কুষ্ঠরোগজীবাণু মস্তিষ্কে বা হৃদপিণ্ডের ন্যায় এমন কোনো শারীরিক অংগ আক্রমণ করে না যাতে মানুষ তাড়াতাড়ি মারা যাবে। বরঞ্চ তাকে বাঁচিয়ে রেখে কিভাবে ভোগানো যায় সে সব অঙ্গসমূহ ধীরে ধীরে আক্রমণ করে। শারীরিক অক্ষমতার ফলে কুষ্ঠরোগী সমাজের বোঝা হয়ে পড়ে। তার পক্ষে আয়ের কোনো পথ খোলা থাকে না। উপরন্তু এমন বিকৃত চেহারায় পরিণত হয়, যা দেখলে সাধারণ মানুষ ভয়ে আঁতকে উঠে।

শারীরিক পরিস্থিতির কারণেই সমাজে কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে বর্তমানে কুষ্ঠরোগ ভাল হয়ে যায়, পূর্বের মত এখন আর অঙ্গ বিকৃতি বা কুৎসিত চেহারা হয় না, এ বিশ্বাস মানুষ স্থাপন করতে পারছে না। আর রোগ হয়েছে জানলেই তাকে সমাজ থেকে বের করে দেয়া হয়, চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। একটু ভাবার বা জানার অবকাশ নেই কুষ্ঠরোগ পরিস্থিতির বর্তমানে কি অবস্থা। দীর্ঘদিনের স্থায়ী এ পরিস্থিতি রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। বর্তমানে শারীরিকভাবে অতোটা বিকলাঙ্গ হয় না কেননা রোগ লুকানোর আর কোনো উপায় না থাকলে হাসপাতালে যেতে হয়। কার্যকর ওষুধ প্রয়োগে বিকৃতি ঘটে না। বিশেষ করে মুখমণ্ডল বিকৃতি এখন কম দেখা যায়। তবে ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় সাময়িকভাবে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হলেও ওষুধ খাওয়া শেষ হলে তা আর থাকে না।

কুষ্ঠরোগের শারীরিক পরিণতি অন্য সব পরিণতির সূচনা করে। তাই প্রথমে শারীরিক মারাত্মক পরিণতি যেমন হাত–পা অকেজো, অন্ধত্ব ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য দ্রুত রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করাই একমাত্র ব্যবস্থা।

৬.৩.২ সামাজিক পরিণতি ঃ প্রতিটি পরিণতি আন্তঃসম্পর্কিত। শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে রোগ বিস্তারের ভয়ে এবং সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে সংসারে তার কোনো মূল্য থাকে না। বেশিরভাগ কুষ্ঠরোগী কুষ্ঠরোগ হাসপাতালকে তাদের জন্য নিরাপদ স্থান মনে করে। বর্তমানে ওষুধ আবিষ্কারের ফলে এবং বিভিন্ন স্থানে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ফলে এ সম্পর্কে সামাজিক ভীতি কিছুটা কমেছে। ১৯৮৭ সনের পূর্বে কয়েকটি আইনের উল্লেখ করা হলে কুষ্ঠরোগের সামাজিক পরিণতি কতটা ভয়াবহ ছিল তা অনুমান করা যাবে।

(১) খ্রিস্টান এবং মুসলমান বিবাহ আইনে যথাক্রমে ১৯২২ এবং ১৯৩৯ সালে কুষ্ঠরোগীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদিত ছিল। যদিও পার্সি আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদিত ছিল না।

(২) ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে কুষ্ঠরোগী কোনো সম্পত্তির মালিক হতে পারতো না। এমনকি তার উত্তরসূরিরাও কোনো সম্পত্তির মালিক হতে পারবে না, কেননা সামাজিকভাবে সে মৃত।

(৩) ১৯৩৯ সালের যানবাহন আইনে কুষ্ঠরোগীকে ড্রাইভিং লাইসেন্সের অনুমতি দেয়া হতো না।

(৪) ১৯৮০ সালের ভারতীয় রেলওয়ে আইনে কুষ্ঠরোগীদের অন্যান্য যাত্রীদের সাথে ট্রেনে উঠতে দেয়া হতো না। যদিও চিকিৎসার জন্য তাদের একস্থান থেকে আরেক স্থানে যাওয়ার জন্য বিশেষ সুবিধা দান করা হতো।

(৫) জমি অধিকার, ভোটাধিকার এমনকি কার্যে নিয়োগ আইনে কুষ্ঠরোগীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল (Koticha-1990)।

উল্লিখিত আইনসমূহ থেকে সহজে অনুমান করা যায় কুষ্ঠরোগের পরিণতি কতটা ভয়াবহ ছিল। অবশ্য ওষুধ আবিষ্কারের পূর্বে কুষ্ঠরোগের যে দীর্ঘ স্থায়ী পরিণতি ছিল তার জন্য এমন আইন প্রয়োগ করা অমূলক ছিল না। তবে পৃথিবীতে আর কোনো রোগ সম্পর্কে আইন তৈরির এমন জরুরি প্রয়োজন এবং প্রয়োগ বোধ হয়েছে কিনা তা সঠিক বলা যায় না।

৬.৩.৩ মানসিক পরিণতি ঃ কুষ্ঠরোগী মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিভিন্ন কারণে। এ রোগ হওয়ার সাথে সাথে তার ভিতরে সর্বক্ষণ একটি প্রচণ্ড ভয় কাজ করে। প্রথমে সে রোগ লুকিয়ে রাখে এবং চিকিৎসাও এড়িয়ে চলে। শারীরিকভাবে তখন এমন পরিস্থিতি দাঁড়ায় যখন আর লুকানোর কোনো উপায় থাকে না। রোগ প্রকাশের সাথে সাথে রোগী কার্যক্ষেত্রে, আবাসস্থল এমনকি পুরো সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। সমাজে টিকে থাকার জন্য কিছু করে নিজের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকবে সে উপায় থাকে না। সমাজে সাহস করে বের হবে তারও কোনো পথ থাকে না। কেননা নাক বসে, চোখের পাপড়ি পড়ে গিয়ে এক বিকৃত চেহারার অধিকারী হয় কুষ্ঠরোগী। সর্বক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মানসিকভাবে আর সুস্থ থাকতে পারে না। উল্লেখ্য, শিক্ষিত কুষ্ঠরোগীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বেশি। কারণ তারা নিজেদের সম্পর্কে বেশি সচেতন। অথচ শিক্ষিত সচেতন কুষ্ঠরোগীরাই এ রোগ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

৬.৩.৪ পেশাগত পরিণতি ঃ কুষ্ঠরোগ পেশার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রান্তিক স্নায়ুসমূহ আক্রমণের ফলে শারীরিক খাঁটুনির উপর নির্ভরশীল তেমন কোনো কাজই কুষ্ঠরোগী করতে পারে না। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ যেখানে কৃষিকাজে নিয়োজিত অথচ হাত–পা আক্রান্ত কুষ্ঠরোগীদের কৃষিকাজ কোনো মতেই করা ঠিক নয়। কৃষিকাজের ফলে রোগীরা দু–দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যথা ঃ

(১) অনুভূতিহীন স্থানে ঘা হতে পারে এবং
(২) পুনরায় জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

কৃষিকাজ ছাড়া রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, দিনমজুর এ ধরনের কোনো শক্ত কাজই রোগী করতে পারে না। অথচ কুষ্ঠ এমন রোগ নয় যে অল্প সময়ে সেরে যাবে। তাই বেশিরভাগ কুষ্ঠরোগী হয় বেকার না হয় অনন্যোপায় হয়ে ভিক্ষা বৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়।

৬.৪ বাংলাদেশে কুষ্ঠ সমস্যা সমাধানের উপায়

কুষ্ঠ হলো একটি জটিল এবং বহুমুখী সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে চিকিৎসাবিষয়ক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সবদিক থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশে এখনো এমডিটি প্রয়োগ ব্যতীত অস্ত্রোপাচারজনিত সুবিধা সহজলভ্য নয়। তাই এ ব্যাপারে চিকিৎসকদের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। রোগ চিহ্নিতকরণ থেকে পুনর্বাসন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন। সামাজিকভাবে রয়েছে এ রোগের চরম পরিণতি। দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ভাঙ্গা সহজ নয়। তার উপর জ্বরের মত রোগ যেমন দু'মাস পর আবার হলে কেউ কিছু মনে করে না কিন্তু দীর্ঘ দু–বছর ওষুধ খাওয়ার দু–মাস পর আবার হলে মানুষের বিশ্বাস ভেঙ্গে যাওয়াটা স্বাভাবিক অথচ জীবাণুর আক্রমণে পুনরায় কুষ্ঠ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এ সমস্যা সমাধানে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ নেয়া যেতে পারে।

৬.৪.১ সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঃ কুষ্ঠরোগ একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। খুব ধীরগতিতে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। নিঃশব্দ ঘুণপোকার ন্যায় কুষ্ঠরোগ মানুষকে সহজে মেরে ফেলে না তবে নিঃশেষ করে ফেলে। ক্যান্সার নামক দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে অনেক চিন্তা–ভাবনা চলছে, এইডস নামক সম্প্রতি আবির্ভূত রোগ নিয়ে বিশ্বজুড়ে হৈ চৈ। অথচ কুষ্ঠ

নামক অতি প্রাচীন একটি দুর্বিসহ ব্যাধি নিয়ে কয়েক বছর পূর্বেও কোনো পরিকল্পনা ছিল না। সম্প্রতি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বদৌলতে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যক্রম চলছে যার লক্ষ্য হলো দুই হাজার সালের মধ্যে কুষ্ঠরোগ ব্যাপকতার হার প্রতি দশ হাজারে একজনে কমিয়ে আনা হবে। প্রশ্ন হলো ব্যাপকতার হার কোথায় কত আছে তার নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই। এ ধরনের কোনো জরিপ এখনো চালানো হয় নি। কোথায়, কখন, কেন, কিভাবে, কি পরিমাণ কুষ্ঠরোগ সমস্যা বিরাজ করছে তা আগে নির্ণয় করতে হবে। মোটকথা, একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার ন্যায় প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। তারজন্য নিম্নলিখিত উপায়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

সমস্যা সমাধানের ইচ্ছা

↓

সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ

↓

সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ

↓

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

স্মরণ রাখতে হবে সমস্যা চিরকাল থাকবে। শুধু সমস্যার ধরন পাল্টায়। আর পরিকল্পনা হলো চক্রাকার প্রক্রিয়ায়। একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আরো নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। সেসব সমস্যা সমাধানের জন্য আবার পদক্ষেপ নিতে হবে। পূর্ব থেকেই গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যতের সমস্যাসমূহের অগ্রিম অনুমান করা যেতে পারে! উন্নত দেশসমূহে তাদের পরবর্তী বংশধরদের কথা পূর্বেই চিন্তা করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উন্নয়নশীল দেশে বর্তমান প্রজন্মের মৌলিক চাহিদা মিটানোই সম্ভব হচ্ছে না। একই সমস্যা কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে সব রোগে অহরহ মানুষ মারা যাচ্ছে তার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। কুষ্ঠরোগের মত একটি সুদূরপ্রসারী কুফল নিয়ে পূর্বে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। বর্তমানে যে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে চলছে তাতে হাম, পোলিও, টিটেনাসের ন্যায় সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা সামান্য টিকার মাধ্যমে এ রোগ সারানো যাচ্ছে না। যে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ব্যবস্থা তা একজন সচেতন সক্ষম মানুষের পক্ষেও পালন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। আক্রান্ত রোগীদের শারীরিক, আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে চিকিৎসা ব্যবস্থা নেয়া উচিত। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল রোগী কেন বিনা পয়সায় ওষুধ নিবে। আবার বেশি আক্রান্ত এলাকায় যেমন পদক্ষেপ নেয়া হবে কম, আক্রান্ত এলাকায় একই রকম পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন নাও হতে পারে। বর্তমানে যে ধরনের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলছে ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিকল্পনার কার্যকারিতা অচল হয়ে যেতে পারে। যেমন, ভবিষ্যতে টিকা আবিষ্কারের ফলে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আবার বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে অনুমানের চেয়ে বেশি রোগী চিহ্নিত হলে সে সমস্যা সমাধানে নতুন পরিকল্পনা নিতে হবে। এভাবে পরিস্থিতি, সময়, সুযোগ অনুসারে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ উপযোগিতা পাওয়া যেতে পারে। কুষ্ঠরোগ সমস্যা সমাধানের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সবচেয়ে জরুরি পদক্ষেপ।

৬.৪.২ শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ঃ প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুফল লাভের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। কুষ্ঠ একটি জটিল রোগ যা থেকে রক্ষা পেতে প্রথম রোগীকে কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে জানতে হবে। তারপর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। একজন রোগী তার রোগ সম্পর্কে জেনে পরামর্শ অনুযায়ী না চললে কোনোমতেই তাকে সুস্থ রাখা সম্ভব নয়। এছাড়া রোগ

সম্পর্কে যে ভীতি বর্তমানে আছে তা দূর করতে হলে প্রথমে রোগ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা অর্জন করতে হবে। তা না হলে মানসিকভাবে রোগী বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। আর শিক্ষা শুধু কুষ্ঠরোগীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না। সমাজে সকলের এ রোগ সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা থাকলে এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় রোগীরই শিক্ষার প্রয়োজন বেশি। রোগী যখন শিক্ষিত হবে তখন সে নিজের অধিকার সম্পর্কে বুঝতে পারবে। তাকে তখন সমাজ কোনোভাবেই ঠকাতে পারবে না। শিক্ষার মাধ্যমে সবাই সবার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে। সুতরাং কুষ্ঠরোগীকে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে সুস্থ থাকতে হলে প্রয়োজন তার শিক্ষার। শিক্ষার মাধ্যমে সমস্ত বাধাবিপত্তিকে সে অতিক্রম করতে পারে।

(১) প্রতিদিন শরীরের অনুভূতিহীন স্থানসমূহ পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। তার সার্বিক চিকিৎসা চলছে কিনা তাও জানতে পারে। যেমন—

(২) সামাজিকভাবে অবহেলিত হলে সে তার সঠিক প্রতিবাদ করতে পারে।

(৩) নিজেই চিন্তাভাবনা করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভর হতে পারে।

(৪) আত্মবিশ্বাসের জন্য সে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারবে।

অতএব বলা যায় কুষ্ঠরোগ সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় শিক্ষার বিস্তার। যদিও যে কোনো সমস্যার সমাধানেই সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষা শুধু কুষ্ঠরোগীই নয় এ সমস্যা সমাধানে উচ্চ পর্যায়েও আরো ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কারণ এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এখনো সম্পন্ন হয় নি। বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬.৪.৩ সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে ঃ রোগ নির্ণয় এবং সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগ নিরাময়ে উত্তম ভূমিকা রাখা যেতে পারে। কুষ্ঠরোগের সাথে অন্যান্য রোগের মিল থাকায় এ রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসকদের কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হয়। অবশ্য এটি তাদের অজ্ঞতার জন্য নয়। বরং কুষ্ঠরোগের ধারণাগত অভাবে এমনটি ঘটে। পূর্বে কুষ্ঠরোগের উপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হতো না। বর্তমানে কুষ্ঠরোগের উপর জাতীয় পর্যায়ে কিছুটা আলোচনার ফলে চিকিৎসকদের দৃষ্টি সেদিকে পড়েছে। রোগ নিরাময়ে প্রথম পদক্ষেপ হলো রোগ নির্ণয়। প্রশ্নপত্র জরিপে এমন অনেক রোগী পাওয়া গেছে যারা একাধিক ডিগ্রিধারী ডাক্তারের বারবার চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করতেই এত বেশি সময় চলে গেছে যে ততদিন ক্ষতির পরিমাণ হয়ে গেছে অনেক বেশি। উদাহরণ হিসেবে শম্ভুগঞ্জ হাসপাতালের জনৈক রোগীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রোগ নির্ণয়ে তার যে অর্থ ও সময় ব্যয় হয়েছে তাতে বর্তমানে সে নিঃস্ব। সময়ের সাপেক্ষে তার পায়ের আঙ্গুল নষ্ট হয়ে গেছে। রোগ ধরা পড়ার পর তার সংসার ভেঙ্গে গেছে। বর্তমানে মানসিক ভারসাম্যহীন একজন কুষ্ঠরোগী। রোগ নির্ণয়ের জন্য প্যাথলজিক্যাল টেস্টের ব্যাপারে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বালতি টেস্টের মত অবস্থাও কোথাও কোথাও আছে। অথচ এ পরীক্ষার উপর রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। দায়িত্বজ্ঞানহীন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কারণে অজ্ঞ সহজ সরল মানুষগুলো অনেক বেশি ভোগে। এ ব্যাপারে ডাক্তারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের একটু হুঁশিয়ার হলেই সুফল পাওয়া যেতে পারে।

৬.৪.৪ সমাজের সচেতন এবং ক্ষমতা সম্পন্নদের সেচ্ছায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঃ দেশের জনসংখ্যার তুলনায় সরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবাদান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। সরকারি হাসপাতালের অব্যবস্থা সত্ত্বেও দরিদ্র জনসাধারণের চিকিৎসা প্রদানের আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। লক্ষণীয়ভাবে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেসরকারি ক্লিনিক, মিনি হাসপাতাল

গড়ে উঠলেও দরিদ্র এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণি সেখানকার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। শুধু সরকারের পক্ষে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বিত্তবান শ্রেণি যদি বেসরকারি খাতে বড় বড় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নিতেন এবং কম মুনাফায় সেবার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতেন, তাহলে অনেক বঞ্চিত মানুষ চিকিৎসা সুবিধা পেত। সরকার উদ্যোক্তাদের বিশেষ উৎসাহ প্রদান করতে পারেন, যাতে করে ছোট ছোট চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। কুষ্ঠরোগের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার এই পরিস্থিতির সাথে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাও একীভূত করা হয়েছে। এতে কতটা সুফল বয়ে আনবে তা সন্দেহজনক। বিদেশী অনুদানে পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কতদিন আমাদের দেশে কাজ করে যাবে তাও সচেতন নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বেসরকারিভাবে উদ্যোগ নিয়ে স্কুল কলেজেই ছাত্র-ছাত্রীদের এ ধরনের সমাজসেবামূলক কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থী অবস্থায়ই তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যেতে পারে। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবানদের আয়ের একটা অংশ সমাজসেবামূলক কাজে ব্যয় করতে পারে। কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণে শুধু সরকার নয় বিশ্বের সাথে একত্রে কাজ করার এখনই চূড়ান্ত সময়। সামাজিক অস্থিরতার কারণে উন্নতির ক্ষেত্রে যে স্থির অবস্থা বিরাজ করছে প্রথম সেবা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাস আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব যা পরবর্তীতে অন্যান্য খাতের উন্নয়নে সহায়তা করবে। জরিপ কাজে বেকার ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে লাগানো যেতে পারে। সচ্ছল ব্যক্তিরা হাসপাতাল এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে পারে। কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক এবং মানসিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও সচেতন সম্প্রদায় অবদান রাখতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রামের মান্যবর ব্যক্তিগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের ভূমিকাও কম নয়।

৬. ৪. ৫ কুষ্ঠরোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ঃ বর্তমানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে কুষ্ঠরোগীদের পুনর্বাসন প্রয়োজন। ওষুধ আবিষ্কারের পূর্বে শুধু আবাসিকভাবে পুনর্বাসন করাই ছিল প্রধান কাজ। সময় এবং পরিস্থিতি অনুসারে পূর্ব নির্ধারিত আইনসমূহ বর্তমানে পরিবর্তিত হয়েছে। যুগের পর যুগ ধরে সমাজচ্যুত এ রোগীদের সমাজে গৃহীত করতে বিভিন্ন রকম পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেগুলো সহজলভ্য করে দিতে হবে। উক্ত কাজে প্রথম প্রয়োজন কুষ্ঠরোগ যে সেরে যায় এ বিশ্বাস মানুষের মনে স্থাপন করা। সরকারি এবং বেসরকারিভাবে তাদের শারীরিক, মানসিক, আর্থিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। ধীরে ধীরে পরিকল্পিত উপায়ে এ ধরনের কার্যক্রম চলতে থাকলে অন্যান্য রোগের ন্যায় কুষ্ঠরোগও একটি সাধারণ রোগ হিসেবে পরিগণিত হবে। এক্ষেত্রে ড্যানিশ-বাংলাদেশ লেপ্রসি মিশনের পুনর্বাসন ব্যবস্থাকে উদাহরণ হিসেবে ধরে নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। দেশের সর্বত্র প্রয়োগযোগ্য পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অনুকূল সাড়া পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

৬.৪.৫.১ পেশাগত পুনর্বাসন ঃ কর্মক্ষম কুষ্ঠরোগীদের পেশাগত পুনর্বাসন সবচেয়ে জরুরি। সমাজে টিকে থাকার জন্য একটা উপযুক্ত পেশা সবাই আশা করে। কুষ্ঠরোগীদের তাদের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে পেশা বেছে নিতে হয়। ড্যানিশ-বাংলাদেশ লেপ্রসি মিশনে রোগীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, পুঁজি এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রদান করে পুনর্বাসনে একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা চলছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। ব্যাপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। বর্তমানে রোগীদের সেলাই, কৃষি, কাঠ মিস্ত্রির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অথচ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের যে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে-এ ধরনের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তারা দ্রুত সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো। এতে কৃষি এবং কাঠ মিস্ত্রীর কাজে যে শারীরিক ঝুঁকি রয়েছে তার সম্ভাবনা অনেক কম। চাকরিচ্যুত হয়ে

কুষ্ঠরোগীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

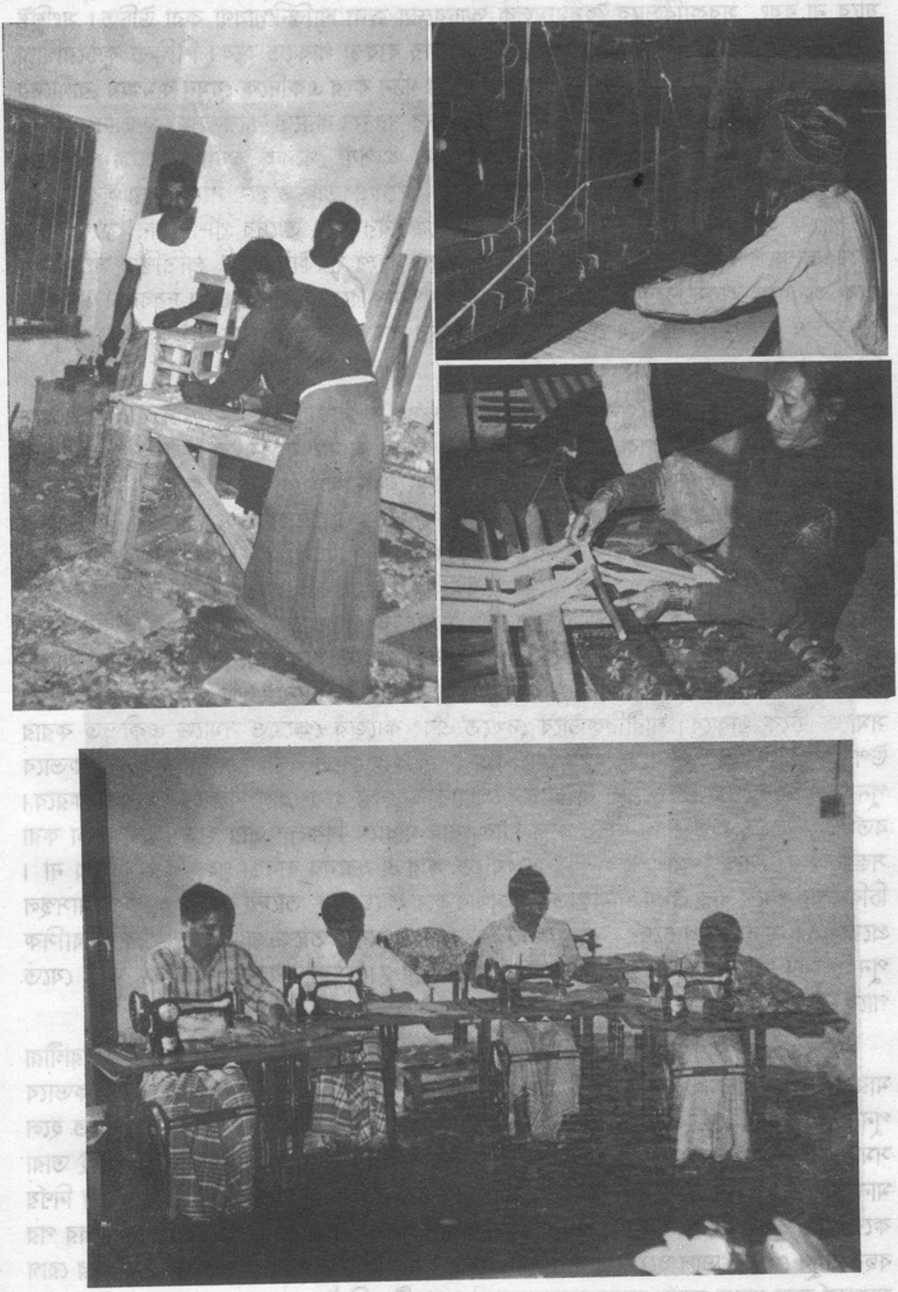

উৎস : প্রশ্ন পত্র জরিপ, ১৯৯৪-৯৫ ও কুষ্ঠরোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই থেকে সংগৃহীত।

কুষ্ঠরোগীরা সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ে। বর্তমানে কোনো ক্রমেই কুষ্ঠরোগীদের চাকরিচ্যুত করা যাবে না বরং সরকারিভাবে বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য শাস্তি ঘোষণা করা উচিত। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কুষ্ঠরোগীদের চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষিত কুষ্ঠরোগীরা সমাজে গা-ঢাকা দিয়ে না থেকে উন্নয়নমূলক সংস্থা গঠন করে একদিকে যেমন কর্মক্ষম রোগীদের কাজের ব্যবস্থা করতে পারে অন্যদিকে দুস্থ রোগীদের সাহায্য করতে পারে, সমাজে আনতে পারে ব্যাপক পরিবর্তন। পেশাগতভাবে পুনর্বাসিত হলে আপনা থেকেই অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে। রোগীরা ফিরে পাবে আত্মবিশ্বাস। সবদিক থেকে বিতাড়িত হয়ে সচেতন রোগীরাই বেশি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রথম এ ধরনের রোগী খুঁজে বের করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে কাজে লাগাতে হবে। সুদূরপ্রসারী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারি এবং প্রতিষ্ঠিত সংস্থাসমূহ একে অপরকে অনুসরণ করে না। সরকারি ব্যবস্থাপনায় রয়েছে আরো চরম দুরবস্থা। ড্যানিশ-বাংলাদেশ লেপ্রসি মিশনে যে পেশাগত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিয়েছে তা অনুসরণ করলে সুফল পাওয়া যেত।

৬.৪.৫.২ আবাসিক পুনর্বাসন ঃ কার্যকর ওষুধ আবিষ্কারের প্রায় পনের বছর পার হয়ে গেছে এবং প্রয়োগের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও আমাদের সমাজে কুষ্ঠরোগীর ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেয়ার নজির রয়ে গেছে। তাকে গ্রামের এক কোনে থাকার ব্যবস্থা করে সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হয়। সমাজের ভয়ে আত্মীয়স্বজনও কুষ্ঠরোগীকে সহায়তা করে না। রোগের কারণে বাবা তার আদরের সন্তানকে ঘর থেকে বের করতে দ্বিধাবোধ করে না। একমাত্র সন্তানকে হাসপাতালে রেখে গিয়ে আর খোঁজ করে না। বৃদ্ধা মা' কে একবার দেখতে আসার প্রয়োজন বোধ করে না তার সন্তান। কলেজ পড়ুয়া ছাত্র তার সামাজিক পরিণতির কথা চিন্তা করে দিশেহারা। এদেরকে তাদের নিজস্ব স্থানে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক রোগী আছে যাদের নিজস্ব কোনো আবাস নেই। নির্দিষ্ট থাকার জায়গা বা নির্দিষ্ট কোনো পেশা নেই যার মাধ্যমে সে সমাজে টিকে থাকবে। শারীরিকভাবে দেখতে এবং কাজের ক্ষেত্রেও সমাজে একীভূত করার উপায় না থাকলে শান্তি গ্রামের ন্যায় কুষ্ঠ পল্লী তৈরি করা যেতে পারে। এদেরকে আবাসিকভাবে পুনর্বাসন করে নিয়মিত খেয়াল না রাখলে আবার আক্রান্ত হয়ে রোগ বিস্তারে সহায়তা করবে। বর্তমানে যেহেতু দ্রুত রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসার মাধ্যমে বিকলাঙ্গতার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে সেহেতু আশা করা যায় ভবিষ্যতে আর এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা লাগবে না। চিকিৎসার আগে যারা এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে গেছে শুধু তাদের জন্যই পৃথক আবাসস্থল প্রয়োজন। তাছাড়া অন্যদের যে যেখানে আছে সেখানেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করে আবাসিক পুনর্বাসনের সমাধানের সাথে সামাজিক এবং রোগীর মানসিক অবস্থাও পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৬.৪.৫.৩ সামাজিক ও মানসিক পুনর্বাসন ঃ সামাজিক এবং মানসিকভাবে কুষ্ঠরোগীরা মারাত্মকভাবে নির্যাতনের স্বীকার হয়। তাই কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক এবং মানসিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করতে হলে সমাজে তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েই তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে শারীরিক বিকলাঙ্গতার পূর্বে রোগ নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ ভাল হয়ে যায় এ ধারণার উপর। রোগীরা বছরের পর বছর ওষুধ খেয়েও ভাল হয়ে যায় এ বিশ্বাস তারা অর্জন করতে পারে নি। কারণ রোগীদের রোগ সম্পর্কে ভাল ধারণা অর্জন করার জন্য সামান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা নেই। রোগীদের বুঝতে হবে যে অনুভূতিহীন স্থানে ওষুধ খাওয়ার পর অন্য কোনো আঘাতের ফলে ঘা

শান্তি গ্রাম কুষ্ঠরোগীদের আবাসিক পুনর্বাসন ব্যবস্থা
ড্যানিশ–বাংলাদেশ লেপ্রসি মিশন, নীলফামারী

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫ ।

হতে পারে। এর সাথে কুষ্ঠরোগ জীবাণুর কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। কুষ্ঠরোগের মাধ্যমে এ জটিল বিষয়সমূহ সমাজে বুঝাতে দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে সম্ভব নয়। যে সব সচেতন রোগীরা রোগ সেরে যাবার পর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের দেয়া সুযোগ সুবিধার সহায়তায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক পুনর্বাসনে এগিয়ে আসতে পারে। গ্রহণযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করে সবস্থানে তা অনুসরণ করতে পারলে কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক পুনর্বাসনকে ত্বরান্বিত করা যেত। সংশ্লিষ্ট সব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেই 'দ্রুত রোগ চিহ্নিতকরণের' কোনো বিকল্প নেই। সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য অঙ্গ বিকৃতি একটি প্রত্যক্ষ বাধা হিসাবে কাজ করে। বাহ্যিক চেহারার কোনো ক্ষতি না হলে সমাজে মিশে যেতে তেমন অসুবিধা হয় না।

সামাজিক এবং শারীরিক উভয়দিক থেকে অবহেলিত হয়েই কুষ্ঠরোগীরা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। মানসিক সুস্থতার জন্য পরিবারের ভূমিকা প্রথমেই প্রয়োজন। পরিবারের সদস্যরা যদি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে এবং রোগ সম্পর্কে জেনে রোগীর শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার জন্য এগিয়ে আসে তাহলে সমাজে পুনর্বাসন সহজ হবে। অথচ বিপরীত পরিস্থিতিই বেশি দেখা যায়। রোগ ধরা পড়ার সাথে সাথে তাকে আলাদা থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তার খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড় সবকিছু যখন সাধারণের চেয়ে ভিন্ন হয়ে যায় তখন রোগীর মনে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এসব ব্যাপারে দরিদ্র রোগীরা ইচ্ছা করলেও পারে না। স্বল্প জ্ঞানের জন্য একটু সচ্ছল এবং শিক্ষিত পরিবারই বেশি নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে ।

শারীরিক অসুস্থতার সাথে মানসিক অসুস্থতার একটা সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। তার সাথে সামাজিক প্রভাব পড়লে তা আরও জটিল হয়ে পড়ে। এছাড়া পরিবারের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা মানুষের মানষিক সুস্থতা টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নহয়ে অনেক বেশি হাসপাতালে আশ্রয় নেয়। পরিবার এবং সমাজ থেকে তারা হাসপাতালকেই নিরাপদ আশ্রয় মনে করে। দীর্ঘদিনের বিরূপ সামাজিক অভিজ্ঞতার স্বীকার হয়ে কতিপয় বৃদ্ধ কুষ্ঠরোগী কখনোই বাড়ি ফিরে যেতে রাজি নয়। অনেকেই আছে বর্তমানে তাদের কোনো ঠিকানা জানা নেই। বহু বছর আগে হাসপাতালে কেউ এনে রেখে গেছে, আর কোনোদিন কেউ আসেনি তার খোঁজ নিতে। ছেলে নিশ্চয়ই তার মাকে হাসপাতালে দীর্ঘদিন রেখে স্বস্তিতে থাকতে পারে না। সমাজের ভয়ে সে তার মাকে কাছে রাখতে পারে না। আবার পরিবারের একজনের রোগের জন্য সমস্ত পরিবারকে ঘরে করে দেয়ার নজিরও আছে। নদীতে পর্যন্ত গোসল করতে দেয়া হয় না। রাস্তাঘাটে চলতে পরিচিত জনদের কটুক্তি এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পিছনে লেলিয়ে দেয়া হয়। গ্রামের সবাই মিলে ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে এ ধরনের রোগীও পাওয়া গেছে।

সামাজিক, শারীরিক, পারিবারিক পরিস্থিতি কুষ্ঠরোগ হিসেবে যতটা জটিল নয় তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল করে তুলেছে। তবে শারীরিক পরিণতিই এ ধরনের সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এ ভীতি প্রাচীন হলেও কুষ্ঠরোগের গবেষণায় বিলম্ব ঘটিয়েছে। বর্তমানে গবেষণার বহুধাপ অগ্রসর হওয়ার পরও শিক্ষিত সচেতন মানুষ এ বিভাগে কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করে। সবদিক থেকে সামাজিকভাবে এগিয়ে আসলেই একদিন কুষ্ঠরোগ সমস্যার সমাধান হবে।

৬.৪.৬ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে ঃ একটি বিষয়ের সাফল্যজনকভাবে উত্তরণের পিছনে অনেকগুলো নিয়ামক কাজ করে। কোনোটা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে আবার কোনোটার পরোক্ষ সহযোগিতাই পর্যাপ্ত ভূমিকা রাখতে পারে। দক্ষ জনশক্তি এমন একটি নিয়ামক যা প্রতিটি কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। কুষ্ঠরোগ একটি জটিল বিষয় হিসেবে এক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি যদি

দক্ষতার সাথে কাজ করে তাহলে দ্রুতগতিতে সহজভাবে সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ড্যানিশ–বাংলাদেশ লেপ্রসি মিশন একটি উদাহরণ হতে পারে। সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলেছে যে, হাসপাতাল সীমানায় প্রবেশ করলেই বুঝা যায় এখানে নিপুণ হাতের পরিচালনায় সব কাজ আপন গতিতে চলছে। রোগীরা এখানে আসলে সাময়িকভাবে হলেও কিছুক্ষণ তাদের সব যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারে। কিছু কুষ্ঠরোগীকে সেখানে কাজেও নিয়োগ করা হয়েছে। আশ্রয়হীন কুষ্ঠরোগীদের জন্য আছে শান্তি গ্রাম। আছে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সেখানেই কিছু রোগী পাওয়া গেছে যারা সমাজে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিটি কার্যক্রমে আছে আধুনিকতার ছোঁয়া। দেশের অন্য কয়েকটি স্থানে কাজ করার পর সেখানে গিয়ে মনে হলো একটি প্রতিষ্ঠানের ভাল দিকসমূহ অন্যরা কেন অনুকরণ করে না। হতে পারে অনেক বাধাবিপত্তি রয়েছে, যা অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন আন্তরিক ইচ্ছা।

ড্যানিশ–বাংলাদেশ লেপ্রসি মিশনের মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে আছে দক্ষতার ছাপ। ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রতিটি কার্যক্রমের আছে সূক্ষ্ম হিসাব। চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসনের ব্যবস্থাসহ প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঐ প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ভবিষ্যতে আরো ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। স্বস্তির ব্যাপার হলো অন্তত একটি প্রতিষ্ঠান আছে যার কাজ আশাব্যঞ্জক। তুলনামূলকভাবে সরকারি কার্যক্রম অনেক বেশি স্তিমিত। এর পিছনে বহু কারণ জড়িত যেগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৬.৪.৭ সততা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে ঃ বিশ্বের অন্যান্য স্থানের কথা বাদ দিলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে কোনো বিষয়ে সততা এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করার সাথে ফাঁকিবাজি যে এ জাতির উন্নতির প্রধান বাঁধা তা উপলব্ধি করা উচিত। সবাই রাতারাতি বড় হতে চায়। সমাজের সাথে যারা তাল মিলাতে পারছে না তারা টিকে থাকতে পারছে না। এমন কোনো বিভাগ এ দেশে নেই যেটা দুর্নীতিমুক্ত। দরিদ্র জনসাধারণের জন্য দেয়া বিনামূল্যের ওষুধ অবাধে বাজারে বিক্রি করে একশ্রেণির লোক অর্থের অধিকারী হচ্ছে। যখন সে ওষুধগুলো চুরি করে তখন যদি একবারও ভাবতো তার এ ওষুধের অভাবে একটি শিশুর মৃত্যু হতে পারে, একজন মানুষ নিঃসম্বল হতে পারে, তাহলে কেউ এ ধরনের কাজ করতে পারে না। থানা হাসপাতালের স্টোরকিপার, স্কুল, কলেজের কেরানিরা আর্থিকভাবে বেশি সচ্ছল। সবদিকে চিন্তা করতে গেলে এ দেশের ১২ কোটি মানুষের মধ্যে কতজন মানুষ দুর্নীতিমুক্ত তা চিন্তা করার সময় এসে গেছে। সততা এবং সাধনার মাধ্যমে শুধু কুষ্ঠ কেন, সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নিয়ে যে কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব। তবে ভারসাম্যহীনভাবে কোনো কাজ চলতে পারে না। কোনো সম্ভাবনার যদি সদ্ব্যবহার না করা হয় তাহলে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায় না। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণে যে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতার উপর নির্ভর করছে কার্যক্রমের সাফল্য। এর জন্য প্রয়োজন সমাজের সকলের সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে সক্রিয় সহযোগিতা।

৬.৫ সারাংশ

কুষ্ঠরোগের মত পরিকল্পিত উপায়ে যথেষ্ট পরিমাণ সময় নিয়ে শুধু রোগ কেন মানুষের অন্য কোনো শত্রুই এতটা ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তাই এ সমস্যা সমাধানে সে রকম সূক্ষ্ম পরিকল্পিত নিয়মে অগ্রসর হতে হবে। মানুষ প্রকৃতি থেকে কি শিক্ষা নেয় এবং কি ধরনের

প্রতিক্রিয়া করে টিকে থাকে ভূগোলে এটি একটি পরীক্ষামূলক বিষয়। কুষ্ঠরোগকে একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র হিসেবে ধরে নিয়ে মানুষ কিভাবে এখানে জয়ী হবে সেটাই দেখার বিষয়। আর সে জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত গবেষণা এবং উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। আলোচ্য অধ্যায়ে তারই বিশদ ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রশ্নপত্র জরিপ, পর্যবেক্ষণ এবং রোগীদের সাথে আলাপ আলোচনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ অধ্যায় রচিত। ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কুষ্ঠরোগের নিয়ামকসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সামাজিক নিয়ামকসমূহই বেশি নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। রোগীদের সাথে আলাপ করে এ রকম একটি ব্যাপক সমস্যা ক্ষুদ্র গবেষণার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুস্পষ্ট প্রভাব চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি। সারাদেশে সম্ভব না হলেও চিহ্নিত কয়েকটি স্থানের সূক্ষ্ম গবেষণার মাধ্যমে সব ধরনের নিয়ামকসমূহ খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। তখন সমস্যা সমাধান আরো সহজ হবে।

সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার

ভূমিকা

সুস্বাস্থ্য একটি সামগ্রিক সম্পদ। এই সম্পদ বাস্তব্যগত ভারসাম্যের সাথে সম্পর্কিত। ভগ্নস্বাস্থ্য বাস্তব্যগত ভারসাম্যহীনতারই পরিচায়ক। ভূগোলের মুখ্য বিষয় হচ্ছে সমাজের মানুষ এবং তার স্থানীয়ভাবে পরিবর্তনশীল পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়া (Mackinder-1887)। সুতরাং মানুষের স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিষয়ের উপর ভৌগোলিক অবস্থার একটি ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র রয়েছে। উন্নত দেশগুলো ইতোমধ্যে এসব বিষয়ে ভৌগোলিক পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে সুফল লাভ করেছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতি, পারিবেশিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অবস্থাসহ সামাজিক উন্নয়নে ভূগোল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৭.২ উপসংহারীয় বক্তব্য

কুষ্ঠরোগ শুধু বাংলাদেশেই নয় বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা। নিরক্ষরেখার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে কুষ্ঠরোগের প্রকোপ বর্তমানে বেশি রয়েছে। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতির কারণে বিশ্বের দেশগুলোতে কুষ্ঠরোগ কমে গেছে। বর্তমানে আক্রান্ত দেশগুলোর বেশিরভাগই অনুন্নত। বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতা বেশি। ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা অঞ্চলেও যথেষ্ট পরিমাণ রোগী রয়েছে। দেশের সীমান্ত এলাকা এবং তুলনামূলকভাবে উঁচু পাহাড়-পর্বত ও বনাঞ্চলে বেষ্টিত এলাকায় কুষ্ঠরোগের প্রকোপ বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

মানুষের শারীরিক সুস্থতার সাথে তার চারপাশে পরিবেশের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এ সত্যটি হিপোক্রেটিস বহু বছর আগে উপলব্ধি করতে পারলেও মাঝে বেশ কিছু সময় এ বিষয়টি নিয়ে তেমন ভাবনা হয় নি। তারপর ধীরে ধীরে উন্নত দেশগুলো এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে। এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো মানব কল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার ফলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভূগোলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বেশ কয়েকটি দেশে ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, অ্যানিমিয়া প্রভৃতি রোগের ব্যাপকতার হার ম্যাপের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। মূলত ভূগোল বিভিন্ন রোগের স্থানিক ও কালিক পরিবর্তনের বন্টন চিত্র মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরে এবং প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন রোগকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

আলোচ্য গবেষণায় ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কুষ্ঠরোগের উপর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে আলোচনা করা হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রথমেই কুষ্ঠরোগের পরিচিতি, ইতিহাস, লক্ষণ, শ্রেণিবিভাগ, সংক্রমণ প্রবণতা, রোগের জীবাণু, চিকিৎসা ব্যবস্থা, কুষ্ঠরোগের ফলাফল এবং এ বিষয়ের উপর পরিচালিত গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে

এখনো সমাজে কুসংস্কারপূর্ণ নানারকম ভুল ধারণা বিরাজ করছে। মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি (Mycobacterium Leprae) নামক জীবাণু আক্রমণে এ রোগ হয়। ১৮৭৩ সালে নরওয়ের জীবাণুতত্ত্ববিদ কুষ্ঠরোগ জীবাণু আবিষ্কার করেন। অধিক জীবাণু বহনকারী মাল্টিব্যাসিলারী রোগী এ রোগ ছড়ানোর প্রধান উৎস। একটি দীর্ঘস্থায়ী জটিল রোগ হলেও কুষ্ঠরোগের গবেষণায় অনেক সময় লেগে যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০০ বছরের ইতিহাসেও এ রোগের উল্লেখ আছে। ধারণা করা হয় ভারতে কুষ্ঠরোগের প্রথম সূচনা হয়। তারপর বিভিন্ন কারণে সারাবিশ্বে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। কুষ্ঠরোগ নির্ণয়ের একটি বিশেষ সমস্যা হলো এর সাথে আরো অনেকগুলো রোগের সামঞ্জস্যতা। তবে শরীরের বিভিন্ন স্থানের অনুভূতিহীনতা এ রোগের প্রধান লক্ষণ। অল্প সময়ের মধ্যে ধরা পড়লে কুষ্ঠরোগ শরীরের তেমন ক্ষতি করে না। তা না হলে বিকলাঙ্গতা, অন্ধত্ব, বিকৃত চেহারা সৃষ্টি করে শারীরিক, সামাজিক, মানসিক সবদিক থেকে রোগীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ রোগের বিস্তার রোগীর সংক্রমণ ক্ষমতা, সুস্থলোকের রোগ হবার প্রবণতা, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে এবং রোগ সম্পর্কে সচেতনতার অভাবের উপর নির্ভর করে। কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা শুধু ওষুধ সেবন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে রোগ সারানো সম্ভব নয়। সাথে সাথে কুষ্ঠরোগ প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ব্যায়াম, প্রয়োজনানুযায়ী অস্ত্রোপচার, পেশাগত চিকিৎসা, সর্বোপরি রোগীকে রোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদানের উপর রোগ সেরে উঠা নির্ভর করে। কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং ফলাফল দুটোই এখনো অত্যন্ত জটিল পর্যায়ে রয়েছে। তাই এ রোগ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলেও একেবারে নির্মূল করা বর্তমানে সম্ভব নয়। যতদিন পর্যন্ত টিকা আবিষ্কার সম্ভব না হলেও অন্তত চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজ না হবে ততদিন এ সমস্যা সমাধানের জটিলতা থেকেই যাবে।

বর্তমানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে সারাবিশ্বেই এ বিষয়ে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হচ্ছে। এ সংস্থার ১৯৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ৭৯ টি দেশে ২.৪ মিলিয়ন কুষ্ঠরোগী রয়েছে। ১৯৮০ সালের পূর্বে ড্যাপসন নামক একটি ওষুধ ব্যবহারে কার্যকর ফলাফল না পেয়ে ১৯৮২ সাল থেকে তিনটি ওষুধ একত্রে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দশ বছর এ ওষুধের প্রয়োগের ফলে বিশেষ ফলাফল পেয়ে এ ধরনের বহু ওষুধ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ১৯৯৩ সালের হিসাব অনুযায়ী ৫৬ মিলিয়ন রোগী ভাল হয়ে গেছে। রেজিস্ট্রিকৃত রোগীর সংখ্যা ১৯৯৪ সালে ১.৭ মিলিয়ন থেকে ১৯৯৫ সালে ৫.৪ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। ১৯৯১ সালের বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলনে গৃহীত পদক্ষেপ অনুযায়ী কাজ করার ফলেই এত দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে। এ পরিকল্পনা কার্যক্রম শুধু বহু ওষুধ প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। রোগী চিহ্নিতকরণসহ কার্যক্রমে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার বিশেষ দল এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা সহায়তা করছে।

বিশ্বে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ধাপে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রথমেই বিশেষ কৌশল গ্রহণ করা হয়, কেননা এ রোগ বিভিন্ন দেশে এমনকি দেশের ভিতরেও কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সমভাবে বিন্যস্ত নয়। ১৯৯৪ সালের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের মাত্র ছয়টি দেশে ৮২% রোগী রয়েছে। কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের কৌশলকে বাস্তবসম্মত করার জন্য পূর্বপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে প্রথমে প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়। তারপর মূল কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সাথে সমর্থনমূলক ব্যবস্থা রেখে সকল কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হচ্ছে। মূল কার্যক্রমের আক্রান্ত দেশসমূহের প্রথমেই রোগীর সংখ্যার ভিত্তিতে ছ'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রয়োজনীয়তা, পরিস্থিতি এবং সময়ানুযায়ী কাজের অগ্রগণ্যতা বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দ করা হয়। সব কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পদ্ধতি গবেষণা, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, বাস্তবসম্মত গবেষণা এবং ভবিষ্যৎ

নির্দেশনার ব্যবস্থা করে যৌথ কর্মকাণ্ডের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কুষ্ঠরোগের বর্তমানে অঞ্চলভিত্তিক পরিসংখ্যানিক তথ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ব্যাপক কার্যক্রমে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতার-হারের ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি হাজারে ২.৫ জন কুষ্ঠরোগী রয়েছে। ১৯৬৫ সাল থেকে বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের উপর কাজ করা হয়। ১৯৮৫ সালের পূর্বে শুধু ড্যাপসন নামক একক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হতো। যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশে Mycobacterial Disease Contorl (M. B. D. C.) নামক প্রকল্প গঠন করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি উভয় সংস্থা যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশ অনুসারে সব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯৩ সালে Further development of TB and leprosy control services নামক জাতীয় প্রকল্প গঠন করা হয়। বর্তমানে ১০০% রোগীকে বহু ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। নতুন রোগীর সংখ্যার সাথে আরোগ্য লাভ করা রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ-কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল সহযোগিতামূলক ব্যবস্থার উপরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার পরিকল্পনায় রয়েছে।

এ গবেষণা কাজের প্রধান অংশ হলো বিভিন্ন স্থানের কুষ্ঠরোগীদের উপর প্রশ্নপত্র জরিপ করা। এ জরিপের মাধ্যমে রোগীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, পারিবেশিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়। ফলাফলে দেখা যায় ৬৭% রোগী বিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে পাওয়া গেছে। ধর্মের তেমন কোনো প্রভাব আলোচ্য গবেষণায় পাওয়া যায় নি। পুরুষ রোগী মহিলাদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ পাওয়া গেছে। ৫০.৭% রোগীই নিরক্ষর। সামান্য নামসই এবং প্রাথমিক শিক্ষা রয়েছে মাত্র ৩০.৭% রোগীর। উচ্চশিক্ষিত রোগী পাওয়া যায় নি বললেই চলে। নমুনা রোগীদের বেশিরভাগই হাসপাতালের আশেপাশের এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। তবে অন্য স্থানের রোগীও পাওয়া গেছে। সামাজিক অবহেলার ভয়ে সচেতন রোগীরা স্থানীয় হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণ করে না। দেশের সকল স্থানে এখনো চিকিৎসা সুবিধা গিয়ে পৌঁছায় নি বলেও রোগীরা অনেক দূর থেকে এসে চিকিৎসা করে।

রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এবং রোগীদেরও স্পষ্ট ধারণা না থাকা এ সমস্যা সমাধানের একটি বিরাট অন্তরায়। পূর্বে চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না বিধায় দীর্ঘদিন রোগীদের এ রোগে ভুগতে হতো। নমুনা রোগীদের ৪২.৭% এক থেকে পাঁচ বছর যাবৎ কুষ্ঠরোগে ভুগছে। এক বছরের কম সময় ধরে যারা আক্রান্ত তাদের বেশিরভাগই বর্তমানে গুরুত্ব সহকারে পরিচালিত কার্যক্রমে স্বাস্থ্যকর্মীদের চেষ্টায় ধরা পড়েছে। এখনো বিভিন্ন হাসপাতালে বহুবছর যাবৎ অসুস্থ রোগী রয়েছে। অসুস্থ হওয়ার পরও রোগ ধরা পড়তে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। কুষ্ঠরোগ চিহ্নিতকরণেও রয়েছে একটি বড় সমস্যা। ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে ৭৩% রোগী ধরা পড়েছে। আত্মীয়-প্রতিবেশীর এ রোগ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় মাত্র ২২% রোগী তাঁদের মাধ্যমে চিহ্নিত করা গেছে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সীমিত। তারা এখনো গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার, কবিরাজদের উপর নির্ভর করে থাকে। আধুনিক যুগের এ পর্যায়েও মাত্র ৩৯.৩% রোগী প্রথমে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বাকি ৬১% পূর্বে বিভিন্ন চিকিৎসায় সুস্থ না হয়ে অবশেষে হাসপাতালে স্মরণাপন্ন হয়েছে। এখানে আসার পর রোগীকে কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা দেয়ার পরও তারা রোগের কারণ সম্পর্কে সঠিক উত্তর দিতে পারে না। মাত্র ২৯.৩% রোগী বলেছে এ রোগ জীবাণু দ্বারা হয়, ৬৩.৩% রোগী উত্তর দিয়েছে তারা জানে না কেন কুষ্ঠরোগ হয়। অন্যান্যরা মিশ্র মনোভাব প্রকাশ করেছে। নমুনা রোগীদের রোগের

প্রধান লক্ষণ ছিল শরীরের বিভিন্ন স্থানের দাগ। এমন রোগী পাওয়া গেছে ৫৫.৩%। ফোসকা বা গোটা জাতীয় লক্ষণ বাংলাদেশে খুব কম বলা যায়, কেননা এ জাতীয় রোগী পাওয়া গেছে মাত্র ৭.৩%, শরীরে ঘা এবং অনুভূতিহীন লক্ষণ ছিল ৩৭.৩% রোগীর। মূলত যেসব স্থানে ঘা হয়েছে সেসব স্থান পূর্বেই অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছিল যে রোগী বুঝতেই পারে নি। সাধারণত হাত–পায়ের আঙ্গুল প্রথম অনুভূতিহীন হয়ে যাওয়ার পর কোনো শক্ত কাজ করতে গিয়ে ঘা হয়ে যায়। কুষ্ঠরোগ ভাল হয়ে যায় কি না সে সম্পর্কে কিছু রোগীরা এখনো সন্দিহান। ৬৮.৭% রোগীর মতে এ রোগ সেরে যায়। ২৬.৭% রোগী বলেছে এ রোগ সারে না। তবে রোগীদের একটি প্রশংসনীয় দিক হলো ৯৬% রোগী নিয়মিত সেবা গ্রহণ করে। অন্যরা বেশিরভাগই সামর্থ্য অথবা হাসপাতালের দূরত্বের কারণে নিয়মিত সেবা গ্রহণ করতে পারে না। ১৫ মাইলের বেশি দূরে হাসপাতাল অবস্থিত এমন রোগী নমুনা জরিপে রয়েছে ৩২.৭%। এতদূর থেকে রোগীদের সেবা গ্রহণ বাস্তবে কষ্টকর বটে। তার মধ্যে শারীরিক বিকলাঙ্গতা থাকলে আরো বেশি অসম্ভব হয়ে পড়ে। কুষ্ঠরোগের বংশানুক্রমিকতার প্রশ্নে দেখা যায় ৮৫.৩% রোগীর পরিবারে এমনকি দূর সম্পর্কের কারো এ রোগ নেই। নমুনা জরিপের কুঠরোগীদের ৫২.৭% রোগী বিকলাঙ্গ নয়। বিকলাঙ্গদের বেশিরভাগ পায়ে সমস্যা রয়েছে। হাত, পা, চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়া রোগীরা বহু বছর যাবৎ রোগে ভুগছে। অবশ্য প্রথম থেকেই চিকিৎসা না করার ফলে এমন অবস্থা হয়েছে। এমন রোগী পাওয়া গেছে যে ভয়ে ২০ বছর ধরেই ওষুধ খাচ্ছে বা যখনই কোনো সমস্যা হয় ডাক্তারের কাছে এসে পরামর্শ অনুযায়ী চলছে। আবার অশিক্ষিত অজ্ঞ রোগীরা কয়েক বছর অসুখে বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। রোগের কারণে যাদের পেশা পরিবর্তন করতে হয়েছে তাদের বেশিরভাগই বেকার অথবা ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে নিয়েছে। ৬৪.৭% রোগী তাদের পেশা পরিবর্তন করে নি। এদের অনেকেরই সুযোগের অভাবে পরিবর্তন সম্ভব হয় নি। কুষ্ঠরোগীদের রোগের প্রতি এতই বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে ৮২% রোগী এ ধরনের পরিবারে আত্মীয়তা করতে রাজি নয়। ৫৭.৭% রোগী প্রয়োজনে কোনো রোগীকে আশ্রয় দিতেও সম্মত নয়। ৫২.% কুষ্ঠরোগীর পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ–এর উপরে। অর্থাৎ রোগীরা পারিবারিকভাবেও অতিরিক্ত জনসংখ্যার মধ্যে বসবাস করছে।

কুষ্ঠরোগীদের পারিবেশিক তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ৬৮.৭% রোগী গ্রামে বসবাস করে। এদের মধ্যে ৯১.৩% রোগী কাঁচা বাড়িতে যার বেশিরভাগের নির্মাণ সামগ্রী হচ্ছে শন, পাটকাঠি, প্লাস্টিক, ভাঙ্গা টিন, বাঁশ প্রভৃতি। শহরে বসবাসকারী রোগীদের ৬২.৮%ই বস্তি বা আধা বস্তিতে বসবাস করে। সুতরাং রোগীদের বসবাসের স্থান যে স্বাস্থ্যসম্মত নয় এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি রোগের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

রোগীদের পারিবারিক ও সামাজিক তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা ৭০.৭% রোগী পরিবারের সবার সাথে একত্রে বাস করে, ১০% একই ঘরে পৃথক থাকে, বাকি ১৯.৩% রোগীকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকতে হয়। ৪৬.৭% রোগীর কুষ্ঠরোগের কথা কেউ জানে না। পাড়া প্রতিবেশীরা এ ধরনের রোগীর বাড়িতে রোগের কথা জেনে আসে খুব কম। রোগীরাও সহজে কারো বাড়িতে যায় না। ৪১.৩% রোগীকে আত্মীয় প্রতিবেশীরা ঘৃণা করে। ৪৬.৭% রোগীকে কেউ কিছু জানে না বলে কিছু বলে না। তার মানে হচ্ছে জানলে এদেরকেও ঘৃণা করবে সে ভয়ে তারা রোগের কথা কাউকে বলে না। বাংলাদেশে আগত বিহারী মুসলমান এবং চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে কুষ্ঠরোগ বেশি এ ধরনের তথ্য আলোচ্য গবেষণায় পাওয়া যায় নি। নমুনা জরিপের ৯৫.৩% রোগীই বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা, বাকি ৪.৭% রোগী ভারত ও পাকিস্তান থেকে এসেছে।

সামাজিক সমস্যার ভয়ে রোগীরা বিয়ের সময় রোগের কথা গোপন করে। আবার বিবাহিতদের অনেকেরই রোগের কারণে সংসার ভেঙ্গে যায়। অর্থনৈতিকভাবেও কুষ্ঠরোগীরা

তেমন একটা স্বচ্ছল নয়। ভিক্ষুক, কৃষক এবং দিনমজুর শ্রেণির রোগী রয়েছে ৩৩.৩% । বেকার এবং ছাত্র রোগী আছে ২৬.৭%। চাকরি এবং ব্যবসায় যারা নিয়োজিত রয়েছে তাদের খুব কমসংখ্যক রোগীই উচ্চ পর্যায়ে আছে। পেশা যাদের উচ্চ মানের নয় তাদের পরিবারের মাসিক আয় বেশি হওয়ার কথা নয়। তারপরও সামগ্রিকভাবে পারিবারিক আয় ধরা হয়েছে বলে ২২% রোগীর মাসিক আয় পাঁচ হাজারের উপরে এসেছে। ৬৬% রোগীর মাসিক আয় তিন হাজারের নিচে। অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবারের ভূমির পরিমাণের সাথেও কিছুটা সম্পর্কিত। কিন্তু ২৫.৩% রোগী ভূমিহীন এবং ৩০.৭% রোগীর ভূমির পরিমাণ এক বিঘার নিচে। কুষ্ঠরোগীদের ৩৬% দুবেলা নিম্নমানের খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। মাত্র ২০.৭% রোগী তিনবেলা ভাল খাবার খেতে পায়। সুতরাং পারিবেশিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা কুষ্ঠরোগের একটি সুস্পষ্ট নিয়ামক।

কুষ্ঠরোগীদের স্থানভিত্তিক তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় শিক্ষা, মাসিক আয়, পেশা, বসতবাড়ির ধরন, সামাজিক পরিস্থিতি নীলফামারী এবং ময়মনসিংহের রোগীদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। শহুরে জীবন ধারণ ব্যবস্থার কারণে ঢাকায় বসবাসকারী রোগীদের পরিস্থিতি একটু ভিন্ন।

নমুনা জরিপ এবং গবেষণা কাজের সাথে জড়িত অন্যান্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কুষ্ঠরোগ প্রসারের নিয়ামক, এ রোগের পরিণতি এবং সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। কুষ্ঠরোগের নিয়ামক হিসেবে শিক্ষা, পেশা, দারিদ্র, পরিবেশ, জীবনাচরণ দেশের স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিধিব্যবস্থা এবং মানব জীববিদ্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয় কুষ্ঠরোগের সাথে সম্পর্কিত। প্রথমেই শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মানুষের সার্বিক উন্নতি সাধন করে। কুষ্ঠরোগী নিজে সচেতন না হলে কোনোভাবেই সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। পরিবেশগত প্রভাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক এবং সামাজিক উভয় পরিবেশ প্রত্যক্ষভাবে কুষ্ঠরোগের সাথে জড়িত। নিরক্ষীয় অঞ্চলের আশেপাশে বৃষ্টিপাতপূর্ণ এবং বনাঞ্চল বেষ্টিত স্যাঁতসেঁতে জায়গায় কুষ্ঠ ব্যাপকতার হার বেশি। এসব বিষয়ে কোন গবেষণা হয় নি বিধায় সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না।

কুষ্ঠরোগের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক তিন ধরনের পরিণতিই রয়েছে। এ রোগে শরীরের প্রান্তিক স্নায়ুসমূহ আক্রমণের ফলে হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলো থেকেই প্রথমে আক্রান্ত হয়। শারীরিক অক্ষমতার সাথে বিকৃত চেহারা সামাজিকভাবে বিচ্যুত হওয়ার প্রধান কারণ। শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করা গেলে সামাজিক এবং মানসিক সমস্যা আপনা-আপনি চলে যাবে, তবে তার জন্য সময় লাগবে। কারণ ভয়াবহ পরিস্থিতি হলে বিভিন্ন সময়ের বিবাহ আইন, উত্তরাধিকার আইন এবং যানবাহন আইনে কুষ্ঠরোগীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং মানুষের মনে দীর্ঘদিনের স্থায়ী যে ধারণা গড়ে উঠেছে তা পরিবর্তন করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা লাগবে।

বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রেও শিক্ষার ভূমিকা থাকবে সর্বাগ্রে, তারপর সঠিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। সমাজে কুষ্ঠরোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা পেশাগতভাবে আবাসিক ব্যবস্থার মাধ্যমে করা যেতে পারে। দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে স্বনির্ভর করে কুষ্ঠরোগীকে মানসিকভাবে সুস্থ রাখা যায়। সর্বোপরি সততা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলে কাজ করলে যত জটিল সমস্যাই হোক না কেন তা সমাধান করা সম্ভব।

৭.৩ কতিপয় প্রাসঙ্গিক সুপারিশ

গবেষণার এ অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা অভিজ্ঞতালব্ধ সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য দেয়া পরামর্শগুলো ভবিষ্যতে পরিস্থিতির উন্নয়নের সহায়তা করবে। নিম্নে কতিপয় প্রাসঙ্গিক সুপারিশ ব্যক্ত করা হলো ঃ

(১) প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের স্থানভিত্তিক কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা নিরূপণ করতে হবে। এ কাজে ছাত্র সমাজকে রোগ সম্পর্কে সামান্য প্রশিক্ষণ দিয়েই কাজে লাগানো যেতে পারে। স্থানভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হলে তা অধিক কার্যকর হবে। সারাদেশে' গড়ে একই ব্যবস্থা নেয়া হলে অধিক আক্রান্ত অঞ্চল বঞ্চিত হবে। প্রাকৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কোন কোন বিষয়গুলো কুষ্ঠরোগ এবং কুষ্ঠরোগের জীবাণুকে প্রভাবিত করে তা চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(২) জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী পর্যন্ত সকলের মধ্যে কুষ্ঠরোগের ধারণা এবং সতর্কতা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে রেডিও, টেলিভিশন, বিজ্ঞানপত্র, সংবাদপত্রের ন্যায় জনসংযোগ মাধ্যমগুলো এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৩) সমস্ত দেশে রোগী চিহ্নিতকরণ এবং তাদের নিয়মিত চিকিৎসার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। একজন কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ সহকারীর অধীনে সরকারি হিসাব অনুযায়ী প্রায় দুই লক্ষ লোক থাকে। এটি কতটা বাস্তবসম্মত তা ভেবে দেখার বিষয়। এ পরিস্থিতিতে দরিদ্র, অশিক্ষিত, অসচেতন মানুষ বর্তমান কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে কতটা সাড়া দিবে তা সন্দেহজনক।

(৪) যেখানে হাসপাতাল হচ্ছে সেখানেই কম-বেশি রোগী পাওয়া যাচ্ছে। সারা দেশে কার্যক্রমের সঠিক হিসাবের মাধ্যমে প্রকৃত পরিস্থিতি কোথায় কেমন তা জানা যেতে পারে।

(৫) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কুষ্ঠরোগের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ধারণা পোষণ করা হয়। এসব ধারণার উপর নির্ভর না করে গবেষণার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো প্রয়োজন। এ কাজে মহাখালী কুষ্ঠ হাসপাতাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৬) কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা, শারীরিক, সামাজিক-মানসিক, অর্থনৈতিক রকমারি সমস্যা আছে বিধায় চিকিৎসাবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, ভৌগোলিক প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গিতে এ রোগের উপর গবেষণা করার পর সমস্যা কিভাবে সহজ উপায়ে সমাধান করা যায় সে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

(৭) গবেষণা কাজে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আন্তরিক সহায়তা এবং পর্যাপ্ত সম্পদ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।

(৮) কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন : পরিবহণ ব্যবস্থা, ওষুধ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী দেশের সর্বত্র প্রয়োজনানুযায়ী থাকা উচিত।

(৯) কুষ্ঠরোগের যে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে তা কিভাবে সহজ এবং স্বল্পমেয়াদি করা যায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

(১০) বিকলাঙ্গ রোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা বিশেষ কোনো বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের সর্বত্র একই ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হলে তাতে ভাল ফলাফল আশা করা যায়। রোগ নির্ণয় এবং নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণের উপর আরো সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। শিক্ষিত সচেতন লোকদের বুঝতে হবে সমাজে সবাই আন্তঃসম্পর্কিত। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একে

অপরের উপর নির্ভরশীল। যেমন, একজন কুষ্ঠরোগী সমাজে বিনা চিকিৎসায় ঘুরে বেড়ালে যে কেউ এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। শহর এলাকায় কলেরা, বসন্ত, হাম এসব ছোঁয়াচে রোগ প্রথমে বস্তিতে শুরু হয়ে তারপর সম্পূর্ণ শহরে ছড়িয়ে পড়ে। তাই একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে সচেতনভাবে সবাই এসব কাজে এগিয়ে আসলে পরোক্ষভাবে তারাই উপকৃত হবে।

(১১) চীন দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও কুষ্ঠরোগী চিহ্নিত করার জন্য সামান্য কিছু টাকা দিলে কার্যকর ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। সবাইকে বিনামূল্যে চিকিৎসা না করে সামান্য টাকার বিনিময়ে করে এ টাকা প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(১২) জটিল রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত হাসপাতালের ব্যবস্থা নেই। জেলা এবং বিভাগীয় সদর ছাড়াও বেশি আক্রান্ত এলাকায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ হাসপাতাল থাকা দরকার। প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। এদিকেও নজর দেয়া উচিত।

(১৩) কুষ্ঠরোগীর বেলায় স্বাস্থ্য শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এ ব্যাপারে অধিক সতর্ক হতে হবে। স্বেচ্ছা সেবামূলক সংগঠন কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে সরকারি প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে পারে।

(১৪) কুষ্ঠরোগের ফলে যারা বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে তাদের জন্য ড্যানিশ বাংলাদেশ লেপ্রসি মিশনের "শান্তি গ্রাম" এর ন্যায় কুষ্ঠপল্লী গড়ে তোলা যায়। কুষ্ঠপল্লীতে এদেরকে কাজে লাগিয়ে এবং অনুদানের মাধ্যমে সাহায্য সহযোগিতা করে কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখা যায়। তা না হলে এ ধরনের রোগীরা সমাজে আরো জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

(১৫) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বের ও পরের স্থানভিত্তিক পরিস্থিতির একটি সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকতে হবে যা পরবর্তীতে সহায়তা করবে।

(১৬) শিক্ষিত রোগীরা রোগ লুকিয়ে না রেখে প্রকাশ্যে একটি সমিতি গড়ে তুলতে পারে, যা কুষ্ঠরোগীদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করবে। কুষ্ঠরোগ সংক্রান্ত কাজে এ ধরনের রোগীদেরই বেশি অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। যে সব শিক্ষিত রোগী নিজেকে বিকলাঙ্গ মনে করে না তারা ভাল হয়ে যাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কাজে অগ্রাধিকার দেয়া হলে রোগী চিহ্নিতকরণে, সামাজিক সমস্যা সমাধানে এমনকি মানসিক সমস্যা সমাধানেও একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতো।

(১৭) কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে স্থানীয় লোক নিয়োগ করা হলে রোগী খুঁজে বের করা সহজ হবে।

পরিশিষ্ট

BANGDOC Library
Dhaka

পরিশিষ্ট ১ : কুষ্ঠরোগীর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির আলোকচিত্র।

নমুনা জরিপে প্রাপ্ত সর্বকনিষ্ঠ এবং একজন বয়স্ক কুষ্ঠরোগী

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

কুষ্ঠরোগ বর্তমানে ভাল হয়ে যায়

চিকিৎসার আগে

চিকিৎসার পরে

কুষ্ঠরোগ বর্তমানে ভাল হয়ে যায়

চিকিৎসার আগে | চিকিৎসার পরে

উৎস : কুষ্ঠরোগ সম্পর্কিত বই থেকে সংগৃহীত।

কুষ্ঠরোগীদের বিভিন্ন রকম শারীরিক পরিস্থিতি

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ১৯৯৪–৯৫।

কুষ্ঠরোগীদের ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি

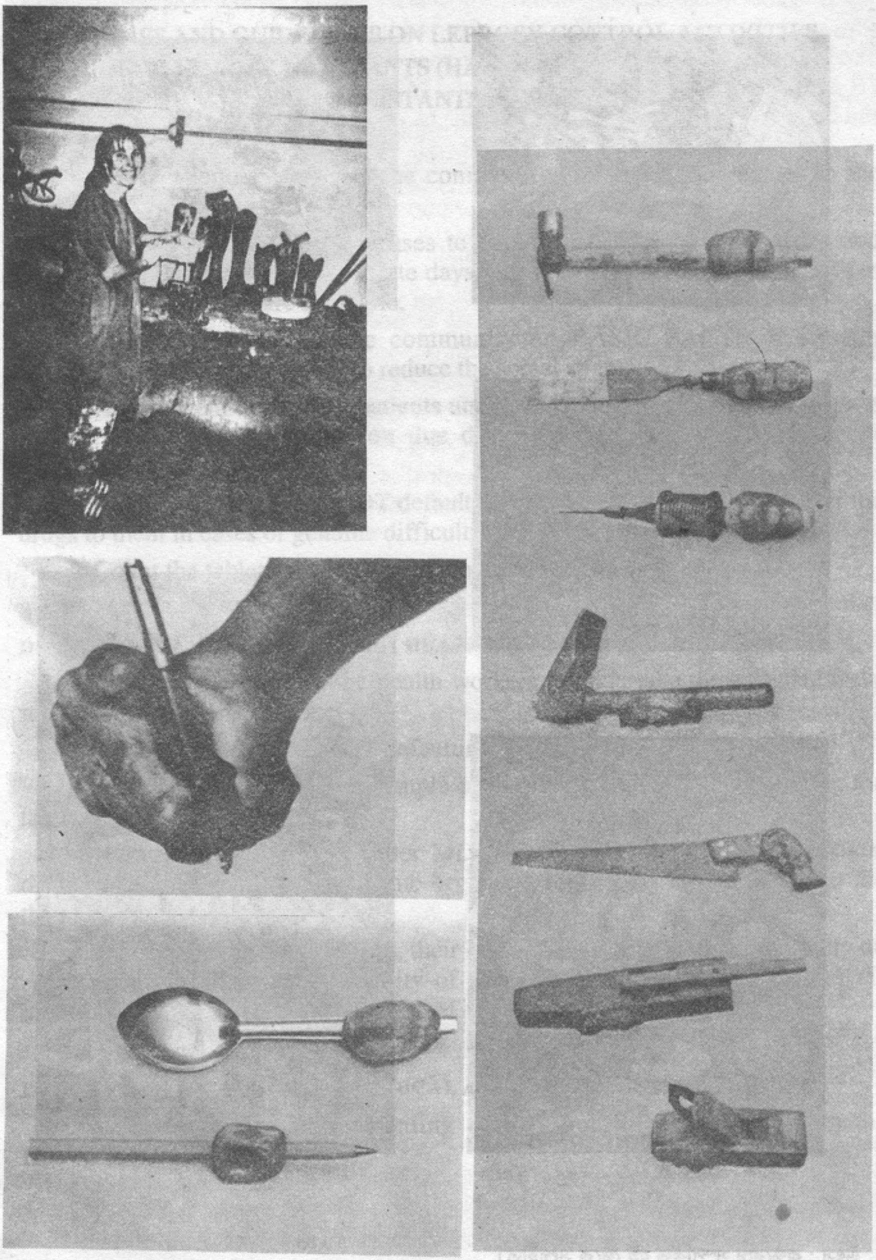

উৎস : কুষ্ঠরোগ সম্পর্কিত বই থেকে সংগৃহীত।

সুস্থ হয়ে রোগীরা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত

উৎস : কুষ্ঠরোগ সম্পর্কিত বই থেকে সংগৃহীত।

পরিশিষ্ট ২ ঃ কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের করণীয় কাজের বিবরণ।

DUTIES AND GUIDELINES ON LEPROSY CONTROL ACTIVITIES FOR HEALTH ASSISTANTS (HA) AND FAMILY WELFARE ASSISTANTS (FWA).

1. Suspect leprosy cases in the community and enter their names in the prescribed register.

2. Refer suspected leprosy cases to thana health complex or health and family welfare centre on appropriate days when the services of LCA or MO or Programme Organizer are available.

3. Inform and educate the community on BASIC FACTS of leprosy EARLY SIGNS and curability to reduce the social stigma.

4. Advise/Remind leprosy patients under MDT during routine village visits to collect the monthly drugs on due date from Thana or HFW centre as appropriate.

5. Contact and motivate MDT defaulters to collect the drugs and deliver the drugs to them in cases of genuine difficulty to visit the drug delivery centre.

6. Count the tablets once in a while to promote regular drug intake.

DUTIES OF HEALTH SUPERVISORS (HI/A.H.I/LHV)

1. Guide and encourage the health workers to undertake the assigned tasks relevant to leprosy control.

2. Assist in motivating MDT defaulting patients referred by the THFPO.

3. Monitor drug intake in a sample of patients under MDT by counting the tablets during village visits.

4. Refer leprosy patients under MDT with complications to the medical officer (Lep) or leprosy programme organizer on the day of their visit to the thana health complex.

5. Educate the leprosy patients, their family members and the community on early lesions of disease, availability of free services for detection and MDT, importance of taking full course of MDT etc.

DUTIES OF MEDICAL OFFICER/MEDICAL ASSISTANT IN CHARGE OF HFWC.

1. Responsible for implementing leprosy control activities within the HFWC area.

2. Support and guide HA/FWAs and HIs/AHIs/LHVs involved in leprosy control undertaking the assigned tasks.

3. Assist in the delivery of monthly anti leprosy drugs to the leprosy patients who visit the centre for collection of monthly drugs on any one of the 2 days fixed in a month. These days are fixed based on the monthly visit of the Thana TB & Leprosy coordinator along with the LCA so that confirmation of diagnosis and other patient care services could also be undertaken.

4. Ensure that the HI/AHI/LHV assist, motivate treatment defaulters and monitor drug intake by the patients under MDT during their routine visits to the villages.

5. Maintain patient cards and update them in respect of the patients who collect the monthly drugs at the HFWC.

6. Assist in confirming diagnosis of suspected leprosy cases, monitoring of drug intake and motivation of treatment defaulters. Appreciate the contribution of health workers who detected suspected leprosy cases and undertake other leprosy control tasks.

7. Send quarterly and annual reports to thana health complex besides sharing of the progress of leprosy control in the center during the monthly meetings with the Thana Health and Family Planning Officer.

DUTIES OF THANA TB AND LEPROSY COORDINATOR

1. Technical guidance and supervision of leprosy control activities in the thana during field visits and at the monthly meeting.

2. Visits all the health and family welfare centres in the thana at least for one fixed day in a month so that suspected leprosy cases are referred accordingly for confirmation of diagnosis and MDT.

3. Carry some stock of anti leprosy drugs and skin smear making equipment during his field visits for their use.

4. Administer monthly supervised dose of anti leprosy drugs to the patients under MDT at one of the HFWC or at THC on fixed days.

5. Conduct leprosy clinic at thana health complex for at least once in a week for confirmation of diagnosis and monthly drug delivery to the patients under MDT. Conduct the clinic regularly on the same dates/days so that the patients could be referred to THC for diagnosis and treatment.

6. Assist the thana HFPO in organizing and participating in training courses in leprosy at THC and in compilation of quarterly and annual reports on leprosy control.

7. Preparation of indents for Drugs, Reagents and maintaining stock.

8. Identify problem patients with complication and reactions and those not responding to treatment, to the district, divisional or national level leprosy experts during their visit to the thana for appropriate guidance in management.

9. Undertake tasks relevant to Tuberculosis programme in Thanas under joint TB and leprosy control as assigned.

JOB DESCRIPTION OF LEPROSY CONTROL ASSISTANT

1. Responsible for providing on the spot technical support to all the peripheral health workers involved in leprosy control in this thana.

2. Screening and confirmation of diagnosis of suspect patients detected by general health workers and registered in the suspected leprosy case register.

3. Arrange for further confirmation of diagnosis and treatment of leprosy cases at the Health and Family Welfare Centre or at Thana out patient clinic.

4. Organise leprosy clinic at thana health complex once a week.

5. Collect skin smears of lepromatous and borderline leprosy patients for further confirmation of diagnosis. However, he would not wait for the skin smear result for initiating MDT.

6. Undertake contact survey of the contacts of leprosy cases.

7. Contact treatment defaulters to motivate them for regular treatment.

8. Identify and refer patients with problems related to diagnosis, classification, treatment response, and complications, to the Medical Officer (Leprosy) or leprosy programme organizer or Leprologist during their visit to the Thana.

9. Undertake duties assigned in respect of T. B. programme in Thanas under joint TB and Leprosy control. Assist the Thana Coordinator in maintaining the records and reports pertaining to leprosy patients and programme.

10. Preperation of indents of leprosy drugs etc. under the guidence of thana TB-Leprosy co-ordinators and maintain stock.

11. Assist Medical Officer in delivering anti-leprosy drugs as per the standard regimens on predetermined dates in a month at the Thana Health Complex.

12. Make at least one visit on a predetermined day to each of the Health and Family Welfare Centers in the Thana every month to assist in confirmation of suspected leprosy cases detected by general health workers and to deliver monthly anti-leprosy drugs to leprosy patients who choose to collect them at HFWC.

13. He will undertake any other leprosy programme duties assigned by the Thana Health and Family Planning Officer from time to time.

DUTIES OF THANA HEALTH AND FAMILY PLANNING OFFICERS

1. Responsible for implementing and monitoring of the leprosy control programme activities in all the villages in the Thana.

2. Support the thana TB & Leprosy Coordinator for providing technical guidance and field supervision to the health workers involved in leprosy control.

3. Review the progress of leprosy control programme to identify and appreciate during the monthly meeting of the health workers and health supervisors who have satisfactorily contributed the assigned leprosy control tasks.

Dhaka

4. Plan, organise and participate in the training programmes for leprosy control for the general health workers and supervisors at the THC.

5. Responsible to send the periodic reports on time to higher echelons.

6. Collect/procure Anti leprosy drugs and other requirements for the programme.

DUTIES OF LABORATORY TECHNICIANS INVOLVED IN LEPROSY CONTROL

1. Collect skin smears from leprosy patients referred by THC or HFWCs following aseptic precaution.

2. Register the identification particulars of patients from whom skin smears are collected or received from THC or HFWCs in a register maintained in the laboratory. Date of collection/receipt, smear number are also recorded with provision for date of examination, result, date of result communication.

3. Fix, stain, examine and record skin smear results as per procedures.

4. Preserve examined slides to enable selection of random numbers by THFPO at the end of every month for cross check at the assigned laboratory and also for cross check by visiting leprosy expert from higher echelons.

5. Examine sputum smears in Thanas under joint TB and Leprosy control as assigned.

DUTIES OF LEPROSY PROGRAMME ORGANIZERS : (LEPROSY NON MEDICAL SUPERVISOR)

1. Supervise and provide technical guidance in leprosy control to LCAs, HAs and FWAs during his visits to THC's and HFWC's in his destid.

2. Visit every Thana under MDT at least once in a month on a predetermined day (date) so that leprosy patients who require to be seen by him are conveniently referred to Thana health Complex on the day of his visit and assist the Thana TB and Leprosy Coordinator in reviewing the diagnosis of newly diagnosed leprosy patients and also those with special problems referred to assist in clinical review of leprosy patients receiving monthly supervised MDT. Where necessary visit one or more HFWCs in the Thana for similar functions. Also screen suspected leprosy cases detected by HAs/FWAs not yet seen by LCA or those referred by LCA himself for confirmation of leprosy diagnosis.

3. Review the clinical progress and drug intake by the leprosy patients during his visits to villages on a random basis and motivate treatment defaulters if any.

4. Carry anti-leprosy drugs in adequate quantities for distributing to the defaulting leprosy patients in the village and carry the equipment to collect skin smear from suspected leprosy cases detected by HAs and FWAs and confirmed as leprosy.

5. Encourage and appreciate the contribution of HAs/FWA for their interest and guide them in detecting suspected leprosy cases even when none of the

suspected cases was confirmed as leprosy. Share his observations and assessment of their work with their immediate supervisors HI/AHI/LHVs.

DUTIES OF MEDICAL OFFICER (LEPROSY) AT THE DISTRICT LEVEL

1. Responsible for providing technical guidance and supervision of the health functionaries involved in leprosy control in the district and act as District coordinator in districts not under joint TB and Leprosy Control.

2. Accord priority for field visits as suggested by the Civil Surgeon/District TB and Leprosy Coordinator (When TB Consultant is designated a district coordinator).

3. Visit every thana in the district on a fixed day in a week to examine referred patients for guidance in diagnosis and management.

4. Attend the leprosy clinic for one fixed day in a week at the district hospital TB Clinic which acts as a referral center at the district to provide technical guidence in diagnosis and management of referred leprosy cases.

5. Guide and approve the tour programme of the programme organizer.

6. Ensure hospitalization of leprosy patients in reaction or with neuritis in the district or thana hospital or nearest Govt/NGO leprosy hospital for their management.

7. Assist in review of the periodic reports on leprosy control received from thanas and compile district reports to be sent to the division. Also prepare feed back on the reports of the thanas and prepare a note on issues basing on the programme performance in thanas for discussion in the monthly meeting convened by the Civil surgeon with THFPOs.

8. Functions under the administrative control of Civil Surgeon and undertakes any other duties assigned.

DUTIES OF DISTRICT TB & LEPROSY COORDINATORS

1. Responsible for technical guidance and supervision of all leprosy control activities in the district with special reference to the thanas under MDT of leprosy cases.

2. Make field visits involving at least 10 night halts in a month so that every thana under MDT is visited for at least one day in a month on a fixed day.

3. Prepare a tour programme with the approval of the Civil surgeon and communciate to the thanas so that the leprosy patients needing guidance are referred to the thana health complex on the day of his visit. He would visit the thana on the same day/date every month.

4. Prepare the agenda and the points for discussion at the monthly meeting of the civil surgeon with the THFPOs.

5. Plan, organize and participate in the training programmes on leprosy at the district level and participate in the training courses organized at thana level in his district.

6. Prepare points for discussion and issues that need support from high levels during the quarterly meeting organized by the divisional health director.

7. Review the quarterly and annual reports on leprosy control received from the thanas and compile and submit report of the district to the higher level. A feed back on their report is prepared and send to the thanas with the approval of the Civil Surgeon.

8. Attend to assigned duties pertaining to TB programme in districts under joint TB and Leprosy Control.

DUTIES OF CIVIL SURGEONS

1. Responsible for planning, implementing and monitoring leprosy control activities in the district.

2. Provide administrative support and guidance to the district TB and Leprosy coordinator for providing technical guidance and supervision to the Thanas under leprosy control.

3. Organize training courses in leprosy planned for different categories in the district with the help of District TB and Leprosy Coordinator.

4. During the monthly meeting with Thana Health and Family Planning officers (THFPO), reviews the progress of leprosy control and take appropriate steps to strengthen the programme. Review action taken on the decisions taken at the previous meeting.

5. Suggest special activities to strengthen the programme if any to higher levels to seek their guidance and support.

6. Review the progress of the leprosy control activities during his routine visits to thana health complexes.

DUTIES OF DIVISIONAL TB AND LEPROSY COORDINATORS

1. Responsible for assisting the Divisional Deputy Director (Health) in implementing and monitoring the leprosy and TB Programme activities as per work plan and as per directions issued from programme headquarters from time to time.

2. Compile, analyze and tabulate quarterly and annual reports in respect of leprosy control in the prescribed forms and send to the national headquarters with the approval of Deputy Director (Health).

3. Prepare a brief feed-back with appropriate suggestions on the reports received from the districts with the approval of the divisional Deputy Director.

4. Organize and participate in the leprosy training programmes as a facilitator held at the division and district levels.

5. Visit every district in the division once in 3 months to guide the staff on technical matters, review problem patients and to validate reported data on diagnosis, classification, recording of deformities and MDT.

6. Assist Deputy Director in identifying critical vacant posts and untrained health functionaries and for early action.

7. Coordinating with the NGOs functioning in the division to avoid duplication of efforts and to ensure implementation of strategies of the leprosy control programme.

8. Ensure timely receipt of anti leprosy drugs and their proper utilization.

9. Assist the Deputy Director (Health) in the preparation of agenda and points for discussion in respect of leprosy and TB programmes at the monthly meeting with Civil Surgeons and quarterly meeting with District TB & Leprosy coordinators.

10. Undertake activities pertaining to TB Programme as assigned by the Deputy Director of Health and the Director (MBDC).

DUTIES OF DIVISIONAL DEPUTY DIRECTOR (HEALTH)

1. Responsible for planning, implementing and monitoring leprosy control programme activities in the Division.

2. Guide and support divisional TB & Leprosy programme coordinators to enable them to discharge the assigned responsibilities for the programme.

3. Discuss with the visiting national programme staff on their observations to identify the weaknesses and strengths and to take corrective actions.

4. Convence and preside the monthly meeting with Civil Surgeons of the districts to review leprosy control along with other health programmes and organize a quarterly meeting with the District TB & Leprosy Coordinators in the districts to review comprehensively the progress of leprosy and TB Control Programmes in their districts and their suggestion for improvement.

DUTIES OF DEPUTY DIRECTOR/ASSTT. DIRECTOR (MBDC/LEPROSY)

1. Assist the Director (MBDC) in planning, implementing and evaluating the leprosy Control Activities.

2. Responsible for identifying the physical facilities in appropriate institution for organizing leprosy training courses as per the work plan.

3. Maintain the project stocks including the anti leprosy drugs.

4. Prepare agenda and discussion material for National Steering Committee and Project implementation Committee under the guidance of the Director (MBDC).

5. Any other responsibility assigned by the Director.

DUTIES OF PHYSIOTHERAPY TECHNICIANS

1. Function under the administrative control of Deputy Director/Asstt. Director (Leprosy) to assist in prevention of deformities and further deterioration of the existing deformities.

2. Participate in the training of trainers to improve their skills, in educating the health workers and the patients to prevent deformities through self care of

anesthetic parts and to prevent deterioration of existing deformities through exercises.

3. Visit divisions/districts as directed from time to time to assist the health functionaries in acquiring skills for prevention of deformitics in leprosy patients.

4. Assist reconstructive surgeons (Short-term consultant) in ensuring appropriate exercises by the leprosy patients operated for correction of deformities.

5. Function under the technical guidance of expatriate physiotherapist during his 12 months support to the programme during the project period to acquire additional skills and knowledge.

6. Assist in procuring and distributing footwear to eligible patients.

DUTIES OF HEALTH EDUCATORS

1. Function under the administrative control of Deputy Director/Assistant Director (Leprosy) to improve the quality of educational material developed for leprosy control and plan the educational component according to the strategies and guidelines of the programme by mobilizing and utilizing all available resources in the Govt. health sector.

2. Participate in the training programmes for trainers in leprosy control to improve their skills on health education methods and content in the training courses for different categories of staff on leprosy control.

3. Visit divisions/districts as directed from time to time for interacting with and assisting the health staff participating in leprosy control and to assess the level of awareness on leprosy in the community.

4. Develop appropriate messages for posters, stickers, radio spots and material for newspaper and leaflets from time to time targeted to the communities in the Thanas under MDT.

5. Assist in participation in health education camps, in exhibition during fairs and special occasions and plan for group meetings of community leaders in Thanas with inadequate MDT coverage/case detection.

DUTIES OF EXPATRIATE LEPROSY PROGRAMME MANAGEMENT CONSULTANT

1. Assist the Director (MBDC) and the WR, Bangladesh in effective leprosy programme management.

2. Ascertain periodically the training status of various categories of staff involved in leprosy control in the Thanas under MDT and their supervisors at higher echelons and plan for their early training.

3. Determine the vacancy position of staff involved in leprosy control and their supervisors and submit to the Director (MBDC) and Administrative Technical officer (T. B. and Leprosy) periodically for suitable action.

4. Assess annually estimation of leprosy cases in the country based on the epidemiological situation of leprosy from time to time in different geographic areas and the registered prevalence.

5. Guide and help peripheral echelons to ensure comprehensive, correct and timely submission of reports by assisting the Director (MBDC) in sending appropriate feed back to reporting agencies and promote effective programme monitoring.

6. Ensure uninterrupted supply of anti leprosy drugs as also timely use of drugs with short self life.

7. Ensure that visits are made by the Thana, District and Divisional TB and Leprosy coordinator as planned and bring the names of defaulters to the notice of the Director (MBDC) for appropriate action.

8. Assist the Director (MBDC) in proper and full utilization of funds by implementing the leprosy work plans with the help of Expatriate Technical (Administrative) Officer (TB & Leprosy).

9. Assist the Director (MBDC) to actively involve the participating NGOs as partners in the programme implementation and to ensure application of uniform strategies and periodic sharing of achievements.

10. Visit Divisions/Districts/Thanas under MDT and also the thanas in 5 districts under TB & Leprosy control as required with the approval of the Director (TB & Leprosy).

11. Undertake any other duties assigned by the Director (MBDC).

DUTIES OF THE NATIONAL LEPROSY PROGRAMME MANAGEMENT CONSULTANT

1. Assist the Director (MBDC) in effective leprosy programme management in consultation with the Expatriate Leprosy programme Management Consultant.

2. Ascertain periodically the training status of various categories of staff involved in leprosy control and the vacancy position of relevant staff in Thanas under MDT during the field visits. The visits to Thanas are planned with the approval of the Director (MBDC).

3. Assess the leprosy epidemiological situation in different geographic areas from time to time and assist the expatriate leprosy programme management consultant in annual estimation of leprosy cases in the country.

4. Guide and help peripheral echelons to ensure comprehensive, correct and timely submission of reports and prepare appropriate feed back on the reports from the Director (MBDC) to the reporting agencies to promote quality of future reports.

5. Ensure uninterrupted supply of anti leprosy drugs as also timely use of drugs with short shelf life in consultation with the expatriate counterpart.

6. Ensure that supervisors visit assigned places as planned and bring the list of defaulters to the notice of the Director (MBDC) in consultation with expatriate leprosy programme manager for appropriate action.

7. Assist the Director (MBDC) in optimal utilization of funds by implementing the leprosy workplan.

8. Assist the Director (MBDC) to actively involve the participating NGO's as partners in programme implementation and to ensure uniform strategies and periodic sharing of achievements.

9. Visit Divisions/Districts/Thanas under MDT and the Thanas in 5 districts under TB & Leprosy control with the approval of the director (MBDC) and in consultation with the expatriate counterpart so that both of them would not visit the same areas in the same quarter but visit all the Thanas under MDT once a year by at least by one of them unless under special situations.

10. Undertake any other duties assigned by the Director (MBDC).

DUTIES OF EXPATRIATE LEPROLOGIST

1. Participate in the training programmes to cover disease diagnosis, classification, skin smear examination and detection and management of reactions and drug side effects.

2. Spend at least 10 days a month in the field to visit Districts and Thanas under MDT to guide the LCAs, Laboratory Technicians, Medical Officers (Leprosy) and Leprosy Programme Organizers while validating disease diagnosis, classification, skin smear examination and treatment regularity. Visit Thanas under MDT in one division in a month to undertake these activities.

3. Share his observations with the Divisional TB & Leprosy Coordinator, Divisional Dy. Director, District Civil Surgeon, District TB and Leprosy Coordinator and Thana HFP Officer and Thana TB & Leprosy Coordinator at the end of field visits.

4. Get his advance tour programme approved by the Director (MBDC) and communicate to all concerned at least 15 days before the visits.

5. Assist the Director (MBDC).

6. Submit a brief tour report to the director (MBDC) for appropriate action.

7. Between him and the National Leprologist all Thanas under MDT and those in 5 Districts under joint TB and Leprosy control are visited at least once in a year.

8. Undertake any other relevant duties assigned by the Director (TB)

9. Guide according to the prescribed rules lies with the National Leprologist to enable him to take over full responsibilities of his activities in course of time.

DUTIES OF NATIONAL LEPROLOGIST

1. Participate in the leprosy training programmes organized at divisional and District level to cover disease diagnosis, classification, skin smear examination and detection and management of reactions and drugs side effects.

2. Spend at least 10 days a month in the field to visit districts and thanas under MDT and those in 5 districts under joint TB and Leprosy control to guide the LCAs, Lab, Technicians, Medical Officers, Leprosy Programme Organizers while validating disease diagnosis, classification, skin smear examination and treatment regularity reported. Visit the thanas in a division in a month not visited by the Expatriate Leprologist in the same month.

3. Share his observations with coordinators at Division, District and Thana level and finally with the Expatriate Leprologist.

4. Get his advance tour programme approved by the director (MBDC) and communicate to all concerned at least 15 days before the visits.

5. Assist the Director (MBDC) to prepare feed back on the priodic reports received from the peripheral echelons.

6. Submit a brief tour report to the Director (MBDC) for appropriate action.

7. Between him and the National Leprologist all Thanas under MDT and those in 5 districts under joint TB and Leprosy control are visited once in a year.

8. Undertake any other relevant duties assigned by the Director (MBDC).

NATIONAL AND EXPATRIATE TECHNICAL (ADMINISTRATIVE) OFFICERS (TB&LEPROSY)

1. Responsible for all administrative and financial matters involved in planning and implementing project activities under the guidance of the Director (MBDC) and the WR, Bangladesh.

2. Expatriate Officer is responsible for preparing supply orders for drugs, equipments, transport etc. as planned for the project and interact with the WHO for early procurement and receipt.

3. National Officer would assist for early filling of critical vacancies of staff through interaction with the government officials concerned.

4. Monitor the receipt of the drugs, equipment, transport etc. and their proper maintenance.

5. Assist in developing annual work plans under the guidance of Director (MBDC) and his collegues.

DUTIES OF THE NATIONAL LEPROSY TRAINING COORDINATOR

1. Assist the Director (MBDC) in organizing and evaluating the leprosy training programmes at all levels as per workplan approved.

2. Participate in the conduct of as many leprosy training programmes as possible to improve their outcome in consultation with the Director (MBDC).

3. Assist in organizing and identifying the faculty for training general health workers/general health Supervisors at Thanas under MDT and for training laboratory technicians of leprosy endemic Thanas, District Hospital Laboratories and TB Clinics at Divisional and/or District level to upgrade their skills and knowledge and their motivation to undertake assigned leprosy control activities.

4. Assist expatriate leprosy consultant in developing training course content for training different categories and to ensure uniformity in undertaking the assigned tasks.

5. Any other related activity assigned by the Director (MBDC).

DUTIES OF DIRECTOR (MBDC)

1. Responsible for planning, implementing and evaluating the leprosy Control activities approved under the project.

2. Responsible for holding the National Steering Committee Meeting, Project Implementation Committee Meeting and Coordination Meeting with the NGO,s as planned and undertake follow up actions.

3. Guide, support and assess the activities of all the National level staff to ensure their effective contribution and avoid unnecessary duplication of efforts.

4. Responsible for interaction with the WHO, the Project implementing agency and submission of reports as required with the help of consultants.

পরিশিষ্ট ৩ : বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগীদের পারিবেশিক অবস্থা জরিপের প্রশ্নপত্র।

বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগীদের আর্থ-সামাজিক ও পারিবেশিক অবস্থা জরিপের প্রশ্নপত্র
স্নাতকোত্তর গবেষণা : ভূগোল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম : **তারিখ :**

(ক) উত্তর দাতার পরিচিতি :

১। নাম :

২। বয়স :

৩। লিঙ্গ : পুরুষ স্ত্রী

৪। ঠিকানা : গ্রাম : পো:
থানা : জেলা :

৫। ধর্ম : মুসলিম হিন্দু খ্রিষ্টান বৌদ্ধ

৬। পেশা : চাকরি ব্যবসা কৃষি ভিক্ষা গৃহিণী
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করে লিখুন)

(খ) রোগ ও আনুষঙ্গিক তথ্য :

১। আপনি কতদিন যাবৎ অসুস্থ ?

২। অসুস্থ হওয়ার কতদিন পর এ রোগ ধরা পড়ে ?

৩। আপনি যে এ রোগে ভুগছেন তা কিভাবে জেনেছেন :

(ক) নিজে
(খ) ডাক্তার

(গ) আত্মীয়
(ঘ) স্বাস্থ্যকর্মী
(ঙ) কুষ্ঠ ক্লিনিক

৪। হাসপাতাল/ক্লিনিকে আসার পূর্বে কি কোনো চিকিৎসা করেছিলেন ?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

৫। হ্যাঁ হলে কি ধরনের চিকিৎসা করেছিলেন ঃ

(ক) ডাক্তার (i) এলোপ্যাথ — এম. বি. বি. এস / পল্লী চিকিৎসক
(ii) হোমিওপ্যাথ
(iii) আয়ুর্বেদী

(খ) কবিরাজ
(গ) অন্যান্য ঝাড়ফুঁক, তাবিজ, পীরফকির।

৬। আপনি কি জানেন এ রোগ কেন হয়?
(ক) জীবাণু দ্বারা (খ) বাজে অভ্যাস (গ) অভিশাপ
(ঘ) অন্যান্য (স্পষ্ট করে লিখুন) :

৭। অসুস্থ হওয়ার পূর্বে আপনি কি কি লক্ষণ দেখেছিলেন।

৮। আপনি কি জানেন এ রোগ ভাল হয়ে যায়?
(ক) হ্যাঁ (খ) না

৯। উত্তর হাঁ হলে আপনি কি নিয়মিত ডাক্তার/হাসপাতালের সেবা নেন?
(ক) হ্যাঁ (খ) না।

১০। আপনার এলাকায় কোনো সরকারি হাসপাতাল/অন্য কোনো সংস্থা কি কাজ করছে?
(ক) হ্যাঁ (খ) না।

১১। আপনার বাড়ি থেকে এগুলোর দূরত্ব কত?

১২। আপনার পরিবারের কারো কি পূর্বে এ রোগ ছিল?
(ক) হ্যাঁ (খ) না।

১৩। উত্তর হ্যাঁ হলে কার এবং কতজনের ছিল (স্পষ্ট করে লিখুন)।

১৪। বর্তমানে রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি কেমন ?

(ক) পায়ের আঙ্গুল নষ্ট হয়ে গেছে।

(খ) হাতের আঙ্গুল নষ্ট হয়ে গেছে।

(গ) হাত, পা দুটোই নষ্ট হয়ে গেছে।

(ঘ) চোখ নষ্ট হয়ে গেছে।

(ঙ) অন্যান্য (স্পষ্ট করে লিখুন)।

(গ) পারিবারিক এবং সামাজিক তথ্য :

১। পরিবারের সকল সদস্যের তথ্য/সদস্য সংখ্যা ঃ

ক্রম	সম্পর্ক	বয়স	লিঙ্গ	জন্মস্থান	শিক্ষা	পেশা		আয়
						১ম	২য়	(মাসিক)

২। আপনার পরিবারের সবাই কি এক ঘরে বাস করছেন ?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

৩। আপনার কি পৃথক থাকার ব্যবস্থা আছে ?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

৪। আপনারা কি বংশানুক্রমিকভাবে বাংলাদেশে বাস করছেন ?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

৫। উত্তর না হলে আপনারা কোন দেশ থেকে এসেছেন অনুগ্রহ করে বলুন।

৬। অসুস্থ হওয়ার পর কি আপনি পেশা পরিবর্তন করেছেন ?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

৭। হ্যাঁ হলে ঃ (ক) পূর্বে কি করতেন

(খ) বর্তমানে কি করেন

৮। আপনার আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী কি আপনার এ রোগের কথা জানে ?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

৯। উত্তর হাঁ হলে তারা কি আপনার বাড়িতে আসে ?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

১০। আপনি কি তাদের বাড়িতে যান ?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

১১। বৈবাহিক অবস্থা : (ক) বিবাহিত

(খ) অবিবাহিত

(গ) অন্যান্য।

১২। বিবাহিত হলে আপনি কখন বিয়ে করেছেন ? রোগাক্রান্ত হওয়ার (ক) পূর্বে (খ) পরে

১৩। আক্রান্ত অবস্থায় হলে বিয়ের সময় কি রোগের কথা বলেছিলেন ?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

১৪। আপনি কি এ ধরনের পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করবেন ?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

১৫। আপনি কি প্রয়োজনে কোনো কুষ্ঠ রোগীকে আশ্রয় দিবেন ?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

১৬। ইতোমধ্যে যে সব সামাজিক কারণ উল্লেখ করা হয়েছে এর বাইরে আর কোনো সামাজিক কারণ আছে কি, যা আপনাকে বিব্রত করে।

(ঘ) পারিবেশিক তথ্য :

১। আপনি কি ধরনের পরিবেশে বাস করেন/করতেন :

(ক) শহুরে	(খ) গ্রামীণ
দ বস্তি	দ কাঁচা বাড়ি
দ আধাবস্তি	দ পাকা বাড়ি
দ আবাসিক	দ মিশ্র ধরন

২। **বসতবাড়ির ধরন : নির্মাণ সামগ্রী :**

(i) ছাউনি (ii) দেয়াল (iii) ভিটি (iv) ঝুপড়ি (v) ঘরবাড়ি নেই।

(ঙ) পরিবারে ভূমি সংক্রান্ত তথ্য :

নিজ মালিকানাধীন জমি :	ভূমির ধরন	পরিমাণ
	(i) কৃষি	
	(ii) বসতভিটা	
	(iii) জলাশয়	
	(iv) অন্যান্য	

বর্গা নেয়া জমি :

বর্গা দেয়া জমি :

বন্ধক দেয়া জমি :

বন্ধক নেয়া জমি :

অন্যান্য :

(চ) আপনার সাধারণ খাদ্য তালিকা কি ?

(i) তিনবেলা ভাল খাবার/মাছ, মাংস, তরকারি, ডাল, ভাত, রুটি।

(ii) তিনবেলা মধ্য খাবার/মাছ, ভাত, ডাল, রুটি।

(iii) দুবেলা নিম্নমানের খাবার।

(iv) এক বেলা/আধবেলা।

শব্দ সংক্ষেপ

BBS	Bangladesh Burea of Statistics.
DBLM	Danish Bangladesh Leprosy Mission.
HEED	Health Education and Economic Development.
HRS	Health Systems Research.
IEC	Information Education and Communication.
IDA	International Development Association.
ILU	International Leprosy Union.
IPGMR	Institute of Post Graduate Medicine and Research.
LCA	Leprosy Control Assistant.
LWG	Leprosy Working Group.
MB	Multibacillary.
MBDC	Mycobacterial Disease Control.
MDT	Multidrug Therapy.
NGO	Nongovernmental Organization.
NIPSOM	National Institute of Preventive and Social Medicine.
PB	Paucibacillary.
RDRS	Rangpur Dinajpur Rural Scheme.
SET	Survey Education and Treatment.
WHA	World Health Assembly.
WHO	World Health Organization.

গ্রন্থপঞ্জি

আমিনুল ইসলাম (১৯৯২), *ভূগোল : দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন*, ঢাকা : ভূগোল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এ. সি. ম্যাকডুগাল ও এস. জে. ইয়ালাকার, (১৯৮৯), **কুষ্ঠ : মৌলিক তথ্য ও ব্যবস্থাপনা**, দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতা : গ্রাফিক আর্টস, অনুবাদিকা মৈত্রেয়ী চৌধুরী।

কাজী আব্দুর রউফ ও মউদুদ ইলাহী, (১৯৯২), **সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ**, ঢাকা : সুজেনেষু প্রকাশনী, বাংলা বাজার।

জি. এস. ওয়াটসন, (১৯৮৬), **কুষ্ঠরোগীদের অক্ষমতা প্রতিরোধ করার উপায়**, কলকাতা : গ্রাফিক আর্টস, অনুবাদিকা মৈত্রেয়ী চৌধুরী।

মৈত্রেয়ী চৌধুরী, (এন. ডি.), **মৌলিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কুষ্ঠ** রোগের **নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য বাস্তবভিত্তিক পুস্তিকা**, কলকাতা : গ্রাফিক্স আর্টস।

শহিদ উল্লাহ (১৯৮৯), **কুষ্ঠরোগের কথা**, ঢাকা : পলওয়েল প্রিন্টিং, নয়াপল্টন।

শাহজাহান তপন, (১৯৯৩), **থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন :** পদ্ধতি ও কৌশল, ঢাকা : প্রতিভা, সোনারগাঁ রোড।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, (১৯৮৮), **আর্থনীতিক ভূগোল, বিশ্ব ও বাংলাদেশ**, ঢাকা : ভূগোল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Jopling W. H., (1984), *Hand book of leprosy,* Third Edition, London : Wimiam Heinemam Medical Kaufmaun Alicia, (1988), *The social dimension of leprosy,* ILEP.

Koticha, K.K.,(1990), *Leprosy a concise text.*

Mcglashan, N. D., (1972), Medical Geography : Techniques and field studies, *Medical Geography : An Introduction,* London : Methun Co. Ltd.

Mead Melinda, Florin John and Gesler Witbert, (1988), *Medical Geography,* NewYork : The Guilford press.

Pearson, J. M. H., (1986), *Essentials of Leprosy,* German Leprosy Relief Association.

Pearson, J. M. H. and Wheat, H. W., (1980), *Essentials of Leprosy,* 4th edition, Madras : All Africa Leprosy and Rehabilitation Training Centre, India.

Paul Brand, C. B. E., (n. d.), *Leprosy today Insesitive Feet. A practical hand book on foot problems in leprosy,* London : The Leprosy Mission.

Thangaraj, R. H. and Yewalkar, S. J. , (1986), *Leprosy for medical practitioner's and paramedical workers,* Switzerland : Ciba-Geigy limited.

প্রতিবেদন

Annual Report, (1994), Danish-Bangladesh Leprosy-Mission, Dhaka.

Ahsan Ali, (1995), Presentation at workshop on leprosy and the family, Cairo, Egypt, March 12-16.

All Africa Leprosy and Rehabilitation Training Centre (n. d.), A Guide to leprosy for field staff, Addis Ababa, Ethiopia.

Budget for the National Tuberculosis and leprosy programm, Bangladesh according to the plan of activities, July 1993--June 1994.

Bangladesh Bureau of Statistics, (1994), Summary Report of Survey on Prevalence of Morbidity and Health Status, Health and demographic Survey, May.

Hogerzreil, L. M. and Sudararajan, (1990), An intensified Leprosy control programme for Bangladesh, Proposal based on consultancy visits for the Work Bank.

International Leprosy Congress, (1984), Leprosy Revieae, Volume 54, 55, Delhi, India.

Memorandum on Leprosy control, (1971).

Noordeen, S. K., (1994), Elimination of leprosy as a public health problem, First National Seminar, Dhaka, December 2-4.

Richardus, J. H. and Croft, (n.d.), Estimating the size of the leprosy problem : The Bangladesh Experience, Dhaka : The Leprosy Mission.

Sumdup, P. W, (1993), Leprosy Elimination in South-East Asia-Progress New Delhi : SEARO.

T. B. and Leprosy control Services (n.d.), Technical guide and operational manual for leprosy control in Bangladesh, Ministry of Health and Family Welfare.

অভিসন্দর্ভ

Akhter Buland, (1991), "A study on Social Aspect Among the Community People's of two Generation in respect of leprosy", Mohakhali : NIPSOM, Dhaka.

Khan Alamgir, (1987), "Review of leprosy control program in Bangladesh", Mohakhali : NIPSOM, Dhaka.

Kundo, P. K., (1990), "Social and Environmental Aspects of Leprosy : A case study of Nilphamary Paurashava", M. Sc. Report, Jahangir- Nagar University.

Khan Matiullah, (1993), "Study on Factors Responsible for Endemic of Leprosy in Northern area of Bangladesh", Mohakhali : NIPSOM, Dhaka.

Kalam Abul, (1994), "A study on disability pattern of Leprosy patients in a selected Hospital in Bangladesh, Mohakhali : NIPSOM, Dhaka.

Samad Abdus, (1988), "Study on Medico social aspect of Leprosy patients in leprosy hospital of Mohakhali and two mobile units of Dhaka city, Mohakhali : NIPSOM, Dhaka.

পরিসংখ্যানিক তথ্য

Bangladesh Bureau of Statistics, (1994), Statistical pocketbook of Bangladesh, Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

পত্রিকা

আব্দুর রাজ্জাক, (১৯৯৪), "সামাজিক কুসংস্কার এবং কুষ্ঠ", **উজ্জ্বল আশা**, জুলাই-ডিসেম্বর।

এম. আই. চৌধুরী, (১৯৯৫), "কুষ্ঠরোগীর বিস্তার এবং প্রতিকার প্রসঙ্গে", **দৈনিক খবর**, জানুয়ারি ১৮।

এন. জি. সাহা, (১৯৯৩), "কুষ্ঠরোগের ইতিহাস", **উজ্জ্বল আশা**, মার্চ।

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, (১৯৯৫) , "কুষ্ঠরোগের সঠিক ধারণা", **উজ্জ্বল আশা**, জানুয়ারি-জুন।

সুজন হাজারী, (১৯৯৩), "দেশের উত্তরাঞ্চলে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা আশংকাজনক হারে বেড়েছে", **দৈনিক ভোরের কাগজ**, আগস্ট ২৩।

সমুদ্র হক, (১৯৯৫), "উত্তরাঞ্চলে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বাড়ছেই", **দৈনিক জনকণ্ঠ**, মার্চ ১২।

স্টাফ রিপোর্টার, (১৯৯৪), "রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করছে : দেশে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ৪ লাখ", **দৈনিক জনকণ্ঠ**, সেপ্টেম্বর ৯।

BANSDOC Library
Accession No. 17847

BANSDOC Library Dhaka

পাপু

৪